বসন্তরোগ

ও

দেশীয় মতে তাহার সরল বৈজ্ঞানিক

চিকিৎসা।

কবিরাজ শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কবিরঞ্জন

প্রণীত।

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

বসন্ত রোগ

ও

দেশীয় মতে তাহার সরল বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা।

—:*:—

প্রথম সংস্করণ।

কবিরাজ—শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কবিরঞ্জন।

প্রণীত।

2

৭৬।১ নং রসারোড নর্থ, ভবানীপুর, কলিকাতা;

হইতে প্রকাশিত।

২৭।১ রসারোড নর্থ ভবানীপুর, কলিকাতা।

"নাগ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস" হইতে

শ্রীহৃষীকেশ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩১৬ সাল।

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

——(*)——

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করান যাইতেছে যে, আমরা এই পুস্তক..................সালের..................আইন অনুসারে রেজিষ্টার-জেনারেল আফিসে, রীতিমত রেজিষ্টারি করিয়া লইয়াছি। সুতরাং যদি কেহ এই পুস্তকের কপিরাইটের বিরুদ্ধে কোনরূপ অত্যাচার করেন, অর্থাৎ আমার বিনা অনুমতিতে, ইহার পুনর্ম্মুদ্রাঙ্কন বা অন্য কোন ভাষায় অনুবাদাদি কোনও প্রকারের অত্যাচার করেন, তবে তিনি আইন অনুসারে দণ্ডনীয় হইবেন।

উৎসর্গ-পত্র।

—§*§—

পরম পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত মদন মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

তথা—

পরমারাধ্যতমা শ্রীযুক্তা জগৎ-লক্ষ্মী দেবী—

পিতৃদেব ও মাতৃদেবীর শ্রীশ্রীচরণ কমলেষু—

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।"

বাবা, মা!

এ অধম সন্তান, আপনাদের কোন গুণেরই অধিকারী হয় নাই। তবে, সুপুত্রই হউক, আর কুপুত্রই হউক, পিতা মাতার স্নেহলাভে বঞ্চিত হয় না। বরং, অধম সন্তানই পিতা মাতার স্নেহলাভে অধিকতর কৃতকার্য্য হয়, ইহাই সংসারের নিয়ম। সেই সাহসে, বহুকষ্টে ও অনেক কাঁটার আচড় সহ্য করিয়া, নানা বন হইতে পুষ্পচয়ন করত যে মাল্য রচনা করিয়াছি, তাহা আপনাদের উভয়ের শ্রীচরণে অর্পণ করিয়া প্রণত হইলাম। চিকিৎসাবিষয়ক গ্রন্থ লেখা বড়ই গুরুতর ব্যাপার। কারণ, চিকিৎসাবিষয়ক উপদেশের উপর অনেকের মঙ্গলামঙ্গল ও জীবন-মরণ নির্ভর করে। গুরুজনের অর্চ্চনারূপ মঙ্গলাচরণ করিয়া কোন কার্য্য আরম্ভ করিলে, ভাবী মঙ্গল সুনিশ্চিত, ইহাই সর্ব্ব-সাধারণের, বিশেষতঃ হিন্দুদিগের স্থিরবিশ্বাস। আর ঈশ্বরের নাম স্মরণ করা ও তাঁহার পদে ভক্তিভাবে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করাই

সকল প্রকার মঙ্গলাচরণের মধ্যে প্রধান বলিয়া গণ্য। জগতের ঈশ্বরকে দেখিতে পাই না, তাহার পদ আছে কি না জানিনা। আর থাকিলেও, আমার মত ক্ষুদ্র কীটানুকীটের পক্ষে তাঁহার দর্শন লাভ হওয়ার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু জগতের ঈশ্বর থাকুন বা নাই থাকুন, আমার নিতান্তই সৌভাগ্য যে, জগতের ঈশ্বর হইতেও আমার নিকট শ্রেষ্ঠতর, অধিকতর আরাধ্য ও অধিকতর পূজনীয়, আপনারা বর্ত্তমান আছেন এবং আপনাদের শ্রীচরণে, আমি ভক্তিপূর্ণ এই পুষ্পাঞ্জলি দিতে পারিতেছি। ইহা আমার পক্ষে কম সৌভাগ্যের কথা নহে। সকলের ভাগ্যে ইহা ঘটিয়া উঠে না। অমার্জ্জিতবুদ্ধি-পরিকল্পিত ও অপক্ক-হস্তগ্রথিত এই পুষ্পমালা, অন্য কাহাকেও প্রদান করিলে তিনি অকিঞ্চিৎকরজ্ঞানে ইহার অযত্ন করিতে পারেন; তিনি দেবতা হইলেও আমার এরূপ-কার্য্য তোষামোদ বলিয়া মনে করিতে পারেন, কিন্তু আপনাদের নিকট সেরূপ কোন আশঙ্কা নাই। আমি নিশ্চিত জানি যে, আমার এ পুষ্পাঞ্জলি আপনাদের গ্রহণের অযোগ্য হইলেও, হর পার্ব্বতী যেমন সামান্য পুষ্প-বিল্বদলেই তৃপ্ত হন, আপনারাও তদ্রূপ ইহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে আশীর্ব্বাদ করিবেন। আপনাদের আশীর্ব্বাদ লাভ করিলেই আমার মঙ্গল সুনিশ্চিত, পরিশ্রম সফল ও উৎকণ্ঠা বিদূরিত হইবে। কারণ,

"পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্ব দেবতাঃ॥"

আশীর্ব্বাদাকাঙ্ক্ষী

চিন্তাহরণ।

ভূমিকা।

এ বৎসর কলিকাতায় বসন্ত রোগের এক প্রকার মহামারী হইয়া গিয়াছে। এমন বাড়ী খুব কম আছে, যেখানে দুই এক জনের অন্তত জলবসন্তও হয় নাই। মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র এ তিন মাস, সহরের যাবতীয় লোকই বসন্তের ভয়ে ভীত, চকিত ও সন্ত্রস্ত ছিল। সকল রোগেরই চিকিৎসার বই আছে। হোমিওপ্যাথিই বল, এলোপ্যাথিই বল, আর দেশীয় আয়ুর্ব্বেদ মতের চিকিৎসাই বল, সকল মতেই বসন্ত রোগের চিকিৎসাও হইয়া থাকে। তবে, অন্যান্য রোগ সম্বন্ধে যাহাই হউক, বসন্ত রোগে লোকে দেশীয় মতের চিকিৎসাই ভাল বলিয়া জানে এবং ভারতবর্ষের প্রায় সকল লোকেই দেশীয় মতে চিকিৎসিত হইয়া থাকে। কিন্তু দেশীয় মতে বসন্তচিকিৎসার কোন বই দেখা যায় না। চিকিৎসা গোপন করার প্রথাটা এদেশে অনেক দিন হইতে চলিয়া আসিতেছে।

"আয়ুর্ব্বিত্তং গৃহচ্ছিদ্রং
মন্ত্র মৈথুন ভেষজম্।
তপোদানং তথামানং
নব গোপ্যানি যত্নতঃ॥"

চিকিৎসা বা ঔষধাদি গোপন করার যে কত দোষ তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। আর যদিও বসন্ত রোগের চিকিৎসাবিষয়ক ২।১ খানি বই আজ কাল বাহির হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে এই রোগের বিশদ বর্ণনা বা প্রণালীবদ্ধ বিস্তৃত চিকিৎসাবিধি নাই। সুতরাং তাহাদের সাহায্যে

বসন্তের ভিন্ন ভিন্ন জাতি চিনিয়া লইয়া ঔষধাদির ব্যবস্থা করা এক প্রকার অসম্ভব। সাংখ্যকার বলেন—

"এবং হি শাস্ত্রবিষয়ো ন জিজ্ঞাস্যেত,
যদি দুঃখং নাম জগতি ন স্যাৎ॥"

অর্থাৎ পৃথিবীতে যদি দুঃখ নামক একটী জিনিষ না থাকিত, তবে শাস্ত্রীয় কোন জিজ্ঞাসাই উপস্থিত হইত না। কোন বিষয়ের অভাব হইলেই তাহার প্রতিবিধানের চেষ্টা হইয়া থাকে। যাহা হউক, বসন্ত রোগের এইরূপ সর্ব্বব্যাপী ও ভীষণ আক্রমণ লক্ষ্য করিয়া, কতিপয় বন্ধুর অনুরোধে, "বসন্ত রোগ ও দেশীয় মতে তাহার সরল বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা" বাহির করিলাম। এই বই বাহির করিবার অন্যান্য উদ্দেশ্যও আছে, উহা নিম্নে বিবৃত করিতেছি।

বসন্ত অতি কঠিন ও সাঙ্ঘাতিক পীড়া। ইহা অত্যন্ত সংক্রামক ও স্পর্শাক্রামক (ছোঁয়াচে) রোগ বলিয়া শিক্ষিত ডাক্তার কবিরাজ মহাশয়েরা, প্রায়শঃ, বসন্ত রোগের চিকিৎসা করিতে অস্বীকার করেন। রোগীর আত্মীয়স্বজনও অনেক সময়ে, রোগীর শুশ্রূষা করিতে ভীত হন। প্রতিবাসিবর্গও নিকটে আসিয়া, রোগীর প্রতি কোনও প্রকারে সহানুভূতি প্রকাশ করিতে ভয় পান। ইত্যাদি নানা কারণে, রোগী ও রোগীর আত্মীয়বর্গ, সর্ব্বদা দুশ্চিন্তা ও উৎকণ্ঠায় কালযাপন করেন। এই অবস্থায় কাহারও মনের স্থিরতা থাকে না। মহামুনি চরকাচার্য্য বলেন "বিষাদো রোগ বর্দ্ধনানাম্" (অর্থাৎ রোগবর্দ্ধক যত প্রকার কুপথ্য আছে, তাহাদের মধ্যে বিষণ্ণতা অর্থাৎ "আমি গিয়াছি", "আমার কি হইবে" ইত্যাকার মনের ভাব) প্রধান। রোগের ধর্ম্ম এই যে, রোগ হইলে রোগী যদি ভয় পায় অথবা তাহার উৎকণ্ঠার বৃদ্ধি পায়, তবে তাহার রোগের অবস্থাও ক্রমশঃ কঠিন হইতে কঠিনতর হইয়া উঠে। যখন এই রোগের চিকিৎসার জন্য প্রায়ই শাস্ত্রজ্ঞ ও কর্ম্মকুশল চিকিৎসক পাওয়া যায় না, তখন রোগীর

অভিভাবকবর্গ, যাহার তাহার উপর রোগীর চিকিৎসার ভার দিয়া ও যৎকিঞ্চিৎ শুশ্রূষার উপর নির্ভর করিয়া রোগীকে রাখিয়া দেন। অধিকাংশ স্থলে রোগীর আত্মীয়স্বজন, যদিও নিজ নিজ প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করিয়া রোগীর শুশ্রূষা করিয়া থাকেন, তথাপি তাঁহারা রোগের শুশ্রূষা-প্রণালী সম্যক্ অবগত নহেন বলিয়া, রোগীর ভাল রকম শুশ্রূষা করিতে পারেন না। ইহার ফলস্বরূপ, রোগীর ত যাহা হইবার তাহাই হয়, রোগীর মলমূত্র অসাবধানতা সহকারে যথায় তথায় নিক্ষেপ করাতে, হয়ত সমস্ত পরিবারবর্গ বা সমস্ত পল্লী বসন্ত দ্বারা আক্রান্ত হয়। একদিকে রোগটী যেমন সাঙ্ঘাতিক এবং প্রায়শঃ নানাবিধ নূতন নূতন উপসর্গাদি যুক্ত হইয়া রোগীর অবস্থা জটিল করিয়া তুলে এবং এতাদৃশ কঠিন ও সাঙ্ঘাতিক রোগ বলিয়াই যেমন ইহার চিকিৎসার জন্য সুচিকিৎসকের দরকার হয়, সমাজের ভাগ্য দোষে, তেমনই আবার, ইহার চিকিৎসার প্রতিকূলে, লোকের মনে, কতকগুলি কুসংস্কার বদ্ধমূল হইয়া আছে। তাঁহাদের ধারণা এই যে, বসন্ত চিকিৎসার জন্য শিক্ষিত চিকিৎসক ডাকিবার দরকার নাই। ইহা মায়ের (৺শীতলা দেবীর) অনুগ্রহ মাত্র। ইহা সারিবার হইলে আপনিই সারিবে। দেশীয় ইতর লোকদের ধারণা এই যে, বসন্ত রোগে শিক্ষিত চিকিৎসক ডাকিলে, রোগী রক্ষা পায় না। যাঁহারা বসন্ত রোগের চিকিৎসা করেন, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই চিকিৎসা শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ। তাঁহারা চিকিৎসাশাস্ত্র রীতিমত অধ্যয়ন করেন না। মোটামুটি বসন্ত রোগের কতকগুলি ঔষধ দ্বারা, চিকিৎসা করিয়া থাকেন। কোন্ জাতীয় বসন্তে, কি হেতু, কোন্ কোন্ ঔষধ উপকারী হইবে, বসন্তরোগ সহ নানা প্রকার উপসর্গাদি আসিয়া জুটিলে, কি কারণে, কোন্ কোন্ সময়ে, কোন্ কোন্ বিষয়ে, চিকিৎসার আংশিক বা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন করিতে হইবে, ইত্যাদি বিষয়, না জানার দরুণ, সময় সময় বিষম বিভ্রাটে পড়িয়া থাকেন। ফলতঃ এটী ধ্রুব সত্য যে, যিনি

সর্ব্ববিধ রোগের চিকিৎসাকৌশল অবগত নহেন, তিনি কোন একটী রোগও উপসর্গাদিযুক্ত হইলে, তাহার চিকিৎসা করিয়া সুফল লাভ করিতে পারেন না। জ্বরের চিকিৎসা জানি, কিন্তু জ্বরের সঙ্গে অতিসার কি মাথাধরা আসিয়া জুটিলে, ঐ ঐ উপসর্গকে কি উপেক্ষা করিতে হইবে, না, চিকিৎসার আংশিক বা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন করিতে হইবে, তাহা জানি না, এরূপ হইলে চলিবে না। যাহা হউক, রোগটী ছোঁয়াচে বলিয়া, শিক্ষিত চিকিৎসক, বসন্ত রোগীর চিকিৎসা করিতে অস্বীকার করিয়া থাকেন, এই কারণে সাধারণের মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, শাস্ত্রে বসন্ত চিকিৎসার ফলোপধায়ক কোন ভাল চিকিৎসাবিধি নাই। এই সমস্ত কারণে, কোথাও উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে, কোথাও বা উপযুক্ত শুশ্রূষা হয় না বলিয়া, সমাজের মহৎ অনিষ্ট সাধিত হইয়া থাকে।

যাহা হউক, এই মারাত্মক ব্যাধির স্বভাব, গতি, ভাবিফল ও চিকিৎসার বিষয়ে শাস্ত্রের মতামত ও চলিত মতে বসন্ত চিকিৎসার দোষ গুণাদি সমালোচনা করিয়া, যদি সর্ব্ব সাধারণকে উহার অন্তত কতকটা অবগত করান যায়, তবে রোগীর অভিভাবকবর্গও অধিকাংশ স্থলে, রোগীর চিকিৎসা ও শুশ্রূষার বিষয়ে, বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে পারেন। আর, "সঙ্কেতবিদ্যা গুরুবক্ত্রগম্যা" অর্থাৎ চিকিৎসাশাস্ত্র সাঙ্কেতিক বিদ্যা, উহা গুরুর মুখ হইতে অবশ্য জ্ঞাত হওয়া দরকার। অন্যথা বিষময় ফল উৎপাদন করিতে পারে। সুতরাং, অশিক্ষিত লোকদের মধ্যে, যাঁহারা শাস্ত্র না পড়িয়াই বসন্ত রোগের চিকিৎসা করিয়া থাকেন, তাঁহারাও ইহা দ্বারা বিশেষ সাহায্য পাইয়া সমাজের বেশী উপকার করিতে পারেন। যখন বসন্ত চিকিৎসার জন্য অনেক স্থলে ভাল চিকিৎসক ডাকিলেও পাওয়া যায় না, এবং নিতান্ত আত্মীয় ভিন্ন, অন্য শিক্ষিত লোক যখন রোগীর শুশ্রূষা করিতে স্বীকার করেন না, তখন এই রোগের শুশ্রূষা ও চিকিৎসা-কৌশল, প্রত্যেক গৃহস্থকে জানাইতে পারিলে, বহুলোকের উপকার

সাধিত হইতে পারে। উপরোক্ত বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া, বহু অনুসন্ধান, গবেষণা ও পরীক্ষার দ্বারা, এই রোগের আশু ও নিশ্চিত ফলোপধায়ক যে সকল উৎকৃষ্ট যোগ (ঔষধ) অবগত হইয়াছি, তাহা চিকিৎসার প্রণালী-ক্রমে এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিলাম। ইহার মধ্যে যে সকল প্রত্যক্ষ-ফলপ্রদ পাচন, বটিকা ও তৈলাদির উল্লেখ আছে, তাহা সংগ্রহ করিতে আমাদিগকে বহু পরিশ্রম, অনেক তোষামোদ এবং স্থল বিশেষে অর্থব্যয়ও করিতে হইয়াছে। আমাদের প্রধান উদ্দেশ্যই হচ্ছে সর্ব্বসাধারণে যাহাতে এই সাঙ্ঘাতিক রোগে সুচিকিৎসিত হইতে পারেন, তাহার উপায় বিধান করা। সুতরাং "আমাদের বহুপুরুষ পরম্পরাব্যবহৃত", "আমাদের বসন্তরোগের অব্যর্থতৈল অন্যত্র পাওয়া অসম্ভব" ইত্যাদি ব্যবসাদারী কথায় না ভুলিয়া সকলেই এই বই'র লিখিত ঔষধ দ্বারা চিকিৎসিত হইয়া উপকার লাভ করেন এবং ধনেপ্রাণে মারা না যান, ইহাই আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা। আমাদের বিশ্বাস, গৃহস্থই হউন, আর বসন্ত চিকিৎসকই হউন, যিনি এই পুস্তকের লিখিত উপদেশগুলি, রোগীর অবস্থার সহিত মিলাইয়া, এই পুস্তকের লিখিত প্রণালী মতে যথোপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগ করিবেন, তিনি অধিকাংশ স্থলেই উপকার লাভ করিতে পারিবেন। তবে কার্য্যের সফলতা, ঈশ্বরের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে।

২। আয়ুর্ব্বেদের কথা সকল সাঙ্কেতিক, সুতরাং সহজে বুঝা যায় না। ডাক্তারী শাস্ত্রের কথা সকল সুস্পষ্ট। ডাক্তারীতে রোগের লক্ষণাদি অতি সরল ভাষায় লিখিত আছে, সুতরাং রোগ চিনিবার পক্ষে বিশেষ প্রয়াস পাইতে হয় না। আয়ুর্ব্বেদে রোগের কারণ ও পূর্ব্বরূপ সকল বর্ণিত আছে, অথচ ইহার চিকিৎসিত স্থান উৎকৃষ্ট—এমন কি সম্পূর্ণও বলা যাইতে পারে। তাই আমরা ডাক্তারী, কবিরাজী প্রভৃতি নানা পুস্তক পূর্ব্বে পাঠকরিয়া ও নিজেদের বহুদর্শিতার সাহায্যে, বসন্ত রোগের নানা লক্ষণাদি, ভিন্ন ভিন্ন ও ওতপ্রোত ভাবে, তন্ন তন্ন করিয়া, বর্ণনা করি-

নাম। যে কোন প্রকারেই হউক বসন্তের জাতি চিনিতে পারিলেই হইল। তবে চিকিৎসার প্রণালী সম্পূর্ণ দেশীয় মতে দেওয়া হইল।

৩। আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে জানাইতেছি যে, আমরা এই পুস্তক-প্রণয়ন কালে, ডাক্তারী, কবিরাজী, হোমিওপ্যাথী, হাকিমি প্রভৃতি বহুবিধ পুস্তকের ও আয়ুর্ব্বেদসঞ্জীবনী, চিকিৎসাসম্মিলনী, ভিষকৃদর্পণ ও সমীরণ প্রভৃতি বহুবিধ সাময়িক পত্রিকার ও আজকালের বসন্তচিকিৎসক ভট্টাচার্য্য ও আচার্য্যগণের মধ্যে অনেকের অল্প বিস্তর সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি। সমুদায়ের পৃথক্ পৃথক্ নাম এখানে উল্লেখ করা অসম্ভব ও এক প্রকার অসাধ্য। তবে, উহাদের মধ্যে কবিরাজ ৺যশোদা নন্দন সরকার, ৺পুলিন চন্দ্র সান্ন্যাল এম্ বি, শ্রীযুক্ত কবিরাজ শীতল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবিরত্ন, শ্রীযুক্ত কবিরাজ রাজেন্দ্র নারায়ণ সেন কবিরত্ন ও শ্রীযুক্ত রাধাচরণ আচার্য্য মহাশয় দিগের বসন্ত চিকিৎসার পুস্তকই বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য।

৪। কৃতজ্ঞতা সহকারে ইহাও জানাইতেছি যে, বহুদর্শী ও সুবিজ্ঞ কবিরাজ শ্রীযুক্ত শীতল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবিরত্ন মহাশয়, যথেষ্ট পরিশ্রম সহকারে, এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি আগাগোড়া দেখিয়া দিয়াছেন।

পরিশেষে পাঠকগণের নিকট বিনীত নিবেদন এই যে, ভ্রম প্রমাদ মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। যদি এই পুস্তকের কোন স্থানে, কোনও প্রকারের ত্রুটী হইয়া থাকে, অনুগ্রহ করিয়া লিখিয়া জানাইলে, গ্রন্থকার সবিনয়ে উহা গ্রহণ করিয়া, পুনর্মুদ্রণ কালে উহার সংশোধন করিয়া দিবেন। চিকিৎসা কার্য্যে সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকিতে হয় বলিয়া প্রুফ সংশোধনাদি ভালরূপে করিতে পারি নাই। সুতরাং অনেক বর্ণাশুদ্ধি থাকাই সম্ভব। শিক্ষিত পাঠকগণ নিজে নিজে উহাদের সংশোধন করিয়া বাধিত করিবেন। অলমতি বিস্তরেণ।

গ্রন্থকার।

এই গ্রন্থ সম্বন্ধে কতিপয় কৃতবিদ্য ব্যক্তির অভিমত।

——§*§——

Srijut Girindra Nath Mukerjee B. A., M. D., Fellow of the Calcutta University; Professor of Botany, Indian Association for Cultivation of Science, says :—

"I have perused your book, "Basanta Roga Chikitsa" or Treatment of Small-Pox and I found the book very useful, as it contains elaborate details of treatment according to the indigenous system."

Srijukta Deb Kishore Mukerjee M. A., Assistant Head Master, South Suburban School, Bhowanipur, says :—"If zealous interest and careful treatment of patients have gained you an extensive practice within so short a period I make little doubt the Ayurvedic Method of coping with a fell disease like the Small-Pox you so ably advocate and explain in your book, "Small-Pox and its treatment according to Indian Method," will rank you amongst the ablest scholars of the science of medicine. It is a wonder you could find time, among your multifarious duties, to think out and treat in such a masterly way some of the intricate questions and apparent paradoxes of the Ayurveda. Your exposition, at once simple and easy, in a language accessible to all but the illiterate, will impress the public with an idea of the grasp you have over the science of your adoption. The keen acumen you display in reconciling Ayurveda to the most modern discoveries in the Western science of medicine will strike the educated community of this country

and go great way to further establish the prestige of the Ayurveda already gaining ground in the minds of your people. It is through the efforts of men like yourself, combining the scholarship of a deep-read student with the practical experience of a professional expert that the cause of the Ayurveda will be upheld and advanced."

শ্রীযুক্ত শ্রীপতি কবিরত্ন, হেড্ পণ্ডিত, সাউথ সুবারবন স্কুল, ভবানীপুর, বলেন :—"আপনার প্রণীত "বসন্তরোগ ও তাহার সরল বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা"র পাণ্ডুলিপি কিছু কিছু পাঠ করিয়াছিলাম। এক্ষণে মুদ্রিত গ্রন্থখানি অধ্যয়ন করিয়া পরম পরিতুষ্ট ও বিস্মিত হইলাম।

চিকিৎসাগ্রন্থ প্রায়ই সুখপাঠ্য হয় না। কিন্তু আপনার গ্রন্থখানি সরল ভাষায় লিপিবদ্ধ হওয়ায়, আদ্যোপান্ত পাঠ করিতে কোনরূপ অসুবিধা হয় নাই। অধিকন্তু, আপনার সূক্ষ্মদর্শিতা, গবেষণা ও প্রতিভার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাইয়া পরম সুখী হইয়াছি। এ গ্রন্থ অপরের রচিত হইলে ইহার গুণাবলীর বিস্তৃত সমালোচনা করিতে পারিতাম। বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাদির উল্লেখ করিয়া অসঙ্কোচে বলিতাম গ্রন্থখানি কেবল বসন্তরোগ-বিষয়ক নহে। সাহিত্য, প্রত্নতত্ত্ব প্রভৃতির অপূর্ব্ব মিলনে ইহা পরম উপাদেয় হইয়াছে। আপনার সহিত সৌহার্দ্দ থাকায় সে সকল কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। আপনাকে আমি পূর্ব্বাবধিই সূক্ষ্মদর্শী চিকিৎসক বলিয়া জানি। সংক্ষেপে বলিতে গেলে গ্রন্থখানি আপনার উপযোগী হইয়াছে। ভারতের গৌরবস্থল ঋষিগণের মত সমর্থন করিবার জন্য আপনি যে সকল তর্ক ও যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে আয়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধে অনেকেরই ভ্রান্তিমূলক সংস্কার তিরোহিত হইবে। এরূপ লোকহিতকর, বহুচিন্তাপ্রসূত গ্রন্থের যতই প্রচার হইবে, ততই দেশের কল্যাণ সাধিত হইবে।"

সূচীপত্র।

বিষয় | পৃষ্ঠা।

নিদানস্থান।

১—৩৬ পৃষ্ঠা।

বসন্তরোগের প্রতিষেধক ঔষধ।

৩৬—৩৯ পৃষ্ঠা।

চিকিৎসিত স্থান।

৫৮—১১৬ পৃষ্ঠা।

বিষয় পৃষ্ঠা।

ইংরেজী টিকার সমালোচনা।

১৪১—২৩৫ পৃষ্ঠা।

——§*§——

পরিশিষ্ট।

বসন্ত।

বসন্ত রোগকে সংস্কৃত ভাষায় মসূরী বা মসূরিকা বলে। কেহ কেহ আবার পানিবসন্ত বা জলবসন্তকে মসূরিকা এবং বড় বসন্তকে শীতলা, ইচ্ছা বসন্ত, জাতি বসন্ত, আদত বসন্ত বা মায়ের অনুগ্রহ বলিয়া থাকেন। কেহ কেহ আবার বড় বসন্তকে বিসর্পও বলিয়া থাকেন। ফলতঃ, বিসর্প এই জাতীয় পীড়া বটে, কিন্তু বসন্ত নহে।

এই রোগে চর্ম্মের উপর মসূর কলায়ের (মসূর দালের বা মসূরী দাইলের) মত পিড়কা উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহার নাম মসূরিকা। ডাক্তারিতে ইহাকে স্মলপক্স (Small Pox) বা ভেরিওলা বলে। *

* "বসন্তের ইংরাজী নাম পক্স (Pox); ইহা এ্যাংলো স্তাক্সন পঃকা (Pocca) শব্দের অনুজ; ইহার জর্ম্মণ নাম পঃ কে (Pock e); ইহারা সকলেই এক সংস্কৃত স্ফোটক হইতে উৎপন্ন। বাঙ্গলা ভাষায় ফস্কা ও ফুস্কুড়ি শব্দদ্বয়ও স্ফোটক শব্দের অপভ্রংশ। বাঙ্গলা ফস্কা ও ফুস্কুড়ি শব্দ, জর্ম্মণ পঃ কে শব্দ এবং এ্যাংলো স্তাক্সন পঃ কা ও ইংরেজী পক্স ইহারা সকলেই এক গোষ্ঠীর—সকলেই এক পিতৃশব্দ স্ফোটক হইতে উৎপন্ন। ভাষাজ্ঞান আলোচনা করিলে দেখা যায় কতকগুলি অক্ষরের সহিত কতকগুলি অক্ষরের অত্যন্ত সখ্য, যেমন—স'র সহিত হ'র (যেমন, সপ্তাহ হপ্তাহ), প'র সহিত ফ'র (যেমন, সংস্কৃত পুনঃ শব্দ হইতে হিন্দি ফিন ও বাঙ্গলা ফের শব্দ আসিয়াছে), এইরূপ ব'র সহিত ভ'র, ন'র সহিত ল'র ইত্যাদি। এ্যাংলোস্তাক্সন পঃ কা শব্দের প অক্ষরের স্থান যদি ফ অধিকার করে এবং মধ্যগত অক্ষরের উচ্চারণ যদি বিসর্গের ন্যায় না হইয়া স'র উচ্চারণ হয়, তাহা হইলে ফস্কা হইয়া দাঁড়ায়। স, হ এবং বিসর্গ ইহারাও তিনটী র, ল'র ন্যায় অভিন্ন-প্রাণ ("রলয়োরভেদঃ")। সংস্কৃত ভাষায় বিসর্গের উচ্চারণই হ।

Small অর্থ ছোট এবং Pox অর্থ বসন্ত। ডাক্তারিতে কেন যে ইহার নাম স্মলপক্স (Small Pox) অর্থাৎ ছোট বসন্ত রাখা হইয়াছে, তাহা বুঝা যায় না। বাস্তবিক ইহা এক প্রকার জ্বর রোগ। কবিরাজী মতে ইহা স্ফোটক জ্বরের অন্তর্গত। ডাক্তারিতে হাম, বসন্ত প্রভৃতিকে ইরাপটিভ্ ফিভার (Eruptive Fever) বলে। বসন্তকালে এই রোগের বেশী প্রকোপ হয় বলিয়া ইহাকে বসন্ত বলে।

ইহা খুব মারাত্মক, সংক্রামক ও স্পর্শাক্রামক রোগ। ইহা এক শরীর হইতে অন্য শরীরে সংক্রমিত হইয়া থাকে, এই জন্য ইহাকে সংক্রামক রোগ বলে। আর, ইহা ছোঁয়াচে রোগ বলিয়া অর্থাৎ রোগীকে স্পর্শ করিলে এই রোগ হইতে পারে বলিয়া ইহাকে স্পর্শাক্রামক রোগ বলে। সাধারণতঃ নিম্নশ্রেণীর অপরিষ্কার লোকদের মধ্যেই ইহার ভয়ানক প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। শীতপ্রধান দেশ অপেক্ষা গ্রীষ্মপ্রধান

বসন্ত রোগের ল্যাটিন নাম ভেরিওলা (Variola) ফরাসী নাম ভেরল (Verole); উভয়েই এক সংস্কৃত ব্রণ শব্দ হইতে প্রসূত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ব অক্ষরে ভ অক্ষরে এবং ন (অথবা ণ) অক্ষরে ল অক্ষরে সখ্য বশতঃ উহারা পরস্পর পরস্পরের স্থান অধিকার করে, যেমন পূর্ব্ব বঙ্গের লোকেরা ভকে ব উচ্চারণ করে, ইংরেজেরা ব্যাকরণকে ভ্যাকরণ (Vyakaran) লিখে; আমাদের কেহ কেহ নস্যকে লস্যও বলে, আর লেখাপড়াকে নেখাপড়া বলে। কিম্বা সংস্কৃত নষ্ট শব্দ ইংরেজীতে লষ্ট (Lost) হইয়াছে, সেইরূপ ব্রণ শব্দের ব ও ণ, ভ ও লতে ক্রমান্বয়ে পরিণত হইলে "ভ্রল" এইরূপ হয়। ভ্রল ঈষৎ বিকৃত ভাবে উচ্চারিত হইলেই ভেরল হয়। (যেমন আমরা পূর্ণিমাকে পুন্নিমা, নৃপেন্দ্রকে নৃপেন্ বা নেপু, রবিবারকে র'ব্বার ইত্যাদি বলিয়া থাকি।)

পক্স, ভেরল প্রভৃতি শব্দ বসন্ত রোগের নাম হইলেও, স্ফোটক এবং ব্রণ শব্দ হইতে উৎপন্ন হইবার তাৎপর্য্য এই যে আয়ুর্ব্বেদে বসন্তকে স্ফোটকেরই প্রকার ভেদ বলে।

এইরূপ হামের ইংরাজি মিস্‌লস্ (Measles) শব্দটীও সংস্কৃত মসূরিকা হইতে উৎপন্ন। জর্ম্মণ ভাষায় হামকে মাসর্ণ (Masern) বলে। আয়ুর্ব্বেদে হামও মসূরিকার প্রকার ভেদ মাত্র।" শ্রীযুক্ত ঋতেন্দ্র নাথ ঠাকুর রচিত "বসন্ত রোগের নাম তত্ত্ব" দেখ।

দেশেই ইহার প্রাদুর্ভাব বেশী। ভারতবর্ষে, বাঙ্গালা দেশ অপেক্ষা উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ইহার প্রাদুর্ভাব বেশী। উষ্ণপ্রধান দেশে, শীতের আবির্ভাবে, বসন্তের প্রকোপ বৃদ্ধি পায়, আর, গ্রীষ্মের প্রারম্ভে কমিয়া যায়। যে সকল দেশ নাতিশীতোষ্ণ অর্থাৎ যে সকল দেশে বেশী শীতও হয় না, আর বেশী গ্রীষ্মও হয় না, তথায় বসন্ত, শরৎ ও শীত ঋতুতে, বসন্তের প্রকোপ বেশী হয়, কিন্তু গ্রীষ্মকালে অতি অল্প লোকেরই বসন্ত হইয়া থাকে। কখন কখন ইহা কোন কোন স্থানে ২।১ জনকে আক্রমণ করিয়াই নিবৃত্ত হয়, আবার কোন কোন স্থানে ইহা মহামারী রূপে আবির্ভূত হয়। সকল রকমের লোকেই বসন্ত দ্বারা আক্রান্ত হইতে পারে। তবে ৫ বৎসরের নিম্ন বয়স্ক বালকদের পক্ষে ইহা প্রায়ই সাঙ্ঘাতিক হয়। পঞ্চাশ বৎসরের উর্দ্ধ বয়স্ক ব্যক্তির বসন্তও কষ্টসাধ্য হইয়া থাকে। যাহাদের কখনও বসন্ত হয় নাই, তাহাদেরই প্রায় এই রোগ হইয়া থাকে। দেহ দুর্ব্বল থাকিলে ও সেই দেহে বসন্ত রোগ হইলে, উহা প্রায়ই সাঙ্ঘাতিক হয়। যিনি একবার এই রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছেন, তাঁহার আর প্রায় দ্বিতীয় বার এই রোগ হইবার ভয় থাকেনা। তবে কদাচিৎ অন্যথাও ঘটিয়া থাকে। পূর্ব্বে যাঁহাদের টিকা হইয়াছে, তাঁহাদের বসন্ত হইলে উহা প্রায়ই মারাত্মক হয় না।

বসন্তের উৎপত্তির কারণ।

ইহার উৎপত্তির কারণ দ্বিবিধ। (১) বাহির হইতে শরীর মধ্যে এক প্রকার তীব্রবিষ (বসন্তের বীজাণু) প্রবেশ করিয়া এই পীড়া উৎপন্ন করে ও পরে বাতপিত্তাদি দোষ ও রস রক্তাদি ধাতু সকলকে (পরিশিষ্ট দেখ) প্রকুপিত করিয়া এই রোগের বিশেষ বিশেষ লক্ষণ প্রকাশ করে। *

(২) কটু (ঝাল), অম্লরসবিশিষ্ট দ্রব্য, লবণরসবিশিষ্ট দ্রব্য, ক্ষারদ্রব্য, রুক্ষ দ্রব্য, বিরুদ্ধভোজন (ক), বিদাহী-দ্রব্য ভোজন (খ), অধ্যশন (গ), দূষিতঅন্নপানাদি ব্যবহার, দূষিতবায়ু সেবন, ঋতুবৈষম্য (ঘ), গ্রহাদির দৃষ্টি (চ) প্রভৃতি কুৎসিত আহার, বিহার ও অন্যান্য নানা কারণে বাতাদি দোষ কুপিত অর্থাৎ বৈগুণ্য প্রাপ্ত হইয়া ও দুষ্ট রক্তের সহিত মিলিত

---

* শরীর মধ্যে বসন্ত রোগ প্রকাশ পাইবার অনেক কারণ আছে। উপরে (১) ও (২) দেখ। কিন্তু সাধারণের সংস্কার এই যে, সংক্রামক বিষই বসন্তের উৎপত্তির একমাত্র কারণ। প্রকৃত পক্ষে, সংক্রামক বিষ বসন্তের অন্যতম কারণ বটে, কিন্তু ইহার একমাত্র কারণ নহে। কেহ কেহ বলেন, বসন্ত, প্লেগ, কলেরা (ওলাউঠা,) ক্ষয়, কাস প্রভৃতি অনেক সংক্রামক রোগ থাকিলেও, সংক্রামকতা সম্বন্ধে অন্যান্য রোগ অপেক্ষা, বসন্তের দুর্নাম বেশী সন্দেহ নাই এবং পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অনুসন্ধানাদি দ্বারা যাহা আবিষ্কার করিয়াছেন ও তারস্বরে যাহা ঘোষণা করিয়াছেন, তাহারই ফলে বসন্তের এ দুর্নাম বেশী রটিয়াছে এবং লোকেরও ধারণা সেইরূপ হইয়াছে।

(ক) বিরুদ্ধভোজন—"সংযোগ-দেশ-কাল-মাত্রাদিভির্বিরুদ্ধম্"। বিরুদ্ধ ভোজন ৪ প্রকার। সংযোগবিরুদ্ধ, দেশবিরুদ্ধ, কালবিরুদ্ধ, ও মাত্রাবিরুদ্ধ।

সংযোগবিরুদ্ধ—মাংস ও দুগ্ধ একত্র খাইলে উহা সংযোগবিরুদ্ধ হয়।

কালবিরুদ্ধ—শীত ঋতুতে যে সকল দ্রব্য খাওয়া উচিত, তাহা গ্রীষ্মকালে ও গ্রীষ্মকালে যাহা খাওয়া উচিত, তাহা শীতের সময় খাইলে, উহা কালবিরুদ্ধ হয়। প্রতিদিন নিয়মিত সময়ে না খাওয়াও কালবিরুদ্ধ।

দেশবিরুদ্ধ—শীত-প্রধান দেশের উপযুক্ত খাদ্য, গ্রীষ্মপ্রধান দেশে খাওয়া অথবা গ্রীষ্ম-প্রধান দেশের উপযুক্ত খাদ্য শীত-প্রধান দেশে খাওয়াকে দেশবিরুদ্ধ ভোজন বলে।

মাত্রাবিরুদ্ধ—মধু ও ঘৃত প্রভৃতি সমান ভাগে একত্র খাওয়ার নাম মাত্রাবিরুদ্ধ।

(খ) বিদাহীদ্রব্য—"বিদাহিদ্রব্যমুদ্গারমম্লং কুর্য্যাৎ তথা তৃষাম্। হৃদি দাহঞ্চ জনয়েৎ পাকং গচ্ছতি তচ্চিরাৎ।" আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞান। যে দ্রব্য বিলম্বে পরিপাক পায় ও পরিপাক পাইলে অম্লরসে পরিণত হয় ও যাহা খাইলে বুকজ্বালা, অম্লোদ্গার (ঢেকুর) তৃষ্ণা ও হৃদ্‌প্রদাহ উপস্থিত হয়, তাহাকে বিদাহী দ্রব্য বলে। যেমন ভৃষ্ট দ্রব্যাদি (ভাজাপোড়া দ্রব্য)।

হইয়া বসন্ত রোগ জন্মে (ছ)। কেহ কেহ বলেন যে, যেমন মিষ্ট দ্রব্যাদি (চিনি গুড় প্রভৃতি) অগ্নি, আলোক ও বায়ু সংস্পর্শে মাতিয়া উঠে, অর্থাৎ আলোকাদির সংস্পর্শে মধুরাদি দ্রব্যের যেমন উৎপাচন (Fermentation) হয় এবং মাতিয়া উঠিলে যেমন তাহা হইতে সুরা বা মদের সৃষ্টি হয়, সেইরূপ কুৎসিত আহার বিহারাদি দ্বারা, বাতপিত্তাদি দোষ বিশেষরূপে দুষ্ট বা বৈগুণ্য প্রাপ্ত হইয়া রস রক্তাদি ধাতু সকলকে দূষিত করিয়া বসন্তপীড়া জন্মায়। এইরূপে শরীরমধ্যে বসন্তবীজ সমুদ্ভূত হওয়ার পর, বাত-পিত্তাদি দোষের মধ্যে যাহার প্রকোপ বেশী থাকে, তাহার লক্ষণাদি প্রকাশ করিয়া থাকে এবং তাহার নামানুসারেই অভিহিত হইয়া থাকে।

(গ) অধ্যশন—"ভুক্তাং পূর্ব্বান্নশেষেতু পুনরধ্যশনং মতম্"। চরক। "অজীর্ণে ভুজ্যতে যত্তু তদধ্যশন মুচ্যতে" ভাব প্রকাশ। অর্থাৎ আগের দিনের ভুক্তদ্রব্য সম্যক্ পরিপাক না পাইতে পুনর্ব্বার ভোজন করার নাম অধ্যশন। মোটকথা, অজীর্ণসত্ত্বে পুনর্ব্বার ভোজন করার নাম অধ্যশন। ইহার অন্যনাম অজীর্ণাশন। অশন অর্থ ভোজন।

(ঘ) ঋতুবৈষম্য—গ্রীষ্মকালে শীত হওয়া বা শীতকালে গ্রীষ্ম হওয়া।

(চ) গ্রহাদির দৃষ্টি—দেশের উপর শনৈশ্চরাদি ক্রূর গ্রহাদির দৃষ্টি (*i.e.* their position in relation to the earth). গ্রহাদির দৃষ্টির কথা শুনিয়া কেহ কেহ হয়ত ভ্রূকুটি করিতে পারেন। তাঁহাদের নিকট জিজ্ঞাস্য এই যে, অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতে চন্দ্রের আকর্ষণে সমুদ্রের জল স্ফীত হয় ও মানবশরীরে রস বৃদ্ধি হইয়া শরীরের ভাবান্তর হয় কি ? অন্য কোন তিথিতে বা চন্দ্রের ও পৃথিবীর পরস্পরের অন্য কোন অবস্থায় (their relative position এ) ঐরূপ হয় কি ?

আতস পাথর (সূর্য্য-কান্ত মণি) রৌদ্রে ধর। সূর্য্যকিরণ ঐ আতস পাথরে প্রতি-ভাত হইয়া চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইতেছে দেখিতে পাইতেছ। কোন দাহ্যপদার্থ (সহজে যাহা অগ্নি সংযোগে জ্বলিয়া উঠে, এইরূপ পদার্থ——যেমন শুষ্ক পাতা, খড় ইত্যাদি) ঐ আতস পাথরের সম্মুখে ধর এবং ক্রমশঃ পাথরের একটু সম্মুখে বা দূরে ঐ দাহ্য পদার্থ এ দিক্ সে দিক্ করিয়া সরাইয়া লও। বার বার ঐরূপ করাতে দেখিবে যে,

এই শেষোক্ত প্রকারে উৎপন্ন বসন্তকে স্বয়ংজাত মসূরিকা বলা যাইতে পারে। বাহির হইতে যে তীব্র বিষ (বসন্তের বীজাণু) শরীরের ভিতর প্রবিষ্ট হইয়া বসন্ত পীড়া জন্মায়, ঐ বিষ বসন্ত রোগীর বসন্তের পূঁজের ভিতরে, রক্তের মধ্যে, নিশ্বাস প্রশ্বাস ও ঘর্ম্মাদির ভিতরে নিহিত থাকে, রোগীর বসন ভূষণাদির সহিতও সংলগ্ন থাকিতে পারে এবং বায়ুতেও সঞ্চরণ করে। কেহ কেহ বলেন বসন্ত রোগীর শরীর হইতে ছয় প্রকারে বসন্তের বিষ সুস্থ শরীরে প্রবেশ করিতে পারে, যথা—(১) সাক্ষাৎভাবে (Directly) বসন্ত রোগীর শরীর হইতে; (২) বসন্ত রোগীর শব হইতে; (৩) বসন্ত রোগীর পরিধেয় বস্ত্রাদি হইতে; (৪) সুস্থ তৃতীয় ব্যক্তি হইতে বসন্তবীজ অপরের শরীরে নীত হয়; (৫) রুগ্ন ব্যক্তির গৃহের বাতাস হইতে; (৬) বসন্তের টিকা হইতে অর্থাৎ মনুষ্যবসন্তবীজ হইতে যে

কোন এক স্থানে ঐ পদার্থ লওয়া মাত্রই উহা জ্বলিয়া উঠিবে। বিশেষরূপে অনুধাবন করিয়া দেখিলে, দেখিতে পাইবে যে, যেখানে বিকীর্ণ সূর্য্যকিরণ পুঞ্জীভূত হইয়া একত্র মিলিযাছে (অর্থাৎ যে স্থানটী সূর্য্যের ঐ বিকীর্ণ কিরণসমষ্টির কেন্দ্রস্থল বা Focus) সেই স্থানেই ঐ দাহ্য পদার্থ জ্বলিয়া উঠিবে। গ্রহাদির সম্বন্ধেও সেইরূপ অর্থাৎ গ্রহাদি, পৃথিবীর সম্বন্ধে (in relation to the earth) বিশেষ বিশেষ ভাবে অবস্থিত হইলে, বিশেষ বিশেষ ফল প্রদান করিয়া থাকে। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে, ঐ বিষয় সবিস্তারে বর্ণনকরা দুঃসাধ্য। অনুসন্ধিৎসু পাঠক, নিজে কোন জ্যোতিষ গ্রন্থ পাঠ করিবেন অথবা কোন জ্যোতির্ব্বেত্তার নিকট জানিয়া লইবেন।

(ছ)

"কট্বম্ললবণক্ষার বিরুদ্ধাধ্যশনাশনৈঃ।
দুষ্টনিষ্পাবশাকাদ্যৈঃ প্রদুষ্টপবনোদকৈঃ।
ক্রূরগ্রহেক্ষণাচ্চাপি দেশে দোষা সমুদ্ধতাঃ।
জনয়ন্তি শরীরে হস্মিন্ দুষ্টরক্তেন সঙ্গতাঃ।
মসূরাকৃতিসংস্থানাঃ পিড়কাঃ স্যুর্ম্মসূরিকাঃ॥"

নিদানম্।

টিকা দেওয়া হয় তাহা হইতে অর্থাৎ বাঙ্গলা টিকা হইতে। যাহাহউক, ঐ সকল রোগবীজ শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেই বসন্তরোগ জন্মে এবং এই জন্যই বসন্ত রোগীর নিকট বাস করা বা তাহাকে স্পর্শ করা বিপদ্‌জনক। এই প্রকারে উৎপন্ন বসন্তকে আগন্তুক বসন্ত বলা যাইতে পারে। শাস্ত্রে আছে—

"প্রসঙ্গাৎ গাত্রসংস্পর্শান্নিঃশ্বাসাৎ সহভোজনাৎ।
এক শয্যাসনাচ্চৈব বস্ত্রমাল্যানুলেপনাৎ॥
কুষ্ঠং জ্বরশ্চ শোষশ্চ নেত্রাভিষ্যন্দ এব চ।
ঔপসর্গিকরোগাশ্চ সংক্রামন্তি নরান্নরম্॥"

নিদানম্।

ঔপসর্গিকাঃ শীতলিকাদয়ঃ অর্থাৎ ঔপসর্গিক অর্থে বসন্ত প্রভৃতি। অর্থাৎ মৈথুন, গাত্রসংস্পর্শ, নিশ্বাসবায়ুগ্রহণ, একত্র ভোজন, এক শয্যায় শয়ন বা উপবেশন ও দূষিত বস্ত্র বা মাল্য পরিধান হেতু, কুষ্ঠ, জ্বর, রাজযক্ষ্মা, নেত্রাভিষ্যন্দ (চোখ্ উঠা) প্রভৃতি সংক্রামক রোগ সমূহ এক ব্যক্তি হইতে অন্য ব্যক্তিতে সংক্রমিত হয়।

বসন্তের উৎপত্তির কারণ দ্বিবিধ হইলেও, উভয় প্রকারের বসন্তেরই আকৃতি ও লক্ষণাদি এক।

বসন্ত রোগীর ৪টী অবস্থা—(১) প্রচ্ছন্নাবস্থা। এই অবস্থায় রোগবীজ শরীরে প্রবিষ্ট বা উৎপন্ন হইয়া বসন্তের ভাবী নির্গমের আয়োজন করে। (২) প্রথম বারের জ্বরাবস্থা। ইংরেজীতে ইহাকে প্রাইমেরি ফিভার (Primary Fever) বলে। (৩) গুটিকা বাহির হইবারও পাকিবার অবস্থা। (৪) দ্বিতীয় বারের জ্বরাবস্থা। ডাক্তারিতে ইহাকে সেকণ্ডারি ফিভার (Secondary Fever) বলে। বসন্তের টিকা দিলে, ইহার প্রচ্ছন্নাবস্থা প্রায়শঃ ৭ দিন। আর অন্য কারণে উৎপন্ন হইলে,

ইহার প্রচ্ছন্নাবস্থা প্রায় ১২ দিন। এই প্রচ্ছন্নাবস্থার কয়দিন, বিশেষ কোন অসুখ হয় না। কাহারও কাহারও বা সামান্য রকমের অসুখ হয়।

বসন্তের বীজ শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট বা উৎপন্ন হইয়া কয়েকদিন প্রচ্ছন্না-বস্থায় থাকে। প্রচ্ছন্নাবস্থা অর্থাৎ যে অবস্থায় বাহিরে কোন লক্ষণাদি প্রকাশ না করে। শরীরে বসন্ত-বীজ উৎপন্ন বা প্রবিষ্ট হইয়াছে, অথচ বাহিরে এমন কোন লক্ষণ প্রকাশ পায় নাই, যদ্দারা ঠিক করা যাইতে পারে যে ভবিষ্যতে রোগীর বসন্ত হইবে। যতদিন পর্য্যন্ত শরীরের এই অবস্থা থাকে, তাহাকে প্রচ্ছন্নাবস্থা বলে। তারপর, বসন্ত বীজের শক্তিতে বাতপিত্তাদি দোষ কুপিত বা বৈগুণ্যপ্রাপ্ত হইয়া, রস রক্তাদি ধাতু সকলকে দূষিত করত রোগের পূর্ব্বলক্ষণ প্রকাশ করে। সংস্কৃতে এইরূপ একটী শ্লোক প্রচলিত আছে—

"গাত্রভারং শিরঃশূলং নাভিভারং করোতি চ।
চক্ষুঃরক্তং ভয়ঞ্চৈব বসন্তজ্বর জ্ঞাপকম্॥"

অর্থাৎ শরীর অত্যন্ত ভারী বোধ হয় মস্তকে শূলানি, নাভি স্থানে ভার বোধ হয়, চক্ষু রক্তবর্ণ হওয়া, এই সকল লক্ষণ যে জ্বরে উপস্থিত হয়, সেই জ্বরে হাম বা বসন্ত বাহির হইবার খুব সম্ভব। কেহ কেহ বলেন যে, জ্বরের উত্তাপ ১০৪° হইতে ১০৬° ডিগ্রি হইলে এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘাড়ে পিঠে (কোন কোন স্থানে কোমরে) বেদনা থাকিলে, আর মাথা অত্যন্ত ভারী হওয়ায় তুলিতে কষ্ট বোধ করিলে, বিশেষতঃ সেই সময়ে দেশের চারিদিকে বসন্ত হইতে থাকিলে, রোগীর বসন্ত হইবে বলিয়া আশঙ্কা করা যাইতে পারে।

বসন্ত রোগের প্রথম বারের জরে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি উপস্থিত হইয়া থাকে—বসন্তের গুটিকা বাহির হইবাব পূর্ব্বে প্রায়ই কম্প দিয়া জ্বর আসে। এই কম্প ২।৩ বা ততোঽধিক বারও হইতে পারে। ম্যালেরিয়া জ্বরেও কম্প হয় এবং এই জ্বরেও কম্প হয়।

কাজেই, প্রথমে ইহাকে ম্যালেরিয়া জ্বর বলিয়া ভ্রম হইতে পারে। জ্বরের উত্তাপ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়।

নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি বসন্তজ্বরের বিশিষ্টলক্ষণ অর্থাৎ জ্বরে এই লক্ষণগুলি বর্ত্তমান থাকিলে, বসন্ত বাহির হওয়ার খুব সম্ভাবনা। যথা—পেট বেদনা করে, পেট ভারি বোধ হয়, খুব বমন হয় বা বমনের ইচ্ছা হয় (বেশী বমন হওয়াটা দোষের; বেশী বমন হইলে রোগ প্রায়ই সাজ্ঘাতিক হয়), কোমরে ও পিঠের নীচের দিকে বেদনা হয়। এই বেদনা সামান্য ধরণেরও হইতে পারে, আবার চাই কি, তীব্র বেদনাও হইতে পারে। জ্বরের সঙ্গে এইরূপ কোমরে বেদনা থাকাটা বসন্তজ্বরের একটা বিশেষ লক্ষণ। এই বেদনা সর্ব্বশরীরেও হইতে পারে। শিরঃশূল বর্ত্তমান থাকে ও হাত পা কামড়ায়। হাত পা কামড়ানি সময় সময় অসহ্য রকমেরও হইতে পারে। চক্ষু ও মুখ জলভারাক্রান্ত হয়, যেন টস্ টস্ করিতে থাকে। সময় সময় জ্বরের সঙ্গে প্রলাপ (ভুলবকা), আক্ষেপ (খেচুনী, যেমন ছেলেদের তড়কা), মোহ বা ভ্রম থাকে। সর্দ্দির সমস্ত লক্ষণই উপস্থিত হইতে পারে। গায়ে কণ্ডু (চুলকণা), অরতি (মনের অস্থিরতা), তীব্র জ্বর, স্বপ্নাবস্থায় বিভীষিকা দর্শন, চর্ম্মের উপর অল্প অল্প শোথের (ফোলার) ন্যায় উৎপত্তি, চর্ম্ম বিবর্ণ হইয়া যাওয়া ও চক্ষু রক্তবর্ণ হওয়া প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। কেহ কেহ বলেন যে, এই সকল লক্ষণ প্রবলাকারে প্রকাশ পাইলেই যে ভয়ানক বসন্ত বাহির হইবে এমন কোন কথা নাই। তীব্র লক্ষণ সত্বেও সামান্যাকারের বসন্ত বাহির হইতে পারে। তবে ভীষণ বসন্তের পূর্ব্বলক্ষণও ভয়ানক গোছেরই প্রায় হয়।

মন্তব্য—এক সময়ে এক শরীরে যে এই লক্ষণগুলির সমস্তই প্রকাশ পাইবে এমন কোন কথা নাই। তবে তীব্র জ্বর, ঘাড়ে, পিঠে ও কোমরে বেদনা, বমি হওয়া বা বমি বমি ভাব থাকা, শিরঃশূল, মাথাভাব, চক্ষু

রক্তবর্ণ হওয়া এই লক্ষণগুলি প্রায় রোগীতেই থাকে। কেহ কেহ বলেন, মাথা ধরাই বসন্ত হইবার প্রথম লক্ষণ এবং প্রায় সকল রোগীতেই এই লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে। বসন্ত হওয়ার দ্বিতীয় লক্ষণ পৃষ্ঠবেদনা; এমন নিশ্চিত লক্ষণ আর নাই।

বিষের তীব্রতা অনুসারে বসন্তের উদ্‌গমের তারতম্য ঘটে। অর্থাৎ যদি বসন্তের বীজ উৎকট হয় (বিশেষ শক্তিসম্পন্ন হয়) তবে শীঘ্র শীঘ্র গুটিকা বাহির হয়। অন্যথা বিলম্ব ঘটে। শরীরের জীবনী শক্তি (কেহ কেহ ইহাকে পালনী শক্তি বলেন, ডাক্তারিতে ইহার নাম ভাইটাল ফোর্স Vital Force বা ভাইটালিটি Vitality, ডাক্তারিতে ইহাকে রেজিষ্টিং পাওয়ার Resisting Powerও বলে) প্রবলা থাকিলে, হয়ত রোগবীজ আপনা হইতেই নষ্ট হয় অথবা উহার শক্তি খর্ব্ব হইয়া যায়।

উপরোক্ত লক্ষণ গুলিই বসন্ত জ্বরের পূর্ব্বলক্ষণ অর্থাৎ জ্বরের সঙ্গে ঐ সকল লক্ষণ থাকিলে বসন্ত বাহির হইবে বলিয়া আশঙ্কা করা যায়।

যাহা হউক, সাধারণতঃ পূর্ব্বলক্ষণ প্রকাশ পাইবার ৩য় বা ৪র্থ দিনে জ্বরের উত্তাপ কমে ও বসন্ত বাহির হইতে থাকে। কখন কখন ৩য় বা ৪র্থ দিনে বাহির না হইয়া ৭ম বা ৮ম দিনেও বসন্ত বাহির হয়। জ্বরের উত্তাপ কমিবার মুখেই বসন্ত বাহির হইতে আরম্ভ করে। প্রথমে প্রায়ই মুখে ও কপালে অথবা মণিবন্ধ স্থানে (হাতের কব্‌জায়) দেখা দেয়। ২।১ দিন পরেই সর্ব্বশরীরে প্রকাশ পায়। সাধারণতঃ ১০০ হইতে ৩০০ সংখ্যক বসন্ত বাহির হয়। রোগবীজ বিশিষ্ট প্রভাবশালী হইলে হাজার হাজার বাহির হইতে পারে। এইরূপে হাজার হাজার বসন্ত বাহির হইলে রোগীর শরীরের প্রতি দৃষ্টি করিলে, বোধ হয় যেন উহার শরীরের উপর মৌচাক (মৌমাছির চাক) হইয়াছে। বসন্ত বীজের প্রভাব সামান্য হইলে, হয়ত ২।৪টী মাত্র বসন্ত বাহির হইয়াই ক্ষান্ত হয়। বসন্ত বাহির না হওয়া পর্য্যন্ত মাথায়, ঘাড়ে, পিঠে ও কোমরে

যেমন বেদনা থাকে, বসন্ত বাহির হইলে তেমনি আবার ঐ সকল স্থানের বেদনা ও অন্যান্য স্থানের যাতনাদি কমিয়া যায়। বসন্ত যত অধিক সংখ্যক বাহির হয় বা বসন্তের পুঁজ যত অধিক হয়, রোগও তত কঠিন বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। আবার বসন্ত বাহির হইতে না পারিয়া শরীর মধ্যে মিলাইয়া গেলেও রোগ সাজ্ঘাতিক হইয়া উঠে।

কণ্ঠদেশের উর্দ্ধে বেশী পরিমাণ বসন্ত উঠিলে, চক্ষু, মুখ, কপাল প্রভৃতি ফুলিয়া যায়। চক্ষুর ভিতরে বসন্ত হইলে চক্ষু ফোলে, লাল হয়, চক্ষু বেশী মেলিতে পারে না, চক্ষুতে আলোক সহ্য হয় না, কপাল ও মাথার চর্ম্ম টান টান হয়। মুখের ভিতর বসন্ত হইলে লালা স্রাব হইতে থাকে। গলার ভিতর বসন্ত উঠিলে ঢোক গিলিতে কষ্ট হয়। নিশ্বাস পথ সমূহের মধ্যে হইলে শ্বাস, কাস ও স্বরভঙ্গ হয় এবং থুথুর সঙ্গে রক্ত উঠিয়া থাকে।

বসন্তের গুটিকারও ৪টী অবস্থা দেখা যায়। (১) বিন্দু প্রমাণ উদ্গমের অবস্থা ; (২) মসূর কলায়ের মত শক্ত [নিরেট] দানার অবস্থা ; (৩) পক্কাবস্থা ; (৪) শুষ্কাবস্থা।

বসন্তের গুটিকাগুলি সর্ব্ব প্রথমে লাল লাল বিন্দুর আকারে নির্গত হয় অর্থাৎ প্রথমে চর্ম্মের উপরে মশার কামড়ের মত লাল বর্ণের বিন্দুর ন্যায় দেখায়। এই বিন্দুগুলি উদ্গত হওয়ার পর, দ্বিতীয় কি তৃতীয় দিনে, উহারা বড় হইয়া পূর্ণায়তন প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ পরিপুষ্ট হইয়া যতদুর বড় হওয়ার সম্ভব, ততদূর বড় হয় এবং ঐ সময়ে উহাদের অগ্রভাগ তীক্ষ্ণ (ধারাল গোছের) হয়। বসন্তের গুটিকার উপর অঙ্গুলি দিয়া চাপদিয়া নাড়িলে তদভ্যন্তরে যেন সরিষা কি মুগ কলাই আছে এমন শক্ত বোধ হয়। এই সময় সুঁচ দিয়া গুটিকা গালিয়া দিলে, জলের ন্যায় তরল একটু রস নির্গত হয়। গুটিকা উঠিবার ৫ম দিনে, গুটিকার মাথাটা একটু চেপ্টা হয় এবং একটু নোয়ান গোছের হয়, যেন সরার ন্যায় মাঝখানে

টোল খাইয়া যায়। এই অবস্থায় পাকিতে থাকে। মোটের উপর, বসন্ত প্রথমে কঠিন বিন্দুর আকারে উদ্‌গত হয়, মধ্যে সরস ফুস্কুড়িতে পরিবর্ত্তিত হয় ও সর্ব্বশেষে পূঁজপূর্ণ ফোড়াতে পরিণত হইয়া শুষ্ক হয়। প্রথমতঃ গুটিকার চারিদিকে পূঁজ হয় ও মধ্যখানে রস থাকে। এই রস ও পূঁজ পৃথক্ পৃথক্ কোটরে (খোপে) আবদ্ধ থাকে। এই অবস্থায় গালিয়া ঐ রস ও পূঁজ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বাহির করা যাইতে পারে। গালিয়া দিলে মাঝখান হইতে রস পড়ে ও চারিধার (কাঁধ) হইতে পূঁজ পড়ে। এ অবস্থায় রোগীর গাত্র হইতে একরূপ বিশেষ দুর্গন্ধ বাহির হয়। শরীর হইতে এইরূপ দুর্গন্ধ বাহির হওয়াটা বসন্ত রোগের একটা বিশেষ লক্ষণ। পাকিবার সময় গুটিকার চারিধারের চর্ম্ম লাল হয় অর্থাৎ উহার প্রদাহ হয় (প্রদাহ কাহাকে বলে, পরিশিষ্ট দেখ)। ক্রমে গুটিকার সমস্ত অংশে পূঁজ হয়। এই সময় গুটিকাসকল চেপ্টা ও টোল খাওয়া দেখায় না। বেশ গোল গাল বড়ির মত দেখায়। বসন্তের গুটিকার ভিতরে পৃথক্ পৃথক্ কুঠরি বা খোপ থাকে। এই খোপগুলি ছোট বড়ও হয়, আবার সমান আকারেরও হইয়া থাকে। কাজেই গুটিকার কোন একস্থানে গালিয়া দিলে সমস্ত পূঁজ নির্গত হইতে পারে না।

প্রায়শঃ গুটিকা উঠিবার ৭ম বা ৮ম দিবসে, উহারা সম্পূর্ণ পাকে। কখন কখন উহারা আপনিই ফাঁটিয়া যায়। আবার কখন কখন উহাদিগকে গালিয়া দিতে হয়। কতকগুলি গলিয়া যাইবার পর হয়ত আপনিই শুষ্ক হইয়া যায় ও উহাদের ভিতরের, পূঁজ কমিয়া যায়। বিদীর্ণ হইবার পর পূয়ঃ শুকাইয়া মাম্‌ড়ি (মাম্‌ড়ি অর্থাৎ শল্ক বা আঁইস্; ইহাকে কোন কোন স্থানে চামাটি বা চুম্‌টীও বলে। ইংরাজিতে scab বলে) পড়ে অর্থাৎ চটা বাঁধে। খোসের (পাঁচড়াদির) পূঁজ বাহির হইয়া যেমন খোসের গায়ে জমাট বাঁধিয়া থাকে, বসন্তের পূঁজও সেইরূপ বসন্তের গায়ে জমাট বাঁধিতে থাকে। তারপর ১২।১৩ দিন বাদে চুম্‌টীগুলি খসিয়া পড়ে।

চুম্‌টী পড়িয়া গেলে, ঐ স্থানে একটা দাগ হয়। কাহারও কাহারও ঐ স্থান টোল খাইয়া যায়। এই দাগ যাবজ্জীবন থাকিতেও পারে।

বসন্ত রোগিদের মধ্যে কাহারও কাহারও গা এত চুলকায় যে অতিরিক্ত চুলকাইতে গিয়া উহারা গুটিকার মাথা ছিড়িয়া ফেলে। চক্ষুতে বসন্ত হইলে চক্ষু রক্তবর্ণ হয় ও উহা হইতে জল পড়িতে থাকে। কেহ কেহ অন্ধ হইয়াও যায়। সহরে রাস্তার ধারে যে অন্ধগণ ভিক্ষা করিয়া থাকে তাহাদিগের নিকট অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারিবে যে তাহাদের মধ্যে অধিকাংশেরই অন্ধ হওয়ার কারণ চক্ষুতে বসন্ত হওয়া। অন্ননালী ও পাকস্থলীতে বসন্ত হয় না, তবে কদাচিৎ হইতে ও পারে। মূত্রনালীতে বসন্ত হইলে রক্ত প্রস্রাব হয়। নাকের ভিতর বসন্ত হইলে নাক ফোলে ও উহা হইতে স্রাব হইতে থাকে। কর্ণের ভিতর বসন্ত হইলে কাণ পাকে—হয়ত রোগী জন্মের মত কালা হইয়া যায়। বসন্ত বেশী পরিমাণে বাহির হইলে রোগীর মুখ এত বড় দেখায় ও শরীর এত ফুলিয়া যায়:যে রোগীকে দেখিলে ভয় হয় এবং আত্মীয় স্বজনের মনে এমন কোন আশাই হয় না যে ঐ রোগী বাঁচিবে। এইরূপ অবস্থা হইলে, রোগীর পাশ ফেরা কষ্টকর হয়। বাহ্য, প্রস্রাব ত্যাগ করা এক প্রকার অসম্ভব হইয়া উঠে।

বসন্তজ্বরের দুইবার প্রকোপ হয়। প্রথমে গুটিকা বাহির হইবার পূর্ব্বে কম্প দিয়া একবার জ্বর হয়। ইহার নাম প্রথম বারের জ্বর বা প্রাইমেরী ফিভার [Primary Fever]। গুটিকা বাহির হইবার সময় এই জ্বরের উত্তাপ কমিয়া গিয়া প্রায় স্বাভাবিক হয়। পরে গুটিকা সকল পাকিবার সময়ে পুনরায় কম্প দিয়া জ্বর আসে। এই জ্বরের উত্তাপ ১০৪° বা ১০৫° ডিগ্রি পর্য্যন্ত হইতে পারে। গুটিকাসকল ফাঁটিয়া যাইতে আরম্ভ করিলে জ্বর কমে। দ্বিতীয় বারের জ্বর অর্থাৎ সেকেণ্ডারি ফিভার (Secondary Fever) গুটিকার পাকার শঙ্কায় বা

টারসে [সন্তাপে] উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহাকে শঙ্কার জ্বরও বলে। ইংরাজিতে শঙ্কার জ্বরকে সিম্পেথেটিক জ্বর (Sympathetic Fever) বলে। স্ফোটক বাহির হইবার পূর্ব্বে জ্বর খুব থাকে বটে, কিন্তু স্ফোটক বাহির হইবাব সঙ্গে সঙ্গে জ্বর কমিয়া যায় ও তাপ স্বাভাবিক হয়। আবার কাহারও বা ১০০° ডিগ্রির নীচে তাপ নামে না। গুটিকাগুলি যেই পুষ্ট হইতে থাকে, অমনিই জ্বর পুনরায় বাড়িতে থাকে। গুটিকাগুলি সম্পূর্ণ পরিপুষ্ট হইলে জ্বরের উত্তাপ ১০২° হইতে ১০৪° ডিগ্রি কি ততোধিক হইতে পারে। ইহারই নাম দ্বিতীয় বারের জ্বর বা সেকেণ্ডারি ফিভার (Secondary Fever). এই জ্বরের তাপ প্রাতঃকালে ২।১ ডিগ্রি কমে মাত্র। পাকিয়া পুঁজ বাহির হইয়া গেলে, তবে তাপ কমিতে থাকে। যেন, বসন্তবীজ প্রথমে দেহে অতিরিক্ত তাপ জন্মাইয়া, রক্ত ও পিত্তকে বিকৃত করিয়া চর্ম্মের উপর গুটিকা জন্মায়; জন্মাইবার পর কিছু কাল শান্ত থাকে এবং পরে অতিরিক্ত উত্তাপ জন্মাইয়া, বৈশাখের প্রচণ্ড সূর্য্য-কিরণে আম পাকার মত করিয়া, গুটিকাগুলি পাকাইয়া থাকে।

শঙ্কার জ্বর কাহাকে বলে, তাহা সকলের জানা না থাকিতে পারে। মনে কর একজনের পাঁচড়া বা বাগী হইল। এই পাঁচড়া বা বাগী হওয়ার পর জ্বর হইল। এই জ্বর স্বয়ং পীড়া নহে, উপসর্গ মাত্র। বাগীর বা পাঁচড়ার সন্তাপে বা শঙ্কায় এই জ্বরের সৃষ্টি হইয়াছে। এই বাগী বা পাঁচড়া পাকিয়া গিয়া প্রদাহের নাশ হইলেই সঙ্গে সঙ্গে জ্বরও কমিয়া যাইবে। এখানে বাগী বা পাঁচড়া স্বয়ং রোগ এবং জ্বর উপসর্গ মাত্র। আদত রোগের দমন হইলে, উপসর্গাদি আপনিই দূর হইয়া যায়। তবে সময় সময়, উপসর্গাদি মূল পীড়া অপেক্ষাও উৎকট হইয়া রোগীকে বিপদাপন্ন করে। ঐ ঐ অবস্থায় উপসর্গাদির পূর্ব্বে দমন করা, বিশেষ দরকার হইয়া উঠে। যাহাহউক, এই যে পাঁচড়ার শঙ্কায় জ্বর হইল, ইহাকেই শঙ্কার জ্বর বলে।

কোন কোন স্থানে বসন্ত নির্গত হইবার পূর্ব্বে গায়ে এক প্রকার চর্ম্মরোগ বাহির হয়। এই চর্ম্মরোগ লাল লাল বিন্দুর আকারেও বাহির হইতে পারে, আবার, আমবাতের ন্যায়ও বাহির হইতে পারে। কনুইয়ের নিকট, হাত পায়ের বাহিরের দিকে, উরুতের ভিতর, তলপেটের উপর বা জননেন্দ্রিয়ের উপর চর্ম্মরোগ বাহির হয়। কখন কখন সর্ব্বশরীরেও বাহির হইয়া থাকে। এই সমস্ত চর্ম্মরোগ বাহির হইয়া গেলে পর, বসন্ত বাহির হইতে আরম্ভ করে। হাম বা আরক্তজ্বরেও চর্ম্মের এইরূপ অবস্থা হয় বলিয়া ইহাকে হাম বা আরক্তজ্বর বলিয়া ভ্রম হইতে পারে। কোন কোন স্থলে এরূপও দেখা যায় যে, জ্বর প্রথমাবধি শেষ পর্য্যন্ত প্রায় লাগা থাকে। দ্বিতীয় বারের জ্বর হওয়াটা বড় ভাল করিয়া টের পাওয়া যায় না। কোন কোন বসন্ত রোগীর প্রস্রাব পরীক্ষা করিলে প্রস্রাবে এ্যালবুমেন ও রক্ত পাওয়া যায়।

বসন্তরোগে যে সমস্ত উপসর্গ উপস্থিত হইতে পারে, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত গুলি প্রধান। যথা—

(১) শ্বাস যন্ত্রের পীড়া—সান্নিপাতিক পার্শ্বশূল(নিমোনিয়া), সর্দ্দি ও কাস (ব্রংকাইটিস), উরস্তোয় ও পার্শ্বচ্ছদের শূল (প্লুরিসি) ইত্যাদি।

(২) পাকস্থলী বা আমাশয়ের প্রদাহ, অন্ত্রের প্রদাহ, মুখের প্রদাহ, জিহ্বার প্রদাহ, উদরাময়।

(৩) শরীরের নানা স্থান পাকিয়া পূঁজ হইতে পারে।

(৪) পৃষ্ঠাঘাত (কার্ব্বঙ্কল)।

(৫) স্থানে স্থানে দূষিত পচা ঘায়ের উৎপত্তি (গ্যাংগ্রিণ)।

(৬) বিসর্প—এক জাতীয় বিষাক্ত, ছোঁয়াচেও উগ্রধারাণের চর্ম্মরোগ (এরিসিপেলাস)।

(৭) চক্ষুর প্রদাহ, চক্ষুতে ক্ষত হইতে পারে, চক্ষু পচিয়া যাইতে পারে।

(৮) কর্ণের প্রদাহ ও কাণ পাকিয়া যাওয়া।

(৯) মূত্রাধারের প্রদাহ, মূত্রনালীর প্রদাহ, মূত্রদ্বার দিয়া রক্তস্রাব।

(১০) বৃক্ক্ বা কিড্‌নীর প্রদাহ।

(১১) অণ্ডকোষের প্রদাহ।

(১২) যোনির প্রদাহ।

(১৩) শরীরের নানাস্থান দিয়া রক্তস্রাব, রক্তপ্রস্রাব, রক্তকাশ ও রক্তবাহ্য।

[১৪] অন্ত্রাবরণের প্রদাহ [Peritonitis]।

[১৫] পচাজ্বর [পাইমিয়া—দূষিত রক্ত ও পুঁজ হইতে শরীর দূষিত হইয়া যে এক প্রকার জ্বর উৎপন্ন হয়]।

[১৬] বসন্তে কীট জন্মাইতে পারে।

বসন্ত রোগের ভাবিফল।

যদি বিশেষ কোন উপসর্গ আসিয়া যোগ না দেয়, তবে সোজাসুজি বসন্ত সহজেই আরাম হইতে পারে। কঠিন রকমের বসন্তে যদি উপসর্গাদি আসিয়া যোগ দেয়, তবে তাহা প্রায়ই সাঙ্ঘাতিক হইয়া থাকে। মৃত্যু হইবার হইলে সাধারণতঃ ৮ হইতে ১৩ দিনের মধ্যেই হয়। সাধারণতঃ ১১ দিনের দিনই রোগী মরে। নানাপ্রকারে এই মৃত্যু উপস্থিত হইতে পারে। উত্তাপ বৃদ্ধি হইয়া রোগী মারা পড়িতে পারে। সাধারণতঃ রোগী ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া ও শ্বাসরুদ্ধ হইয়া মারা পড়ে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ৫ম বৎসরের নিম্ন বয়স্ক ও পঞ্চাশৎ বৎসরের ঊর্দ্ধ বয়স্ক লোকের বসন্ত প্রায়ই মারাত্মক হয়। নিমোনিয়া হওয়া, কিড্‌নীর প্রদাহ থাকা, অত্যন্ত উদরাময় হওয়া অথবা অত্যধিক রক্তস্রাব হওয়া অথবা রোগীর ক্রমশঃ দুর্ব্বল হওয়া, খারাপ লক্ষণের মধ্যে পরিগণিত। রোগী যদি বসন্ত হইবার পূর্ব্বে টিকা লইয়া থাকে, তবে তাহার পক্ষে ভাবিফল প্রায়ই আশাজনক।

যে কোন কারণেই হউক, বসন্ত হইবার পূর্ব্বে যদি রোগীর শরীর বিশেষ দুর্ব্বল থাকে ও ঐ দুর্ব্বল অবস্থায় যদি তাহার বসন্ত হয়, তবে তাহার পক্ষে বসন্ত প্রায়ই মারাত্মক হয়। বসন্ত যদি হঠাৎ লাট খাইয়া যায় অর্থাৎ উঠিয়া পুনরায় শরীরমধ্যে মিলাইয়া যায়, অথবা যদি জ্বরের উত্তাপ অত্যন্ত অধিক হয়, সঙ্গে সঙ্গে যদি বিকার থাকে, অথবা কোমরে অত্যন্ত বেদনা থাকে, অথবা যদি রোগীর অতিশয় বমন হয়, তবে রোগীর অবস্থা আশঙ্কা-জনক মনে করিতে হইবে। বসন্ত ভালরূপে বাহির না হওয়াও দোষের কথা। মাথায় অত্যধিক বসন্ত হওয়ার দরুণ মাথা যদি অত্যন্ত ফুলিয়া যায়, বিশেষতঃ এই মাথা ফুলার সঙ্গে সঙ্গে যদি প্রলাপ [ভুলবকা] থাকে, তবে রোগীর অবস্থা আশঙ্কাজনক বলিয়া বুঝিবে। গর্ভিণীর বসন্ত হইলে, উহা তাহাদের পক্ষে প্রায়ই সাঙ্ঘাতিক হয়। শরীরে কাল বর্ণের দাগ হওয়া অথবা মাথায় ও মুখে এরিসিপেলাস নামক চর্ম্মরোগ হওয়াও দুর্লক্ষণের মধ্যে গণ্য।

এখন বাতপিত্তাদি ভেদে বসন্তের কি কি লক্ষণ হয় দেখ। বাত-পিত্তাদি ভেদে বসন্ত ৫ প্রকার, যথা—

[১] বাতজা মসূরী ; ইহার লক্ষণ এইরূপ—

"স্ফোটাশ্যাবারুণা রুক্ষাস্তীব্রবেদনয়ান্বিতাঃ।
কঠিনাশ্চিব পাকাশ্চ ভবন্ত্যনিল সম্ভবাঃ॥
সন্ধ্যস্থি পর্ব্বণাং ভেদঃ কাসঃ কম্পোঽরতিঃ ক্লমঃ।
শোষস্তাল্বোষ্ঠ জিহ্বানাং তৃষ্ণা চারুচিসংযুতাঃ॥"

নিদানম্।

অর্থাৎ বাতজা মসূরিকাতে স্ফোটক সমূহ শ্যাবারুণবর্ণ [অর্থাৎ গুটিকা-সকল দেখিতে কৃষ্ণ পীত মিশ্রিত বর্ণ], রুক্ষ [স্নিগ্ধের বিপরীত], তীব্র-বেদনাযুক্ত ও স্পর্শে কঠিন হয় এবং ইহার গুটিকাসকল বিলম্বে পাকে। ইহাতে সন্ধি, অস্থি ও পর্ব্বসমূহে ভেদনবৎ [ভঙ্গবৎ] বেদনা হয় ও

কাস, কম্প, মনের অস্থিরতা, ক্লান্তি, অরুচি ও তৃষ্ণা হয় এবং তালু, ওষ্ঠ ও জিহ্বার শোষ হয়। ইহার গুটিকা হইতে অল্প স্রাব হয়।

[২] পিত্তজা মসূরী ; ইহার লক্ষণ এইরূপ—

"রক্তাঃ পীতাঃ সিতাঃ স্ফোটাঃ সদাহাস্তীব্রবেদনাঃ।
ভবন্ত্যচিরপাকাশ্চ পিত্তকোপ সমুদ্ভবাঃ॥
বিড়্ভেদশ্চাঙ্গমর্দ্দশ্চ দাহস্তৃষ্ণারুচিস্তথা।
মুখপাকোঽক্ষিরাগশ্চ জ্বরস্তীব্রঃ সুদারুণঃ॥"

নিদানম্।

অর্থাৎ পৈত্তিক মসূরিকাতে স্ফোটক সমূহ রক্ত, পীত অথবা শুক্লবর্ণ এবং দাহ ও তীব্রবেদনা যুক্ত হয়। ইহার গুটিকাসকল অতি শীঘ্র পাকে। ইহাতে রোগীর মলরেচন [মলভেদ বা পাতলা দাস্ত], দাহ, তৃষ্ণা, অরুচি, অরতি [মনের অস্থিরতা], তীব্রজ্বর, মুখপাক [মুখ পাকা], অঙ্গমর্দ্দ [শরীরে বেদনা], চক্ষু লাল হওয়া, তীব্রজ্বর ইত্যাদি লক্ষণ হয়।

[৩] রক্তজা মসূরিকা ; ইহার লক্ষণ এইরূপ—

"রক্তজায়াং ভবন্ত্যেতে বিকারাঃ পিত্তলক্ষণাঃ॥"

নিদানম্।

অর্থাৎ রক্তজা মসূরিকার লক্ষণাদি পিত্তজা মসূরিকার লক্ষণাদির তুল্য। মসূরীবীজ প্রভাবে পিত্ত দূষিত হইয়া পিত্তজা মসূরিকা হয়, আর রক্ত দূষিত হইয়া রক্তজা মসূরিকা উৎপন্ন হয়।

[৪] শ্লৈষ্মিক মসূরী ; ইহার লক্ষণ এইরূপ—

"কফপ্রসেকঃ স্তৈমিত্যং শিরোরুগ্ গাত্রগৌরবম্।
হৃল্লাসঃ সারুচির্নিদ্রা তন্দ্রালস্য সমন্বিতা॥
শ্বেতাঃ স্নিগ্ধা ভৃশং স্থূলাঃ কণ্ডুরা মন্দবেদনাঃ।
মসূরিকাঃ কফোত্থাশ্চ চিরপাকাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥"

নিদানম্।

অর্থাৎ কফোত্থিত মসূরিকার পিড়কা সমূহ, শ্বেতবর্ণ, অতিস্নিগ্ধ, স্থূলাকার এবং কণ্ডূ ও মন্দ বেদনাযুক্ত হয়। ইহার গুটিকাসকল বিলম্বে পাকে। রোগীর গাত্রগুরুতা [শরীর ভার], শিরঃপীড়া, আলস্য, তন্দ্রা ও নিদ্রা হয়। রোগীর মুখ হইতে কফস্রাব [লালাস্রাব] হয়। বিবমিষা [বমনোদ্‌বেগ অর্থাৎ বমন করিবার ইচ্ছা] ও অরুচি হয়। স্তৈমিত্য অর্থাৎ জড়তা বর্ত্তমান থাকে।

[৫] সান্নিপাতিক মসূরিকা ; ইহার লক্ষণ এইরূপ—

"নীলাশ্চিপিটবিস্তীর্ণা মধ্যে নিম্না মহারুজাঃ।
চিরপাকাঃ পূতিস্রাবাঃ প্রভূতাঃ সর্ব্বদোষজাঃ॥
কণ্ঠরোধারুচিস্তম্ভ প্রলাপা রতি সঙ্গতাঃ।
দুশ্চিকিৎস্যাঃ সমুদ্দিষ্টাঃ পিড়কাশ্চর্ম্ম সংজ্ঞিতাঃ॥"

নিদানম্।

অর্থাৎ ইহার পিড়কা সকল চিপিটকের ন্যায় [চিড়ার ন্যায়] হয়, অর্থাৎ মনে হয় যেন কেহ চর্ম্মের উপর কতকগুলি চিড়া ছড়াইয়া দিয়াছে। ইহার পিড়কাসকল বিস্তৃত, মধ্য-নিম্ন ও অতিশয় বেদনা বিশিষ্ট হয় এবং বিলম্বে পাকে। পিড়কা সকল পাকিলে উহাদিগহইতে দুর্গন্ধযুক্ত অতিশয় পূয়ঃ স্রাব হয়। ইহাতে নানা বর্ণের ও নানা আকারের পিড়কা সকল উৎপন্ন হয়। তীব্রজ্বর, কাস, হিক্কা, মোহ, দাহ, মুখ, নাসিকা ও নয়ন হইতে রক্তস্রাব প্রভৃতি বহু লক্ষণ প্রকাশ পায়। ইহাকে চর্ম্মদল বা চামদল বসন্ত বলে। ইহা প্রায় অসাধ্য।

মন্তব্য—রক্ত ও পিত্তের প্রকোপ ব্যতীত [বৈগুণ্য ব্যতীত] অর্থাৎ রক্ত ও পিত্ত দূষিত না হইলে কোন প্রকারের বসন্ত উৎপন্ন হয় না। অর্থাৎ সকল প্রকারের বসন্তেই রক্ত ও পিত্তের দুষ্টি বর্ত্তমান থাকে। দুষ্ট রক্ত ও পিত্ত [দূষিত রক্ত ও পিত্ত] চর্ম্মকে দূষিত করিয়া নানা প্রকারের পিড়কা সকল উৎপন্ন করে। এই সকল পিড়কা বা স্ফোটকের নামই

বসন্ত। সকল রোগেরই মূল কারণ, বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা। বায়ু পিত্ত কফের লক্ষণ নাই অর্থাৎ কোথাও বা বায়ুর প্রকোপের, কোথাও বা পিত্তের প্রকোপের, কোথাও বা শ্লেষ্মার প্রকোপের, কোথাও বা বায়ু ও শ্লেষ্মা উভয়ের প্রকোপের, কোথাও বা পিত্ত ও শ্লেষ্মা উভয়ের প্রকোপের কোথাও বা বায়ু ও পিত্ত উভয়ের প্রকোপের, আর কোথাও বা বায়ু, পিত্ত, কফ এই তিনেরই প্রকোপের লক্ষণ নাই এমন কোন রোগই হইতে পারে না। ফলতঃ শারীরিক সমস্ত রোগই, হয় বায়ু পিত্ত কফের প্রকোপ হইতে উৎপন্ন অথবা উহাদের সঙ্গে সম্বন্ধ বিশিষ্ট। এখানে বলা আবশ্যক যে, ব্যাধি দ্বিবিধ; শারীরিক ও মানসিক। * মানসিক ব্যাধি রজঃ ও তমো গুণের বিকৃতি হইতে উৎপন্ন হয়। ‡ তবে, শারীরিক

---

* মহাভারতের শান্তি পর্ব্বেও আছে (৺কালী প্রসন্ন সিংহের মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ১৬শঅধ্যায়, যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীমের উপদেশ—দেখ) "ব্যাধি দ্বিবিধ; শারীরিক ও মানসিক। এই উভয়বিধ ব্যাধি পরস্পরের সাহায্যে পরস্পর উৎপন্ন হয়। একের সাহায্য না থাকিলে অন্য উৎপন্ন হয় না। শরীর অসুস্থ হইলে মনের অসুখ ও মন অসুস্থ হইলে শরীরের অসুখ হয়। যে ব্যক্তি অতীত শারীরিক বা মানসিক দুঃখ স্মরণ করিয়া অনুতাপিত হয়, সে দুঃখদ্বারা দুঃখ লাভ করে। কফ, পিত্ত, বায়ু এই তিনটী শারীরিক গুণ। যাহাদের এই তিন গুণ সমভাবে থাকে তাহাদিগকে সুস্থ, আর যাহাদের এই গুণত্রয়ের মধ্যে অন্যতরের বৈলক্ষণ্য ঘটে তাহাদিগকে অসুস্থ বলা যায়। পণ্ডিতেরা উষ্ণ দ্বারা কফের ও শীতল দ্রব্য দ্বারা পিত্তের প্রশমন করিবার উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক, রোগের প্রতিবিধান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। শরীরের ন্যায় মনেরও ৩টী গুণ আছে। সেই গুণত্রয়ের নাম সত্ত্ব, রজঃ, ও তমঃ। যাহাদের এই গুণত্রয় সুসামঞ্জস্যভাবে থাকে, তাহারাই সুস্থ। এই গুণত্রয়ের মধ্যে কোন গুণের বৈলক্ষণ্য ঘটিলে, তাহার প্রতিবিধান করা আবশ্যক। শোকদ্বারা হর্ষবেগ ও হর্ষদ্বারা শোকবেগ নিরুদ্ধ হইয়া থাকে। অনেকে সুখ সম্ভোগ কালে দুঃখ স্মরণ ও দুঃখের সময় সুখ স্মরণ করিয়া থাকে।"

‡ সত্ত্ব গুণের বিকার নাই।

ব্যাধির সহিত গুণের [সত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিনটী গুণ] এবং মানসিক ব্যাধির সহিত দোষেরও [বায়ু, পিত্ত, কফ, ইহাদের নাম ত্রিদোষ—পরিশিষ্ট দেখ] সম্বন্ধ থাকে। যাহাহউক, যেখানে এই তিনটী দোষের [বায়ু পিত্ত কফের] কোন একটী লক্ষণ স্পষ্ট পাওয়া যায় ও অন্য দুইটী দোষের আভাস মাত্র থাকে, তথায় তাহাকে সেই ব্যক্তলক্ষণ দোষের নামানুসারেই অভিহিত করা যায় এবং সেই অনুসারেই তাহার চিকিৎসা করা যায়। যেমন ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ এবং ০ শূন্য এই কয়েকটী রাশি ভিন্ন কোন সংখ্যা নাই, অর্থাৎ যেরূপ ভাবেই সংখ্যা লিখ না কেন, যে নূতন মূর্ত্তিতেই সংখ্যা আন না কেন, ঐ সকল রাশির কোন একটী বা দুইটী বা ততোঽধিক রাশি বা ঐ সকলের ভগ্নাংশ, ডাইনে বা বামে দিতে হয়, সেইরূপ প্লেগই বল, বসন্তের নানাপ্রকার প্রকারভেদই বল, রোগ যে কোন নূতন মূর্ত্তিতে বা নূতন নামেই আসুক না কেন, তাহারা হয়, বায়ু পিত্ত কফের বিকৃতি হইতে উৎপন্ন, অথবা উহাদের সহিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট হইবেই হইবে। অর্থাৎ সেই রোগ, হয়, বাতিক না হয় পৈত্তিক, না হয় শ্লৈষ্মিক ইত্যাদি রূপ হইবে *। বায়ু পিত্ত কফের বিবরণ পরিশিষ্টে দেখ।

---

* প্লেগও রোগ নয়, বসন্তও রোগ নয়, জ্বরও রোগ নয়। বায়ু পিত্ত কফের সমতাই (When they are in equillibrium) সুস্থতা, আর উহাদের বৈষম্যই রোগ। বায়ু, পিত্ত, কফ বুঝিতে পারিলে সকল রোগই চিকিৎসা করা যায়। ফলতঃ কোন রোগের নিশ্চিত কোন নামকরণ করিয়া কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে উহার চিকিৎসা করা উৎকৃষ্ট চিকিৎসা নহে। বাতিকধাতে, পৈত্তিকধাতে, শ্লৈষ্মিক ধাতে প্লীহা রোগ হইলে, কোন এক বাধা প্রণালীর চিকিৎসা বা কোন নির্দ্দিষ্ট ঔষধ দ্বারা উক্ত প্লীহার চিকিৎসা করিলে উপকার হইতেও পারে আবার নাও হইতে পারে। রোগীর ধাত, বয়স, কোষ্ঠাদি বিবেচনা করিয়া চিকিৎসার বিভিন্নতা করা আবশ্যক হয়। বাগ্‌ভট বলেন "রোগ কেবল ৩টী, যথা, বায়ু, পিত্ত ও কফ। তাহাদের ঔষধও যথাক্রমে ৩টী, যথা, তৈল, ঘৃত ও মধু। এই মাহাসূত্র অবশ্যই ব্রহ্মবাক্য। মানব যেন ইহার প্রতিবাদ করিতে সাহস

যাহাহউক, প্রকুপিত দোষ অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত, কফ, যে ধাতু [রস রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র ইহারাই হইল সপ্তধাতু। ধাতুদিগের বিবরণ পরিশিষ্টে দেখ] আশ্রয় করিয়া মসূরিকা পীড়া উৎপাদন করে, কবিরাজী গ্রন্থে সেই সেই রোগ সেই সেই ধাতুগত মসূরিকা নামে অভিহিত হইয়া থাকে। যেমন, রসজা মসূরিকা, রক্তজা মসূরিকা ইত্যাদি। সকলপ্রকার বসন্ত রোগেই বায়ু পিত্ত কফের মধ্যে যে দোষ

না করে।" "চরক সংহিতার প্রত্যেক অধ্যায়ই ৩ শ্রেণীর লোকের জন্য লিখিত হইয়াছে—উৎকৃষ্ট বুদ্ধি, মধ্যম বুদ্ধি, ও অধম বুদ্ধি। অমুক রোগের স্বভাব উষ্ণ, উহার চিকিৎসা সুতরাং তদনুরূপ হওয়া উচিত, উৎকৃষ্ট বুদ্ধিদের জন্য এই মাত্র বলা হইয়াছে। পরে মধ্যম বুদ্ধিদের জন্য বলা হইয়াছে যে, ঐ রোগের চিকিৎসায় তিক্তকগণ আবশ্যক, কারণ তিক্তকগণ শীতল। অনন্তর অধম বুদ্ধিদিগের জন্য প্রকাশ করিয়া বলা হইয়াছে যে, ঐ রোগের চিকিৎসায় নিমছাল, বাসক, গুলঞ্চ প্রভৃতির পাচন প্রয়োগ করিতে হয়।" বাতরক্ত রোগে অমৃতাদি পাঁচন দিতে হইবে এই আদেশ অধম বুদ্ধিদিগের জন্যই উপদিষ্ট হইয়াছে। "সাধারণ দৃষ্টিতে রোগসমূহ যে কোনরূপ নূতন মূর্ত্তিধারী বলিয়াই বিবেচিত হউক, সুচিকিৎসকের জ্ঞান চক্ষুর নিকট তাহাদের নূতন লক্ষণ নাই। এই সকল নবাগত রোগও কতকগুলি পুরাতন ও পরিমিত লক্ষণে জড়িত। কখন সেই সকল লক্ষণের সমষ্টি, কখনও বা ব্যষ্টি মাত্র।

"যথা শকুনিঃ সর্ব্বাং দিশং পরিপতন্নপি স্বাং ছায়াং নাতিবর্ত্ততে।
তথা স্বধাতুবৈষম্যনিমিত্তাঃ সর্ব্বে বিকারা বাতপিত্তকফান্নাতিবর্ত্তন্তে।"

চরক

অর্থাৎ যেমন পক্ষী সর্ব্বদিক পরিভ্রমণ করিয়াও কোন প্রকারেই স্বকীয় ছায়া অতিক্রম করিতে পারে না, ছায়া তাহার অনুগামিনী হয়ই হয়, তেমনি স্বধাতুবৈষম্য-জাত রোগ সমূহও বাত, পিত্ত এবং কফ অতিক্রম করিতে পারে না, ইহারা সেই সকল রোগের অনুবর্ত্তী হয়ই হয়। পরন্তু সূত্রানুসারে নূতন নূতন স্থলে তদুপযোগী নূতন নূতন চিকিৎসা-পদ্ধতি কল্পনা করিতে চিকিৎসকের প্রচুর উদ্ভাবনী শক্তি এবং শাস্ত্রের সর্ব্বাংশে সম্পূর্ণ ব্যুৎপত্তি থাকা আবশ্যক; সুতরাং সাধারণের পক্ষে এই পদ্ধতি সরল নয়।"

প্রকুপিত হওয়াতে রোগের আরম্ভ অর্থাৎ সৃষ্টি হইয়াছে তাহার লক্ষণ নিশ্চয়ই প্রকাশ পায়। এই বায়ু, পিত্ত কফ আবার রস রক্তাদি সপ্তধাতু আশ্রয় করিয়া আরও কতকগুলি লক্ষণ প্রকাশ করে এবং সেই দরুণে বসন্তেরও ভিন্ন ভিন্ন নাম হয়, যথা—

[১] রসগতা মসূরিকা ; ইহার লক্ষণ এইরূপ—

"তোয়বুদ্বুদ সঙ্কাশাস্ত্বগ্ গতাস্তমসূরিকাঃ ।
সল্পদোষাঃ প্রজায়ন্তে ভিন্নাস্তোয়ং স্রবন্তিচ ॥"

নিদানম্।

অর্থাৎ রসগতা মসূরিকার পিড়কা সমূহ, জলপূর্ণ বুদ্বুদসদৃশ হয় এবং ভিন্ন হইলে জলবৎ স্রাব নির্গত করিয়া থাকে। এই রোগে দোষের অল্পতা এবং দূষ্যের প্রাধান্য থাকে, এই হেতু ইহা সুখসাধ্য। দোষ ও দূষ্য সম্বন্ধে পরিশিষ্ট দেখ। রসগতা মসূরিকার চলিত নাম পানিবসন্ত বা জলবসন্ত। কেহ কেহ পান বসন্তও বলে। ডাক্তারি নাম চিকেন্‌পক্‌স (Chicken Pox) বা ভেরিসেলা। ছেলেরা কৌতুক করিয়া বলে ওয়াটার পক্‌স [Water Pox]. ইহা যদিও সংক্রামক ও স্পর্শাক্রামক [ছোঁয়াচে] রোগ বটে, কিন্তু আদত বসন্তের ন্যায় মারাত্মক নহে। ইহা অতি সামান্য পীড়া মাত্র। হাম, বসন্ত, পানিবসন্ত প্রভৃতি ফাল্গুন চৈত্র মাসেই বেশী হয়। হাম অন্য সময়েও হইয়া থাকে। আদত বসন্তের ন্যায় ইহারও ৪টী অবস্থা,—[১] প্রচ্ছন্নাবস্থা—এই অবস্থা ১০ হইতে ১৬ দিন পর্য্যন্ত থাকিতে পারে। [২] আক্রমণের অবস্থা—এই অবস্থায় কাহারও কাহারও শীত করিয়া জ্বর আসে, বমন ও শিরঃপীড়া হয়। তৎপর সেই জ্বরের দিনেই হউক কি তৎপর দিনেই হউক, বসন্ত বাহির হয়। জ্বর মোটেই না হইয়া একবারেও এই বসন্ত বাহির হইতে পারে। বসন্ত বাহির হইবার অবস্থা ৪।৫ দিন হইতে ১০।১২ দিন পর্য্যন্ত থাকে অর্থাৎ এই কয়েক দিন ক্রমাগত বসন্ত বাহির হইতে থাকে। বসন্ত

পৃথক পৃথক ভাবে অর্থাৎ ছাড়া ছাড়া ভাবে বাহির হয়। হয়ত ইহার ২।১টা মিলিয়াও যায়। প্রকুপিত বায়ু, পিত্ত, কফ রসধাতু আশ্রয় করিয়া এই রোগ উৎপাদন করে। এই বসন্তের গুটিকা প্রথমে কাঁধে বা তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে ও বক্ষঃস্থলে বাহির হয়। পরে সর্ব্বাঙ্গে বাহির হইয়া থাকে। গুটিকাগুলি দেখিতে জলপূর্ণ বুদ্বুদের ন্যায়। গরম জল গায়ে লাগিলে যেমন ফোস্কা হয়, গুটিকাগুলি দেখিতে সেইরূপ বলিয়া, এই রোগের নাম পানিবসন্ত বা জলবসন্ত। গুটিকাগুলির মধ্যে কতকগুলি গোলাকার ও কতকগুলি ডিম্বাকার হয়। গুটিকা গালিয়া দিলে তন্মধ্য হইতে ঘোলাজলের ন্যায় স্রাব নির্গত হয় ও গুটিকা চুপ্‌সিয়া যায়। আদত বসন্তের গুটিকার ন্যায়, এই বসন্তের গুটিকার ভিতর খোপ্ খোপ্ [কুঠরি] নাই। সুতরাং স্থানে স্থানে গালিয়া দিতে হয় না। গুটিকার চারিদিকের চর্ম্মের প্রদাহ প্রায় হয় না। গুটিকার উদ্‌গমের পর তৃতীয় বা পঞ্চম দিনে উহারা আপনা হইতেই বিদীর্ণ হয় ও শুকাইয়া যায়। পরে পাতলা খোস বা চুম্‌টী উঠিয়া যায়। ডাক্তারি শাস্ত্রে বলে যে জলবসন্তের ভিতরে পূয়ঃ জন্মে না। কিন্তু "ন পাকঃ পিত্তং বিনা" অর্থাৎ পিত্ত ভিন্ন পাকায় না। পিঁত্তের প্রকোপ বেশী থাকিলে জলবসন্ত পাকিয়া পূঁজ জন্মাইয়াও থাকে। খোস উঠিবার পর কিছুদিন পর্য্যন্ত দাগ থাকে, কিন্তু আদত বসন্তের দাগের ন্যায় ইহার দাগ চিরস্থায়ী হয় না। প্রচ্ছন্নাবস্থায় ইহাকে আদত বসন্ত বলিয়া ভ্রম হইতে পারে। পানিবসন্তের গুটিকার মধ্যভাগ সূক্ষ্মাগ্র ও আদত বসন্তের গুটিকা চেপ্টা।

জলবসন্তে চুলকানি ভিন্ন, রোগীর অন্য কোন যন্ত্রণা হয় না। বসন্ত বাহির হইলে, উহার শঙ্কায় [সন্তাপে বা টারসে] সামান্য একটু জ্বর হয়। কখন কখন সর্দ্দি কাশি হয়, দৈবাৎ ব্রংকাইটিসও হইতে পারে। ইহার ভাবিফল শুভজনক, যে হেতু ইহা অতি সামান্য পীড়া।

[২] রক্তগতা মসূরিকা ; ইহার লক্ষণ এইরূপ—

"রক্তস্থা লোহিতাকারা শীঘ্রপাকাস্তনুত্বচঃ।
সাধ্যানাত্যর্থ দুষ্টাশ্চ ভিন্না রক্তং স্রবন্তিচ॥"

নিদানম্।

অর্থাৎ ইহার পিড়কা সকল লোহিত বর্ণ হয় ও পাতলা ত্বকে আবৃত থাকে অর্থাৎ গুটিকার ছাল পাতলা হয় এবং ইহা শীঘ্র পাকে। গুটিকা গালিয়া দিলে রক্ত নিঃসৃত হয়। ইহা সাধ্য রোগ।

[৩] মাংসগতা মসূরিকা ; ইহার লক্ষণ এইরূপ—

"মাংসস্থাঃ কঠিনাঃ স্নিগ্ধাশ্চির পাকা চলত্বচঃ।
গাত্রশূল তৃষ্ণাকণ্ডু জ্বরারতি সমন্বিতাঃ॥"

নিদানম্।

অর্থাৎ ইহার গুটিকাসকল কঠিন ও স্নিগ্ধ এবং স্থূল চর্ম্ম বিশিষ্ট অর্থাৎ উহাদের ছাল পুরু হয়। গুটিকাসকল বিলম্বে পাকে। জ্বর, তৃষ্ণা, অস্থিরতা গাত্রবেদনা ও শরীরে চুলকণা হয়। ইহাতে শরীরে শূলের ন্যায় বেদনা হয়। ইহা কৃচ্ছ্র সাধ্য ব্যাধি অর্থাৎ অনেক কষ্টে আরাম হয়।

[৪] মেদোগতা মসূরিকা ; ইহার লক্ষণ এইরূপ—

"মেদোজা মণ্ডলাকারা মৃদবঃ কিঞ্চিদুন্নতাঃ।
ঘোরজ্বর পরীতাশ্চস্থূলাঃ স্নিগ্ধাঃ সবেদনাঃ।
সংমোহারতি সন্তাপাঃ কশ্চিদাভ্যো বিনিস্তরেৎ॥"

নিদানম্।

অর্থাৎ ইহার গুটিকাসকল দেখিতে স্থূল ও গোলাকার, কোমল ও কিঞ্চিৎ উন্নত ও বেদনাযুক্ত হয়। ইহাতে তীব্রজ্বর হয়, রোগী অধীর হয়, মূর্চ্ছিতও হইয়া থাকে। এই রোগ হইলে রোগী কদাচিৎ মুক্তি পায়। অর্থাৎ ইহা অসাধ্য রোগের মধ্যেই ধর্ত্তব্য।

[(৫) ও (৬)] অস্থি ও মজ্জাগতা মসূরিকা ; ইহার লক্ষণ এইরূপ—

"ক্ষুদ্রাগাত্রসমা রুক্ষাশ্চিপিটাঃ কিঞ্চিদুন্নতাঃ।
মজ্জোত্থা ভৃশসংমোহবেদনারতিসংযুতাঃ॥
ছিন্দন্তি মর্ম্মধামানি প্রাণানাশু হরন্তি হি।
ভ্রমরেণেব বিদ্ধানি ভবন্ত্যস্থীনি সর্ব্বতঃ॥"

নিদানম্।

অর্থাৎ অস্থি ও মজ্জাগতা মসূরীকাতে পিড়কা সকল ছোট ছোট হয়। শরীরের বর্ণের ন্যায় ইহাদের বর্ণ হয়। পিড়কা গুলি দেখিতে রুক্ষ কিঞ্চিৎ উন্নত এবং চিপিটক বা চিড়াব ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট হয়। ইহাতে মোহ, চিত্তবিভ্রম, বেদনা ও চিত্তচাঞ্চল্য বর্ত্তমান থাকে। মর্ম্মস্থান সকল যেন বিচ্ছিন্ন হইতে থাকে এবং ভ্রমরে যেন সর্ব্বাঙ্গেব অস্থিব ভিতর হুল ফুটাইয়া উহাদিগকে সচ্ছিদ্র কবিতেছে এরূপ বোধ হয়। ইহা আশু প্রাণনাশক।

[৭] শুক্রগতা মসূরিকা ; ইহার লক্ষণ এইরূপ—

"পক্কাভাঃ পিড়কাঃ স্নিগ্ধাঃ সূক্ষ্মাশ্চাত্যর্থ বেদনাঃ।
স্তৈমিত্যাবতি সংমোহ দাহোন্মাদ সমন্বিতাঃ॥
শুক্রজায়াং মসূর্য্যান্তু লক্ষণানি ভবন্তি হি।
নির্দ্দিষ্টং কেবলং চিহ্নং দৃশ্যতে নতু জীবিতম্॥

নিদানম্।

অর্থাৎ শুক্রগত মসূরিকাতে পিড়কা সকল মসৃণ, সূক্ষ্ম ও অত্যন্ত বেদনাযুক্ত হয়। পিড়কার আকৃতি দেখিয়া পক্ক কি অপক্ক স্থির করা যায় না। স্তৈমিত্য [জড়তা], চিত্তচাঞ্চল্য, দাহ, মত্ততা প্রভৃতি অন্যান্য কঠিন লক্ষণাদি উপস্থিত হয়। রোগী অস্থির, তীব্র দাহান্বিত, অজ্ঞান ও উন্মাদ হয়। ইহা অসাধ্য। শুক্রজা মসূরিকার উপরোক্ত লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট

আছে বটে, কিন্তু ইহা এরূপ শীঘ্র প্রাণনাশ করে যে, জীবিত থাকিতে সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইবার অবকাশ হয় না।

এই সপ্তধাতুগত মসূরিকার সহিত যে দোষ অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত, কফের মধ্যে যেটী প্রকুপিত থাকে, তাহার লক্ষণ সমূহও মিলিত ভাবে প্রকাশ পায়। কাজেই বাতপিত্তজ, বাতশ্লেষ্মজ ও পিত্তশ্লেষ্মজ বসন্তে হু'য়ের মিশ্রলক্ষণ প্রকাশ পায়।

এতদ্ব্যতীত শাস্ত্রে আরও দুই প্রকার বসন্তের নামোল্লেখ আছে, যথা—অগ্নিবিসর্প বা অগ্নিবসন্ত এবং কর্দ্দমকবিসর্প বা কর্দ্দমক বসন্ত। কেহ কেহ ইহাদিগকে বসন্তের মধ্যে গণনা না করিয়া বিসর্পের অন্তর্ভুক্ত করেন। উহারা উভয়েই সান্নিপাতিক বসন্তের অন্তর্গত এবং অসাধ্য। উহাদের মধ্যে অগ্নি বসন্তের লক্ষণ এইরূপ—রোগীর সমস্ত শরীর যেন জ্বলন্ত অঙ্গারে বেষ্টিত আছে এরূপ বোধ হয়। ইহাতে তীব্র জ্বর, দাহ, প্রবল পিপাসা প্রভৃতি অতি কঠিন প্রকারের পৈত্তিক উপসর্গ সকল উপস্থিত হয়। বসন্তের রং কয়লার মত কৃষ্ণবর্ণ হয়। গায়ে আগুনে পুড়িয়া যাওয়ার মত ফোস্কা হয়। রোগীর নিদ্রা মোটেই হয় না। রোগী জ্ঞানশূন্য ও অস্থির হয় এবং সর্ব্বদা স্থান ও আসন পরিত্যাগ করিতে চাহে। কর্দ্দমক বসন্তের লক্ষণ এইরূপ যথা—রোগীর মাংস, চর্ম্ম ও ঘর্ম্ম ক্লেদ ও পুঁজ যুক্ত হয়। যাতনা ক্রমে কমে। বসন্ত পীড়ন করিলে ফাঁটিয়া যায়। অতিশয় পীড়ন করিলে বসিয়া যায়।

ডাক্তারিতে প্রকার ভেদে বসন্তের এইরূপ শ্রেণীবিভাগ করা আছে, যথা—

[১] ডিস্ক্রিট্ স্মল পক্স [Discrete]—ইহাকে পৃথক্, অসংযুক্ত বা ছিটা বসন্ত বলে। ইহা খুব সহজ বসন্ত। ইহার গুটিকাগুলি বেশ পৃথক্ পৃথক্ থাকে, একটার গায়ে অন্যটা লাগে না। গুটিকার সংখ্যা পরিষ্কাররূপে গণনা করা যায়। বেশী সংখ্যক গুটিকাও বাহির হয় না।

গুটিকাগুলি নানাস্থানে ছড়াইয়া যায়। সামান্য জ্বর হয়। অন্যান্য লক্ষণও সামান্য আকারের হয়।

২ কনফ্লুয়েন্ট বসন্ত (Confluent) —ইহাকে সংযুক্ত, লেপাবসন্ত বা উগ্রবসন্ত বলে। এই বসন্তে, গায়ে বেশী পরিমাণ গুটিকা বাহির হয়। গুটিকাগুলি পরস্পর মিলিয়া যায় ও বড় বড় দেখায়। এই বসন্ত বাহির হইবার পূর্ব্বে প্রবল কম্প ও তীব্রজ্বর হয়। মোহ, প্রলাপ বা খেচুনি (আক্ষেপ) হইতে পারে। সাধারণ বসন্তে যেমন গুটিকা বাহির হইবার সময় জ্বর কমে, ইহাতে সেরূপ হয় না শীঘ্র শীঘ্র গুটিকাগুলি বাহির হয়। ইহার গুটিকাগুলি বাহির হইবার পূর্ব্বে, শরীরে হামের বা আরক্ত জ্বরের ন্যায় লাল লাল বিন্দু বাহির হয়। এই গুলি পূর্ব্বে বাহির হইয়া গেলে, তবে অসংখ্য গুটিকা বাহির হইয়া থাকে। কোন কোন জায়গায় গুটিকাগুলি চাকা চাকার মত দেখা যায়। সাধারণ বসন্তের গুটিকাতে যত সময়ে রস জন্মে, তাহা অপেক্ষা এই বসন্তের গুটিকাতে শীঘ্র শীঘ্র রস জন্মে। ইহার গুটিকাগুলি শীঘ্র শীঘ্র পাকে। অনেকগুলি গুটিকা পরস্পর মিলিলে বড় বড় ফোস্কার মত দেখায়। কোন কোন রোগীর সমস্ত মুখ জুড়িয়া একটা প্রকাণ্ড ফোস্কা হয়। রোগী এরূপ বিকৃতাকার হয় যে, রোগীকে চেনা যায় না। ইহার গুটিকাগুলির ভিতর, রস, রক্ত এবং পূঁজ ও থাকে। এই রস বা পূঁজ হইতে নিতান্ত দুর্গন্ধ নির্গত হইতে থাকে। ফোস্কার ভিতর ভিতর গায়ের চর্ম্ম লাল অথবা লালের আভাযুক্ত কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে। এই সময়ে বড় বড় ফোস্কা গলিয়া গিয়া বড় বড় মামড়ি (খোস) পড়ে এবং উহা বহু বিলম্বে খসিয়া পড়ে। মাথায়, মুখে ও গলাতেই বড় বড় ফোস্কা বেশী হয়। এই বসন্তে চর্ম্মের অনেক নীচ পর্য্যন্ত ধ্বংস হইয়া যায়। কাজেই, ক্ষত আরাম হইয়া গেলেও শরীরের উপর টোল (গর্ত্তের ন্যায় দাগ) থাকিয়া যায়। স্থানে স্থানে চর্ম্ম কোঁকড়াইয়া (কুচ্‌কিয়া) যায়। এই প্রকারের

বসন্তে, জ্বর বরাবর লাগা থাকে। দ্বিতীয় বারের জ্বর হওয়াটা (Secondary Fever) বড় টের পাওয়া যায় না। রোগী নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া থাকে এবং প্রলাপ, মোহাদি জ্বরের উপসর্গ বেশী হয়। চক্ষুতে, নাকে, কাণে ও গলার ভিতর বসন্ত জন্মিয়া, কঠিন কঠিন উপদ্রব সকল আনয়ন করে। নিমোনিয়া, ব্রংকাইটিস প্রভৃতি গুরুতর উপসর্গ সকল উপস্থিত হয়। ইহা খুব সাঙ্ঘাতিক রোগ। ইহা আরাম হইতেও অনেক দিন লাগে।

(৩) সেমি-কনফ্লুয়েণ্ট (Semi-Confluent)—সেমি অর্থাৎ অৰ্দ্ধেক, মাঝামাঝি। ইহা মাঝামাঝি গোছের বসন্ত। ইহাতে অনেক বসন্ত বাহির হয়। তাহাদের মধ্যে ২।৪টা গা ঠেকা ঠেকিও করে। কিন্তু একবারে মিশে না। ইহাতে রোগী আরোগ্য লাভ করে।

(৪) করিমবোস (Corimbose)—ইহাতে স্থানে স্থানে থোকা থোকা করিয়া বসন্ত বাহির হয়। ইহা কনফ্লুয়েণ্ট বা লেপাবসন্ত জাতীয়। ইহা খুব মারাত্মক।

(৫) ম্যালিগ্‌নাণ্ট (Malignant)—বা সাঙ্ঘাতিক বসন্ত। ইহার নামেই ইহার কার্য্যের পরিচয় পাওয়া যায়। বসন্ত হইলে রোগী যদি খুব দুর্ব্বল হয় ও রোগের লক্ষণসকল যদি গুরুতর আকার ধারণ করে তবে তাহার এই নাম দেওয়া যায়। ইহা, খেচুনি (আক্ষেপ), মোহ, কোমা (অজ্ঞানতা) প্রভৃতি উৎকট উপসর্গ সকল আনয়ন করে। হয়ত বসন্ত বাহির হইবার পূর্ব্বেই রোগী মারা পড়ে। (ইহার সহিত শাস্ত্রোক্ত শুক্রগত মসূরিকার তুলনা কর।)

(৬) হিমরেজিক বসন্ত—ইহাতে রোগীর দেহের নানাস্থান দিয়া রক্ত নির্গত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ নাক, মুখ ও পেট দিয়া রক্ত বাহির হইয়া থাকে। গায়ে কাল কাল দাগ পড়ে। বসন্ত ভাল হইয়া বাহির হয় না, এলো মেলো ভাবে নির্গত হয়। গুটিকাগুলি কাল হয়। একবার ভাল হইয়া পুনরায় গুটিকা নির্গত হয়। রোগী খুব দুর্ব্বল হয়। দাঁতে

কাল হাঁতাংপড়ে। রোগী বিছানা খোটে, বিড়্ বিড়্ করিয়া ভুল বকে ও কোমা বা অজ্ঞানতা হয়।

মন্তব্য—বিছানা খোটা, বিড়্ বিড়্ করিয়া ভুলবকা, বিকারের লক্ষণ। জ্বরাদিতে ঐ সকল লক্ষণ হইলেই আমরা বলি উহার বিকার হইয়াছে। বিকার হইলে বিশেষ সাবধানে চিকিৎসা না করিলে রোগীকে রক্ষা করা কঠিন হয়। এই ভুল বকা (প্রলাপ) তিন প্রকার। উগ্রপ্রলাপ, মধ্যবিধ প্রলাপ ও মৃদু প্রলাপ। উগ্র প্রলাপে চক্ষু দুটী খুব লাল হয় এবং রোগী চিৎকার করে, উঠিয়া দাঁড়াইতে চাহে। এই প্রলাপ সচরাচর রাত্রি কালেই বৃদ্ধি পায় এবং জ্বরাদির প্রথমাবস্থায় অর্থাৎ যতদিন পর্য্যন্ত রোগীর দেহ সবল থাকে ততদিন পর্য্যন্ত উগ্র প্রলাপ হয়। জ্বরের বেগ কমিলে প্রলাপ ও কম থাকে, আবার জ্বরের উত্তাপের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রলাপও বাড়িয়া থাকে। রোগী ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া আসিলে উগ্র প্রলাপ মৃদু প্রলাপে পরিণত হয়। ফলতঃ মৃদু ও মধ্যবিধ প্রলাপ, রোগীর বল-হানির লক্ষণ। মধ্য বিধ প্রলাপে রোগী জোরে জোরে বকে বটে, কিন্তু দুর্ব্বলতার গতিকে উঠিতে বা পাশ ফিরিতে পারে না। হাত দুখানা কাঁপিতে থাকে। মৃদু প্রলাপে রোগী চক্ষু বুজিয়া মৃদুস্বরে অনবরত বিড়্ বিড়্ করিয়া বকিতে থাকে, হস্ত পদাদি সঞ্চালনের ক্ষমতা ও থাকে না। এই মৃদু প্রলাপে কাহারও কাহারও মোহ হয় এবং ঐ অবস্থাতেই মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। উগ্র প্রলাপে রোগীর মস্তকে রক্তাধিক্য হয় এবং উপর দিকে রক্ত উঠাতে রোগীব চক্ষু লাল হয়। মৃদু প্রলাপে মস্তিষ্কে রক্ত জমা থাকে না, কাজেই চক্ষুও লাল হয় না। রোগীর চক্ষু ভাল করিয়া দেখিলেই মৃদু ও উগ্র প্রলাপের তারতম্য বুঝিতে পারিবে। উগ্র প্রলাপে মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য হয়, আর মৃদু প্রলাপে মস্তিষ্ক রক্ত-হীন হয়।

(৭) বেনিগ্না-বসন্ত (Benigna)—ইহার আর একটী নাম হরণ-পক্স বা ওয়ার্ট পক্স। ইহা খুব নরম রকমের বসন্ত। ইহাতে গুটিকা বাহির হয়, কিন্তু পাকে না। ৫ম বা ৬ষ্ঠ দিনে শুকাইয়া যায়।

(৮) ক্রিষ্টেলাইন পক্স—ইহাতে গুটিকা বাহির হয় ও তাহাতে রস হয় কিন্তু পূঁজ হয় না।

(৯) ভেরিওলা সাইন্ ইরাপ্সনি—কোন কোন ব্যক্তির বসন্তজ্বর হয় অর্থাৎ জ্বরে বসন্ত বাহির হওয়ার লক্ষণ সকল উপস্থিত হয় কিন্তু বসন্ত বাহির হয় না। এই জ্বরকেই এই নাম দেওয়া যায়।

(১০) এনমেলি হাম, আরক্তজ্বর প্রভৃতির সহিত বসন্ত বাহির হইলে বা গর্ভাবস্থায় গর্ভস্থ সন্তানের বসন্ত হইলে অথবা গোলমেলে রকমের বসন্ত হইলে বা অস্বাভাবিক রকমের বসন্ত হইলে তাহার নাম এনমেলি।

এইত গেল ডাক্তার মহোদয়দের কথা। আবার কেহ কেহ বসন্তকে সোজাসুজি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। (১) জলবসন্ত, (২) সহজ-বসন্ত, (৩) সাঙ্ঘাতিক বসন্ত। জলবসন্তে সাধারণতঃ কোন ভয় নাই, একটু সতর্ক থাকিলেই চলে। সহজ বসন্তে রোগী খুব কম মারা যায়। সাঙ্ঘাতিক বসন্ত হইলে রোগী প্রায়ই বাঁচে না। উহা, উদরাভ্যন্তরে, গলনালিতে ও চক্ষুতে প্রকাশ পায় ও তৎসঙ্গে প্রবলজ্বর ও শরীর বেদনা থাকে। এই বসন্তে যাতনা খুব বেশী হয়। গুটিকা পাকিবার কালীন জ্বরে রক্ষা পাইলে অর্থাৎ সেকেণ্ডারি ফিভারের হাত হইতে এড়াইলে, তবে রোগীর জীবনের আশা করা যায়। বসন্তরোগে যাহাদের মৃত্যু হয়, তাহারা এই দ্বিতীয় বারের জ্বরেই মারা পড়ে।

বসন্তজ্বরের সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ।

"ত্বক্‌গতা রক্তগাশ্চৈব পিত্তজাঃ শ্লেষ্মজাস্তথা।
শ্লেষ্মপিত্তকৃতাশ্চৈব সুখসাধ্যা মসূরিকাঃ॥
এতা বিনাপি ক্রিয়য়া প্রশাম্যন্তি শরীরিণাম্॥"

নিদানম্।

অর্থাৎ রসগত (জলবসন্ত), রক্তগত, পিত্তজ, কফজ ও পিত্তশ্লৈষ্মিক মসূরিকা সুখসাধ্যা। এই সকল রোগ বিনা চিকিৎসাতেও প্রশমিত হয়।

"বাতজা বাতপিত্তোত্থা বাতশ্লেষ্মকৃতাশ্চ যাঃ।
কষ্টসাধ্যতমাস্তস্মাদ্ যত্নাদেতা উপাচরেৎ॥"

নিদানম্।

অর্থাৎ বাতজ, বাতপৈত্তিক ও বাতশ্লৈষ্মিক মসূরিকা, কষ্টসাধ্য অতএব অতি যত্নসহকারে উহার চিকিৎসা করিবে।

"অসাধ্যাঃ সন্নিপাতোত্থাস্তাসাং বক্ষ্যামি লক্ষণম্।
প্রবাল সদৃশাঃ কাশ্চিৎ কাশ্চিজ্জম্বুফলোপমাঃ॥
লোহজালসমাঃ কাশ্চিদতসীফলসন্নিভাঃ।
আসাং বহুবিধা বর্ণা জায়ন্তে দোষভেদতঃ॥"

নিদানম্।

অর্থাৎ সান্নিপাতিক মসূরিকা রোগ অসাধ্য। অসাধ্য মসূরিকার বর্ণ প্রবালের ন্যায় বা জম্বুফলের ন্যায়, কখনও বা লৌহ জালের ন্যায় (জালের কাঁটীর ন্যায়) কৃষ্ণবর্ণ, কখন বা অতসীফলের ন্যায় হয়। উহারা আরও নানা বর্ণের হইয়া থাকে। নিম্নলিখিত লক্ষণগুলিও অসাধ্য লক্ষণ, যথা—

"কাসো হিক্কা প্রমেহশ্চ জ্বরস্তীব্রঃ সুদারুণঃ।
প্রলাপারতিমূর্চ্ছাশ্চ তৃষ্ণাদাহোঽতি ঘূর্ণতা॥
মুখেন প্রস্রবেদ্রক্তং তথা ঘ্রাণেন চক্ষুষা।
কণ্ঠে ঘুর্ঘুরকং কৃত্বা শ্বসিত্যত্যর্থ দারুণম্॥
মসূরিকাভিভূতস্য যস্যৈতানি ভিষগ্বরৈঃ।
লক্ষণানীহ দৃশ্যন্তে ন দেয়ং তস্য ভেষজম্॥"

নিদানম্।

অর্থাৎ যে মসূরিকা-রোগাক্রান্ত রোগীর কাস, হিক্কা, মোহ, অত্যন্তজ্বর, প্রলাপ, গ্লানি, মূর্চ্ছা, পিপাসা, দাহ, নিদ্রাধিক্য ও কণ্ঠদেশে ঘুড়্ ঘুড়্ শব্দের সহিত অত্যন্ত শ্বাস বহির্গত হয় এবং মুখ, নাসিকা ও চক্ষু হইতে অতিশয় রক্তস্রাব হয়, তাহাকে সুচিকিৎসক ঔষধ প্রদান করিবেন না।

মসূরিকারোগের অরিষ্ট লক্ষণ।

অরিষ্ট লক্ষণ অর্থাৎ মৃত্যু-লক্ষণ অর্থাৎ যে লক্ষণ প্রকাশ পাইলে রোগী মরিবে বলিয়া স্থির করা যায়—

"রোগিণোঃ মরণং যস্যাদবশ্যম্ভাবি লক্ষ্যতে।
তল্লক্ষণমরিষ্টং স্যাদ্রিষ্টঞ্চাপি তদুচ্যতে॥"

আয়ুর্ব্বেদ সংগ্রহ।

অরিষ্টের অন্য নাম রিষ্ট।

বসন্ত রোগীর অরিষ্ট বা মৃত্যু-লক্ষণ যথা—

"মসূরিকাভিভূতো যো ভৃশং ঘ্রাণেন নিঃশ্বসেৎ।
স ভৃশং ত্যজতি প্রাণান্ তৃষ্ণাবাম্বায়ুদূষিতঃ॥"

নিদানম্।

অর্থাৎ যে বসন্তরোগী তৃষ্ণাতুর হইয়া নাসিকা দ্বারা অত্যন্ত শ্বাস পরিত্যাগ করে এবং অপতানকাদি বাতদূষিত হয়, তাহার মৃত্যু হইয়া থাকে।

অপিচ—

"প্রবালগুটিকাভাসা যস্য গাত্রে মসূরিকাঃ।
উৎপদ্যাশু বিনশ্যন্তি ন চিরাৎ স বিনশ্যতি॥"

আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞানম্।

অর্থাৎ যদি প্রবালসদৃশ বসন্তগুটিকা শরীরে উৎপন্ন হইয়াই শীঘ্র লয় পাইয়া যায় তবে সে অচিরাৎ বিনষ্ট হয়।

মোটের উপর, রস, রক্তপিত্তজাদি মসূরিকার মধ্যে সান্নিপাতিক মসূরিকা অসাধ্য। যে কোন বসন্তরোগীর কাস, হিক্কা, তৃষ্ণা, দাহ, প্রবল-

জ্বর, মোহ, প্রলাপ, মূর্চ্ছা, গা ঘোরা, মুখ, নাসিকা ও চক্ষু হইতে রক্তস্রাব হয়, যাহার কণ্ঠে ঘড়্ ঘড়্ শব্দ ও অতি কষ্টে নিশ্বাস ত্যাগ হয়, সে বাঁচে না। নাসিকার অগ্রভাগে বসন্ত হওয়াটাও দুর্লক্ষণ। এই রোগের পরিণামে কনুই, মণিবন্ধ (হাতের কব্জায়—Wrist) ও ঘাড়ে ভয়ানক শোথ হইলেও রোগ প্রায় অসাধ্য হয়। যে বসন্তরোগী কাতর হইয়া সতেজে নাসিকা দ্বারা শ্বাস ত্যাগ করে, তদবস্থায় তৃষ্ণাতুর হইলেই, অতি সত্বর মৃত্যুমুখে পতিত হয়। মৃত্যুর পূর্ব্বে শ্লেষ্মারই প্রাবল্য হয়। রোগের পরিণামে কণ্ঠের ঘড়্ ঘড়্ শব্দ বেশী হইতে থাকিলে মৃত্যু নিকট বলিয়া মনে করিবে। *

মৃত্যুর পরে শরীর শীঘ্র শীঘ্র পচিয়া যায়। বসন্ত রোগের আরোগ্যাদি সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে ইহাও আছে—

"কাশ্চিদ্বিনাপি যত্নেন সিধ্যন্ত্যাশু মসূরিকাঃ।
দৃষ্টাঃ কৃচ্ছ্রতবাঃ কাশ্চিৎ কাশ্চিৎসিধ্যন্তি বা ন বা॥
কাশ্চিন্নৈব তু সিধ্যন্তি সাধ্যমানাঃ প্রযত্নতঃ॥"

ভাবপ্রকাশ।

অর্থাৎ কোন কোন প্রকারের বসন্ত চিকিৎসা না করিলেও আপনা আপনিই প্রশমিত হয়। কোন প্রকারের বসন্ত কষ্টসাধ্য। কোন প্রকারের বসন্তের আরোগ্যের পক্ষে নিশ্চয়তা নাই। কোন প্রকারের বসন্ত হাজার চেষ্টা করিলেও আরোগ্য হয় না।

মন্তব্য—নানা জাতীয় বসন্তের যে সকল নাম উল্লেখ করা গেল, তদ্ব্যতীত ব্রহ্মজাল, পুখুরিয়া প্রভৃতি অনেক নূতন নামও আছে। উহারা

---

* কেহ কেহ বলেন যে, মনুষ্য পৃথিবীতে আসিয়া প্রথমে শ্বাস গ্রহণ করে ও সর্ব্বশেষে তাহা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। কেহ কেহ বলেন যে, ভূমিষ্ঠ হইবার সময় শিশুর ফুস্ ফুস্ বায়ুপূর্ণ থাকে এবং গর্ভচ্যুত হওয়া মাত্র ফুস ফুস হইতে কিয়ৎ পরিমাণে বায়ু বহির্গত হইয়া যায়, সুতরাং নিশ্বাস ত্যাগই মানবের প্রথম কার্য্য।

এই পুস্তকে উল্লিখিত বসন্তেরই প্রকার ভেদ। ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হয় মাত্র। বসন্ত অতি কঠিন ও যন্ত্রণাদায়ক পীড়া। বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন ও সূক্ষ্ম অনুসন্ধান না করিলে রোগ চিনা কঠিন ও কাজেই চিকিৎসা এক প্রকার অসম্ভব হইয়া উঠে। আর একটী প্রধান কথা এই যে, আমরা ইতি পূর্ব্বে এই মাত্র উল্লেখ করিয়াছি যে, "ন দেয়ং তস্য ভেষজম্" অর্থাৎ ঐ ঐ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে সুচিকিৎসক "রোগ অসাধ্য" বলিয়া রোগীকে ঔষধ দিবেন না। এই কথাটী একটু ধীর ভাবে বিবেচনা করিতে হইবে। তুমি চিকিৎসক, পরিণামে তোমার যশের হানি না হয় এইজন্য অসাধ্য লক্ষণ উপস্থিত হইলে রোগীর সম্মুখে কিছু না বলিয়া রোগীর অভিভাবক দিগকে ঐ বিষয় স্পষ্ট করিয়া বলিতে পার, কিন্তু তাই বলিয়া রোগীর চিকিৎসা ত্যাগ করিতে পার না। আর, কোন রোগের ২।৪টী অসাধ্য লক্ষণ প্রকাশ পাইলেও রোগীকে হঠাৎ পরিত্যাগ করা উচিৎ নয়। বিশেষ ধীরতা ও নিপুণতা সহকারে রোগীর সমস্ত লক্ষণাদির পরীক্ষা ও বিচার করিবে। রোগীর আরোগ্যের পক্ষেই বা কি কি লক্ষণ উপস্থিত আছে এবং বিরুদ্ধ-লক্ষণই বা কি কি উপস্থিত আছে, তৎসমুদায় দেখিবে। সাধ্য ও অসাধ্য * লক্ষণাদি নিপুণ ভাবে

---

* চিকিৎসা দ্বারা রোগের শান্তিবিধান বিষয়ে রোগের শ্রেণীবিভাগ করিলে রোগ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। (১) সাধ্য রোগ—শীঘ্রই হউক আর গৌণেই হউক চিকিৎসা দ্বারা যে রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য হইতে পারে, তাহার নাম সাধ্য রোগ। ইহা আবার দুই প্রকার, সুখসাধ্য ও কষ্টসাধ্য। (২) অসাধ্য—চিকিৎসা দ্বারা কোন মতেই যাহার সর্ব্বতোভাবে প্রতিবিধান করা যাইতে পারে না, তাহার নাম অসাধ্য রোগ। ইহাও আবার দুই প্রকার। যাপ্য ও প্রত্যাখ্যেয়। যে রোগ অল্প আয়াসেই প্রশমিত হয়, তাহা সুখসাধ্য। বহুকষ্ট না করিলে যে রোগের উপশম করা যায় না, তাহা কষ্টসাধ্য। নানাপ্রকারে চেষ্টা করিলেও যে রোগের মূলের ধ্বংশ হয় না, কেবল কিছুদিনের জন্য স্থগিত থাকে, তাহা যাপ্য। আর যে রোগের প্রশমনের কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই, তাহা প্রত্যাখ্যেয়।

দেখিয়া ও বিশেষরূপে তাহাদের বিষয়ে বিচার করিয়া, অগত্যা রোগীকে জবাব দিবে। শাস্ত্রে আছে যে "বিরুদ্ধগুণসমবায়ে ভূয়সাল্পমবজীয়তে" অর্থাৎ পরস্পর বিরুদ্ধগুণ একত্রিত হইলে সংখ্যাধিক্যেরই জয় হয়। অর্থাৎ যাহাদের সংখ্যা বেশী, তাহাদের জয় ও যাহাদের সংখ্যা অল্প তাহাদের পরাজয় হইয়া থাকে। সুতরাং অসাধ্য লক্ষণের আভাস পাইলেই, তাহার বলাবল বিচার না করিয়া রোগীকে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে। আর, শাস্ত্রে আছে "যাবৎ কণ্ঠগতাঃ প্রাণা যাবন্নাস্তি নিরিন্দ্রিয়ঃ। তাবচ্চিকিৎসা কর্ত্তব্যা কালস্য কুটিলা গতিঃ॥" অর্থাৎ কণ্ঠে প্রাণ থাকা পর্য্যন্ত ও যাবৎ ইন্দ্রিয় শক্তির লোপ না হয়, তাবৎকাল পর্য্যন্ত চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। কারণ, কালের গতি অতি কুটিল। কাজেই, অরিষ্ট-লক্ষণ (মৃত্যু-লক্ষণ) উপস্থিত হইলেও আরাম হইতে পারে। সুতরাং শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ঔষধ দিবে। *

বসন্ত রোগের প্রতিষেধক ঔষধ।

"Prevention is better than cure."

§*§

ইংরাজীতে উপরোক্ত কথাটী চলিত আছে। উহার অর্থ এই যে, ব্যারাম জন্মিবার পর তাহার চিকিৎসা করিয়া আরোগ্য করা অপেক্ষা যাহাতে সেই ব্যারামটী আদৌ না জন্মিতে পারে, এরূপ করিতে পারিলে বেশী ভাল হয়। যে ঔষধ ব্যবহার করিলে ব্যারাম জন্মেনা, তাহাকে

* অরিষ্ট লক্ষণাদি উপস্থিত হইলেও যে, ঔষধের গুণে রোগী বাঁচিতে পারে আমরা নিজের জীবনেই তাহা অনেক রোগীতে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। রোগীর অন্তিম সময়েও হা হুতাশ করিয়া সময় না কাটাইয়া, কিসে রোগী রক্ষা পাইবে, চিকিৎসককে সর্ব্বদা ঐ বিষয় ভাবিতে হইবে এবং আবশ্যক হইলে ঔষধ বা পথ্যাদির বা চিকিৎসা প্রণালীর পরিবর্ত্তন করিয়া দেখিতে হইবে।

প্রতিষেধক ঔষধ বলে। ইংরেজীতে Preventive Medicine বলে। বসন্তরোগের নানাবিধ প্রতিষেধক ঔষধ আছে। নিম্নলিখিত ঔষধ গুলির মধ্যে কোন একটী সেবন করিলে বসন্ত আর হইবে না, অন্ততঃ সে বৎসর আর হইবে না। ঔষধ গুলি যথা——

(১) চারিদিকে বসন্তের ধূম পড়িলে, কোন একদিন আদার রস লইয়া অল্প একটু কর্পূর সহ মাড়িয়া স্নানের পূর্ব্বে সর্ব্বাঙ্গে মর্দ্দন করিয়া শুষ্ক হইলে ধুইয়া ফেলিবে। ইহা কোন একটী ব্রহ্মচারীর মত। আমরা নিজে কখনও ইহা পরীক্ষা করি নাই।

(২) প্রত্যেক পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি, কণ্টকারী গাছের মূলের ছাল শিকিভরি, ২১টী গোলমরিচ সহ বাটিয়া (বাটিবার সময় অল্প একটু জল দিবে) ১টী বড়ী তৈয়ার করিয়া শূন্যোদরে সকালে জল সহ গিলিয়া সেবন করিবে। ৭ হইতে ১২ বৎসর পর্য্যন্ত অর্দ্ধমাত্রা; ৩—৬ বৎসর পর্য্যন্ত শিকিমাত্রা। তন্নিম্নে তাহার অর্দ্ধেক। নিতান্ত শিশুর পক্ষে ১ বড়ীর বিশ ভাগের একভাগ। গর্ভিণীকে নিঃসন্দেহে দেওয়া যায়। এই ব্যবস্থা আয়ুর্ব্বেদসম্মত এবং ইহাতে আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে।

(৩) অঘট্ট স্থলে কণ্টকারীর মূল ॥০ আধতোলা + গোলমরিচ ৪ গণ্ডা, আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। এই আধপোয়া পাচন, কোন একদিন ৪।৫ জনে ভাগ করিয়া খাইবে। পাচন জ্বাল দেওয়ার পূর্ব্বে জিনিষ দুইটী বেশ করিয়া থেতো করিয়া লইতে হয়। ইহা দ্বিতীয় ব্যবস্থার সামান্য পরিবর্ত্তন মাত্র ও বিশ্বাস্য।

(৪) গাধার দুগ্ধ সপ্তাহ খানেক প্রতিদিন এক আধ চামচ্ করিয়া পান করিবে। দুগ্ধ অঘট্ট হইলে, অল্প গাধার দুগ্ধে কতকগুলি চা'ল ভিজাইয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। ইহার ২।৪টা চা'ল প্রতিদিন সেবন করিলেও ফল হয়। গাধার দুগ্ধ যে বসন্তের প্রতিষেধক এই বিষয়ে অনেকেরই

বিশ্বাস আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় সকল স্থলে ফল হয় না। আমাদের পরিচিত ২।৪টী লোক বসন্তের প্রকোপের সময় অনেক দিন পর্য্যন্ত গাধার দুগ্ধ সেবন করিয়াছিল, কিন্তু সেই সময়েই পানিবসন্ত দ্বারা সমস্ত পরিবার-বর্গ সহ আক্রান্ত হইয়াছিল। অধিকন্তু তাহাদের সকলেরই পূর্ব্বে ইংরেজী-টিকা হইয়াছিল।

ঋষিগণ আমাদের ব্রত নিয়মাদির সঙ্গে, আমাদের স্বাস্থ্যের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। ৺ শীতলা দেবীর বাহন গাধা। বোধ-হয় গাধার দুগ্ধ বসন্তের পক্ষে ভাল বলিয়াই শাস্ত্রকারগণ গাধাকে শীতলা বা বসন্তদেবীর বাহন বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। আমরা শুনিয়াছি, কোন একটী কবিরাজ বাধকের ব্যারামের নানাপ্রকার ঔষধ সেবন করা-ইয়াও একটী স্ত্রীলোককে উক্ত রোগ হইতে আরাম করিতে পারেন নাই, পরে ঋষিদের ঐরূপ অভিপ্রায় অবগত হইয়া, কেবল সেই সূত্র মাত্র ধরিয়া স্ত্রীলোকটীকে আরাম করিয়াছিলেন। বাধক রোগের অর্থ বাধ-কের ব্যারাম। বাধক; কাহার বাধক? না, সন্তান হওয়ার বাধক। ইহাকে শাস্ত্রে কষ্টরজঃ বা লুপ্তরজঃও বলে। যখন বাধকের নানা ঔষধ সেবন করাইয়াও তিনি ফল পাইলেন না, তখন তিনি ভাবিলেন যে, যদি ঐ স্ত্রীলোকটী একটী বিড়ালকে এমনভাবে কোলে রাখিয়া ঘুমায় যে, বিড়া-লের রোমাবলী স্ত্রীলোকটীর তলপেট সম্পূর্ণ আচ্ছাদন করিতে পারে, তাহা হইলে সম্ভবতঃ স্ত্রীলোকটীর ব্যারাম আরাম হইতে পারে। কেননা, বিড়াল ষষ্ঠীদেবীর বাহন। ষষ্ঠীদেবী সন্তান দিবার কর্ত্রী। ষষ্ঠীর কৃপা না হইলে কাহারও সন্তান হয় না। লোকে কথায় বলে যে উহার লক্ষ্মী-ভাগ্য নাই কিন্তু ষষ্ঠী-ভাগ্য আছে অর্থাৎ যদিও ইহার ধন উপার্জ্জন করি-বার ক্ষমতা নাই, তথাপি সন্তানভাগ্য খুব আছে। সন্তান-উৎপত্তি সম্বন্ধে বিড়ালের এমন কোন গুণ থাকিবার সম্ভব যাহা দেখিয়া ঋষিগণ উহাকে ষষ্ঠীদেবীর বাহন বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। যাহাহউক, ঐ উপা-

য়েই স্ত্রীলোকটী বাধকের ব্যারাম হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিল।

(৫) কণ্টকারীর মূল ১।০ সোয়া তোলা + কাঁচা হলুদ ॥০ আধ তোলা + গোলমরিচ ।০ সিকিভরি, জল ॥০ আধসের, পাকশেষ আধপোয়া। ছাঁকিয়া ইহার সহিত ॥০ আধতোলা এখগুড় মিশাইয়া পান করিবে। খালিপেটে পান করিতে হয়। ৩।৪ দিন মাত্র সেব্য। এই ঔষধটীও বিশ্বাস্য।

(৬) টিকা দেওয়াটাও বসন্তের প্রতিষেধক বটে।

(৭) পুনর্ণবার মূল ১ তোলা + গোলমরিচ ✓০ দুই আনা একত্র বাটিয়া খালিপেটে বাসিজল সহ সেব্য। প্রতি বৎসর বসন্ত দেখা দিবার সময় ১ বার সেবন করিবে।

(৮) ভাবপ্রকাশে আছে "যে সকল ব্যক্তি নিম্ব ও বহেড়ার বীজ এবং হরিদ্রা শীতল জল সহ পেষণ করিয়া পান করে, তাহাদের শীতলারোগ কখনও উৎপন্ন হয় না। নিম্ববীজাদির পরিমাণের উল্লেখ নাই। তিনটী, সমভাগে মোট ।০ সিকিভরি নিতে পার।

[৯] "পাপরোগভয়ং দূরাৎ শিবাস্থি বিনিবারয়েৎ।" অর্থাৎ হরিতকীর অস্থি (বীজ) খণ্ড খণ্ড করিয়া পয়সার মত করিয়া কাটিয়া সূত্রসহযোগে স্ত্রীলোকের বামপার্শ্বে ও পুরুষের দক্ষিণ পার্শ্বে ধারণ করিলে বসন্তরোগে আক্রমণ করিতে পারে না।

[১০] বাঙ্গালা দেশের কোন কোন অঞ্চলের হিন্দুরা, চৈত্র মাসের সংক্রান্তি দিবসে নিমহলুদ বাটিয়া গায়ে মাখিয়া স্নান করেন ও নিমপাতায় কামড় দেন। বোধ হয় ইহাও বসন্তরোগের প্রতিষেধক বলিয়া ব্যবস্থা করা হইয়াছে। "বসন্তে ভ্রমণং পথ্যমথবা নিম্বভোজনং।"

বসন্ত চিকিৎসার সমালোচনা।

——————§*§——————

একেইত বসন্ত অতি কঠিন রোগ, তাহাতে আবার ইহার চিকিৎসা সম্বন্ধে নানা জনের নানামত ও নানা প্রণালী দেখা যায়। আর, যদিও বসন্তরোগের চিকিৎসায়, হোমিওপ্যাথী, এ্যালোপ্যাথী প্রভৃতি নানা মতে নানাপ্রকারের চিকিৎসা-পদ্ধতি প্রচলিত আছে, তথাপি কেহই কিন্তু এদেশে, দেশীয়মত ভিন্ন, অন্য কোনও মতে, এই রোগের বড় একটা চিকিৎসা করান না। আর, দেশীয় চিকিৎসার ন্যায় অন্য কোনও মতে, এই রোগের ভাল চিকিৎসা নাই, ইহা নির্ভয়ে বলা যাইতে পারে। পরন্তু, দেশীয় মতের ভিতরেও নানা মুনির নানামত দেখা যায়। পণ্ডিতগণ বলেন—

"তদল্পমপি নোপেক্ষ্যং শাস্ত্রে দুষ্টং কথঞ্চন।
কিং বপুঃ সুন্দরমপি শ্বিত্রেণৈকেন দুর্ভগম্॥"

অর্থাৎ শাস্ত্রের অল্প পরিমাণ দোষও উপেক্ষার যোগ্য নহে। দেহ সুন্দর হইলেও একটী মাত্র শ্বিত্র (শ্বেতীরোগ বা ধবল [White Spot] থাকিলে উহা অপবিত্র ও অপ্রীতিকর হয়। সেইজন্য আমরা বসন্ত রোগের চিকিৎসা সম্বন্ধে সর্ব্ব সাধারণের মত পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়া, পরে তাহার সমালোচনা করিব এবং তৎপর দেশীয় যে মতের চিকিৎসা আমরা উৎকৃষ্ট ও আশুফলোপধায়ক বলিয়া জানি, তাহারই এখানে উল্লেখ করিব।

ইহার যুক্তিযুক্ত ও ফলোপধায়ক চিকিৎসাপ্রণালী বিবৃত করিবার পূর্ব্বে এখানে উল্লেখ করা যাইতেছে যে, আধুনিক যে নিয়মে আচার্য্য ও ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা বসন্ত রোগের চিকিৎসা করিয়া থাকেন, তাহা যদিও আয়ুর্ব্বেদোক্ত বসন্ত চিকিৎসারই বিকৃত বা অসম্যক্ অংশ বটে, তথাপি তাঁহাদের চিকিৎসার সহিত আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার সকল স্থলে মিল নাই। বসন্তরোগে বমন, বিরেচন (জোলাপ দেওয়া) ও পথ্যাদির প্রয়োগ বিষয়ে

তাঁহাদের চিকিৎসা পদ্ধতির সহিত আয়ুর্ব্বেদোক্ত চিকিৎসার অনেক পার্থ্যক্য দেখা যায়। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে উহাদের সহিত মিল নাই বা হইল, শাস্ত্রে যেরূপ উপদেশ আছে সেইরূপ ব্যবস্থা করিলেই হইল। যেহেতু, শাস্ত্রে আছে—

"পুরাণং মানবোধর্ম্ম সাঙ্গবেদশ্চিকিৎসিতম্।
আজ্ঞাসিদ্ধানি চত্বারি ন হন্তব্যানি হেতুভিঃ॥"

অর্থাৎ পুরাণ, স্মৃতি, সাঙ্গবেদ ও চিকিৎসা শাস্ত্রে যেরূপ উপদেশ আছে, তদনুযায়ী কার্য্য করিবে, বুঝিতে না পারিয়া হেতুবাদের দ্বারা উহাদিগকে নষ্ট করা উচিত নহে। কিন্তু, চিকিৎসাশাস্ত্রে দ্বিতীয় ধন্বন্তরী-সদৃশ বাগ্‌ভট বলেন—

"বাতেপিত্তে শ্লেষ্মশাংতৌ চ পথ্যং
তৈলং সর্পির্মাক্ষিকং চ ক্রমেণ।
এতদ্ ব্রহ্মা ভাযতে ব্রহ্মজো বা
কা নির্মন্ত্রে বক্তৃভেদোক্তিশক্তি॥
অভিধাতৃবশাৎ কিংবা দ্রব্যশক্তির্বিশিষ্যতে?
ঋষিপ্রণীতে প্রীতিশ্চেন্মুক্ত্বা চরকসুশ্রুতৌ।
ভেলাদ্যাঃ কিং ন পঠ্যন্তে তস্মাদ্ গ্রাহ্যং সুভাষিতম্॥"

বাত, পিত্ত ও কফের পক্ষে ক্রমে তৈল, ঘৃত ও মধু সুপথ্য, ইহা ব্রহ্মা স্বয়ংই বলুন আর ব্রহ্মার পুত্রই বলুন, কোন বক্তার বাক্যের শক্তিতে নির্বাক্ জড় পদার্থের শক্তির উৎকর্ষাপকর্ষ বা বৈলক্ষণ্য ঘটিতে পারে না। কারণ, বস্তুনিহিত শক্তি স্বভাবসিদ্ধ। যিনিই কেন বলুন না, পদার্থের স্বতঃসিদ্ধ শক্তির অন্যথা হইতে পারে না। যদি ঋষির প্রণীত বলিয়াই আদর করিতে হয়, তবে চরক সুশ্রুত পরিত্যাগ করিয়া ভেল প্রভৃতি ঋষির প্রণীত গ্রন্থাদি পাঠ করা হয় না কেন? ভেলাদি ঋষির গ্রন্থ তাদৃশ উৎকৃষ্ট নয় বলিয়াই, উহাদের পরিবর্ত্তে চরক সুশ্রুত পাঠ করা

হইয়া থাকে। তবেই, সদ্‌যুক্তিপূর্ণ উপদেশই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। চরক-মুনি নিজেও সিদ্ধিস্থানে বলিয়াছেন যে

"ন চৈকান্তেন নির্দ্দিষ্টে তত্রাভিনিবিশেদ্‌বুধঃ।
স্বয়মপ্যত্র বৈদ্যেন তর্ক্যং বুদ্ধিমতা ভবেৎ॥
উৎপদ্যেত হি সাবস্থা দেশকালবলং প্রতি।
যস্যাং কার্য্যমকার্য্যং স্যাৎ কর্ম্ম কার্য্যঞ্চ বর্জ্জয়েৎ॥
ছর্দ্দিহৃদ্রোগগুল্মার্ত্তে বমনং স্বে চিকিৎসিতে।
অবস্থাং প্রাপ্য নির্দ্দিষ্টাং কুষ্ঠিনাং বস্তি কর্ম্মচ॥
তস্মাৎ সত্যপি নির্দ্দিষ্টে কুর্য্যাদূহ্যং স্বয়ং ধিয়া।
বিনা তর্কেণ যা সিদ্ধির্যদৃচ্ছা সিদ্ধিরেব সা॥"

অর্থাৎ যে সকল নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইল, চিকিৎসক সেই সকল নিয়মের প্রতি একান্ত নির্ভর না করিয়া (অর্থাৎ বাছ্ বিচার না করিয়া, কেবল তাহাই স্থিরসিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ না করিয়া) নিজের বুদ্ধিরও পরিচালনা করিবেন এবং কোন কোন নিয়ম পরিবর্ত্তন করার যোগ্য বিবেচনা করিলে, বুদ্ধিমান্ বৈদ্য উপস্থিত ক্ষেত্রে স্বয়ং বিচার করিয়া, তাহার পরিবর্ত্তন করিবেন। কারণ, দেশ, কাল ও বল অনুসারে কখন কখন এরূপ অবস্থা ঘটে, যে অবস্থায় অকর্ত্তব্যও কর্ত্তব্য হয় এবং কর্ত্তব্যও অকর্ত্তব্য হইয়া থাকে। দেখ, বমিরোগ, হৃদ্‌রোগ ও গুল্মরোগে বমন নিষিদ্ধ হইলেও উহাদের চিকিৎসার অবস্থানুসারে বমন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কুষ্ঠরোগে বস্তিকর্ম্ম (গুহ্যদ্বারে পিচ্‌কারী দেওয়া) নিষিদ্ধ হইলেও, অবস্থা বিশেষে তাহাও বিধেয় বলা হইয়াছে। অতএব নিয়ম সকল নির্দ্দিষ্ট থাকিলেও, নিজের বুদ্ধির পরিচালনা করিয়া নূতন নূতন উদ্‌ভাবন করিতে হয়। নিজের বুদ্ধির চালনা না করিয়া সময় সময় যে সিদ্ধি লাভ করা যায়, তাহা অসিদ্ধির মধ্যেই গণ্য করিতে হইবে।

আবার, কেহ কেহ এরূপও বলিতে পারেন যে, আধুনিক ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা যে ভাবে চিকিৎসা করেন, তাহাতেও ত অনেক রোগী আরাম হইতেছে, সুতরাং শাস্ত্রোপদেশের বিচার না করিয়া তাহাই কেন গ্রহণ কর না, ইহার উত্তর এই যে, রোগের উপশম হওয়া এক কথা, আর কোন চিকিৎসামত যুক্তিমূলক কি না তাহা অপর কথা। যাহাহউক, বমন বিবেচনাদি সম্বন্ধে, হোমিওপ্যাথী, এ্যালোপ্যাথী, আচার্য্যমহাশয়দের ও শাস্ত্রের মতামত কি, আমরা নিম্নে তাহা বিবৃত করিলাম।

৺কালী কৃষ্ণ মিত্র (হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার) প্রণীত গার্হস্থ্য ব্যবস্থা ও শিশু চিকিৎসার ৪৫৮ পৃষ্ঠায় নিম্নলিখিতরূপ মন্তব্য আছে—"জ্বর-অবস্থায় জোলাপ দেওয়ার পদ্ধতি সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছে। স্ত্রীলোকেরা ও মুটে মজুরেরাও ঐ বিষয়ে উপদেশের অপেক্ষা করেনা। রোগী হাতছাড়া হইবার আশঙ্কায়, কবিরাজ মহাশয়েরাও ডাক্তার দিগের অনুসরণ করেন। কিন্তু, হাম বসন্তাদি স্ফোটক রোগের প্রথম অবস্থায় রেচক ঔষধ বিষতুল্য হইয়া পড়ে। শরীর রসহীন হওয়ায় গুটিকা বাহির হইতে পারে না এবং তজ্জন্য রোগী বিলক্ষণ কষ্ট ও যন্ত্রণা ভোগ করে এবং কাহারও কাহারও বা অকালে মৃত্যু হয়। প্রাচীন বৈদ্যরা তরুণজ্বরে, ডাক্তারদিগের ন্যায়, রক্তমোক্ষণ, রেচন ও বমনকারী ভৈষজ্য প্রয়োগ করিতেন। কিন্তু, ইহার মন্দফল প্রত্যক্ষ করিয়া ইহা হইতে বিরত হইয়াছেন। তাঁহাদিগের বহুদর্শন একবারে অগ্রাহ্য বা অবহেলা করিয়া পয়সা খরচ করিয়া যন্ত্রণা কেনা কোন মতেই বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। বসন্ত ও হামে জোলাপ-দেওয়া ও বিষ খাওয়ান দুইই প্রায় তুল্য।"

৺ পুলিন চন্দ্র সান্যাল এম্, বি, তাঁহার চিকিৎসা কল্পতরুতে বলিয়াছেন "পূর্ব্বকালে চিকিৎসকগণ বসন্তরোগীকে গরমে রাখিতেন ও গরম-জল পান করিতে দিতেন অর্থাৎ বসন্ত যাহাতে ভাল করিয়া বাহির হয়, সেইরূপ করিতেন। কিন্তু, এক্ষণে এ সকল চিকিৎসা উঠিয়া গিয়াছে। *

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *

রোগী যদি দুর্ব্বল না হয় তবে রোগের প্রারম্ভে একটু কড়া রকমের বিরেচক ঔষধ দেওয়া মন্দ নহে।" ইত্যাদি।

এইত গেল ডাক্তার মহাশয়দিগের কথা। দেশীয় ভট্টাচার্য্য ও আচার্য্য চিকিৎসকদিগের মধ্যে সকলেই, যাহাতে রোগীর বাহ্য না হয় ও পেট গরম থাকে, তাহার বিবিমত চেষ্টা করেন। এই উদ্দেশ্যে, তাঁহারা নানাপ্রকার জারি ব্যবহার করেন। অনেকে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত "জারি" ব্যবহার করেন। গাছ গাছড়া ভিজান জলের নাম "জারি"। অনেকে বসন্ত-রোগী দেখিতে আসিয়া প্রথমতঃ অন্য কোন ঔষধ না দিয়া নিম্নলিখিত জারির জল পান করাইয়া, রোগীকে ঐ দিনের মত রাখিয়া দেন। জারি যথা—বাকস-ছাল + গুলঞ্চ + মেথি + বাবুইতুলসী-বীজ + কুড়, প্রত্যেক দ্রব্য ।/১০ সাড়ে পাচ আনা ওজনে লইয়া আগের দিন সন্ধ্যাকালে থেতো করিয়া আধপোয়া ফুটন্ত গরম জলে ভিজাইয়া ও প্রাতে ছাঁকিয়া, একবারে খালিপেটে পান করিতে দেন। অবশ্য, পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে এই বিধি। নিম্নবয়স্কের পক্ষে আবশ্যকানুসারে কম করা হয়। (কাহাকে কি মাত্রায় ঔষধ দিতে হইবে সেই সম্বন্ধে "বসন্তের প্রতিষেধক ঔষধ" দেখ)। * বাহ্য বন্ধ ও পেট গরম থাকিলে বসন্ত ঝাড়িয়া বাহির হইবে

---

* ঔষধের মাত্রা ঠিক করা রোগ আরোগ্যের পক্ষে একটী প্রধান কার্য্য বলিতে হইবে। মাত্রা কম হইলে ঔষধে রোগের শান্তি করিতে পারে না; আবার মাত্রা বেশী হইলেও ঔষধে অন্যান্য রোগ উৎপাদন করিয়া থাকে। রোগীর ও রোগের অবস্থাদির বলাবল নিপুণভাবে বিচার করিয়া ঔষধের মাত্রা ঠিক করাই চিকিৎসকের চিকিৎসকত্ব। চরক বলেন, "মাত্রা খলু ব্যাধিবলাপেক্ষিণী" অর্থাৎ ঔষধের মাত্রা রোগের বলাবলের প্রতি নির্ভর করে। চক্রদত্ত বলেন

মাত্রায়া নাস্ত্যবস্থানং দোষমগ্নিং বলং বয়ঃ।
ব্যাধিং দ্রব্যঞ্চ কোষ্ঠঞ্চ বীক্ষ্যমাত্রাং প্রযোজয়েৎ॥"

এই উদ্দেশ্যেই তাঁহারা ঐরূপ করিয়া থাকেন। আচার্য্য মহাশয়েরা প্রায় সকল স্থলেই তৈলাদি ব্যবহার করেন।

(বসন্তচিকিৎসায়, চক্রদত্তে ভূয়োভূয়ঃ অন্তঃকোষ্ঠ-পরিমার্জ্জন অর্থাৎ বমন ও বিরেচন প্রয়োগ করিবার বিধি আছে এবং সর্ব্বথা তৈলবর্জ্জন করিতে হইবে, ইহাও উপদিষ্ট হইয়াছে। চক্রদত্তে এরূপ আছে যথা—

"সর্ব্বাসাং বমনং পথ্যং পটোলারিষ্টবাসকৈঃ।
কষায়ৈশ্চ বচাবৎসযষ্ট্যাহ্বফলকল্কিতৈঃ ॥"

অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার মসূরিকা রোগে, পটোলপত্র, নিমছাল ও বাসক ইহাদিগের কষায় [পাচন] প্রস্তুত করিয়া, উহাতে বচ, ইন্দ্রযব, যষ্টিমধু ও মদনফলচূর্ণ [ময়নাফল] প্রক্ষেপ করতঃ পান করিয়া বমন করা কর্ত্তব্য। আরও আছে যে—

"সক্ষৌদ্রং পায়য়েদ্ব্রাহ্ম্যারসং বা হৈলমোচিকং।
বান্তস্য বেচনং দেয়ং শমনঞ্চাবলে নরে ॥"

অর্থাৎ মসূরিকারোগে ব্রহ্মীশাকের রস অথবা হিংচা শাকের রস [হেলাঞ্চার রস] মধুর সহিত পান করাইয়া বমন করাইবে।* অনন্তর বিরেচনের [জোলাপের] ব্যবস্থা করিবে। রোগী দুর্ব্বল থাকিলে বিরেচন না দিয়া, দোষ [বায়ু, পিত্ত ও কফ] শমনকর ঔষধ দিবে। বমনদ্বারা ঊর্দ্ধকোষ্ঠ [পাকস্থলী] ও বিরেচন বা জোলাপ দ্বারা অধঃকোষ্ঠ [অন্ত্রাদি] পরিষ্কার হয়। ইহার অন্য নাম অন্তর্ধৌতকরা। তৎপরে আছে,—

অর্থাৎ ঔষধের মাত্রার পরিমাণের কোন স্থিরতা নাই। দোষ অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত, কফ, পাচকাগ্নি, শরীরের বল, রোগীরবয়ঃক্রম, রোগের অবস্থা, দ্রব্য অর্থাৎ ঔষধের বলাবল (ঔষধের মৃদুত্ব ও তীক্ষ্ণত্ব ইত্যাদি) এবং রোগীর কোষ্ঠাদির অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া ঔষধের মাত্রা নির্দ্ধারিত করিতে হয়।

* স্বরসের মাত্রা ৮ তোলা ও মধু ২ তোলা লইতে হয়।

"উভাভ্যাং হৃতদোষস্য বিশুধ্যন্তি মসূরিকাঃ।
নির্ব্বিকারাশ্চাল্পপূয়াঃ পচ্যন্তে চাল্পবেদনাঃ॥"

অর্থাৎ বমন ও বিরেচন দ্বারা দোষ নির্গত হইয়া শরীর বিশুদ্ধ হইলে মসূরিকা [বসন্ত] সমূহ বিকারশূন্য, অল্প বেদনা ও অল্পপূয়ঃ বিশিষ্ট হইয়া স্বয়ংই পাকিয়া উঠে। আরও আছে—

"কুর্য্যাদ্‌ব্রণবিধানঞ্চ তৈলাদিন্ বর্জ্জয়েচ্চিরং।"

অর্থাৎ মসূরিকা রোগে ব্রণরোগোক্ত বিধানে চিকিৎসা করিবে এবং তৈলাদি কিছু অধিককাল বর্জ্জন করিবে। কিন্তু, ভাবপ্রকাশে মসূরিকার জন্য বমন বিরেচনাদি যে প্রয়োগ করিতে হইবে, এমন কোন সাক্ষাৎ [Direct] উপদেশ পাওয়া যায় না। তবে উহাতে এরূপ আছে যে,—

"মসূরিকায়াং কুষ্ঠেষু লেপনাদি ক্রিয়া হিতা।
পিত্তশ্লেষ্মবিসর্পোক্তা ক্রিয়া চাত্র প্রশস্যতে॥"

অর্থাৎ কুষ্ঠরোগে যে সকল প্রলেপাদির বিষয় বলা হইয়াছে এবং পিত্তশ্লৈষ্মিক বিসর্পরোগে যে সকল ক্রিয়া কথিত হইয়াছে, মসূরিকা রোগে সেই সকল ক্রিয়া প্রশস্ত। আবার, ঐ গ্রন্থের বিসর্পরোগের চিকিৎসায় আছে,—

"বিরেকবমনালেপ সেচনাস্রবিমোক্ষণৈঃ।
উপাচরেদ্ যথাদোষং বিসর্পানবিদাহিভিঃ॥"

অর্থাৎ বিসর্প রোগে দোষ অনুসারে বিবেচনাপূর্ব্বক বিরেচন, বমন, প্রলেপ, পরিষেক, রক্তমোক্ষণ ও অবিদাহী দ্রব্য দ্বারা চিকিৎসা করিবে। পিত্তশ্লৈষ্মিক বিসর্পে যে বমন ও বিরেচন দিতে হইবে, ভিন্নভাবে এমন কোন উপদেশ নাই। ঐ পুস্তকের অন্য স্থানে আছে,—

"কুষ্ঠানয়স্ফোটমসূরিকোক্তচিকিৎসয়াপ্যাশু হরেদ্বিসর্পান্।"

অর্থাৎ কুষ্ঠ, স্ফোটক ও মসূরী রোগোক্ত চিকিৎসাদ্বারা বিসর্প নষ্ট হয়।

কুষ্ঠ, বিসর্প, বিস্ফোটক ও মসূরিকা প্রভৃতি এক জাতীয় পীড়া এবং তাহাদের চিকিৎসাও প্রায় তুল্য।

জলপান সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, আচার্য্য মহাশয়েরা কেহ কেহ গরমজল পান করিতে দিয়া থাকেন। ভাবপ্রকাশকার বলেন—"জলঞ্চ শীতলং দদ্যাজ্জ্বরেহপি নতু তৎ পচেৎ।" অর্থাৎ অন্য সময়ে ত শীতল জল দিবেই, জ্বর হইলেও বসন্তরোগীকে শীতল জল দিবে, উষ্ণজল কদাচ দিবে না।

পথ্যাদি সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদের বিধি এই যে, প্রথমে লঘুপাক পথ্য, যেমন খইএর মণ্ড, সাগু, বার্লি প্রভৃতি এবং পূয়ঃঅবস্থায় বৃংহণ অর্থাৎ বলকারক পথ্য দিবে। আচার্য্যদের মতে কোন কোন স্থলে আগাগোড়াই রোগীকে লুচি, কচুরী, মোহনভোগ, সিঙ্গাবা প্রভৃতি খাইতে দেওয়া হয়। কোন কোন স্থলে জ্বর হওয়া মাত্রই ঘর্ম্ম হউক বা না হউক, সর্ব্বাঙ্গে শরীরপালো মালিসের ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে।

প্রচলিত মতে হাম বসন্তাদি রোগে [বিশেষতঃ হাম ও জলবসন্তে] রোগীকে কলায়ের দাল ও ভাত খাওয়াইয়া রসস্থ করান হইয়া থাকে। সময় সময় ইহাও দেখা যায় যে রসস্থ করিতে গিয়া রোগের উৎকটতার বৃদ্ধি করা হইয়া থাকে এবং উহার দরুণ শ্লেষ্মার অতিমাত্র বৃদ্ধি হইয়া কাশি, নিমোনিয়া, ব্রংকাইটিস্ প্রভৃতি নানাবিধ শ্লৈষ্মিক উপসর্গ ও অতিসার আসিয়া উপস্থিত হয়।

বমন ও বিরেচন প্রয়োগ করার সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদের যুক্তি এই যে, বমন ও বিরেচন দ্বারা শরীরের দোষ সকল নির্গত হইয়া যাওয়াতে শরীর বিশুদ্ধ হয়, কাজেই বসন্ত সকল নির্ব্বিকার, অল্প বেদনাযুক্ত ও অল্প পূয়ঃবিশিষ্ট হইয়া থাকে। আর, প্রচলিত মতে বমন ও বিরেচনাদি প্রয়োগ না করার যুক্তি এই যে, বমন ও বিরেচন দিলে অনেক সময় বমনাদি দ্বারা শরীরের রসাদি নিঃসৃত হওয়ার দরুণ শরীর শুষ্ক হওয়াতে, বসন্ত ভাল

করিয়া বাহির হইতে পারে না বা লাট খাইয়া যায় [লয় পাইয়া যায়]। আমরা সচরাচরই দেখি যে হামাদি রোগে, এ্যালোপ্যাথি মতে, বুঝিতে না পারিয়া, হাম উঠিবার সময় জ্বরাবস্থায় জোলাপ দেওয়াতে হাম লাট খাইয়া গিয়া রোগীর বিকারাদি আসিয়াছে এবং তাহাতেই রোগীর মৃত্যু হইয়াছে। বৃংহণ করার সময় আয়ুর্ব্বেদ মতে সাগু, বার্লি, মুগ, মসূরের যূষ, মাংসযূষ [মাংস নহে] প্রভৃতি দ্বারা রোগীকে বৃংহণ * বা বলকারক পথ্য দিতে হয়। কিন্তু আধুনিক মতে অনেক স্থলে রোগীকে লুচি কচুরী প্রভৃতি খাওয়ান হয়। কিন্তু এই সমুদায় ঔষধ [বমন বিরেচনাদি] ও পথ্য [লুচি কচুরী প্রভৃতি] দিবার সময় "দাদায় বল্‌ছে ভান্‌তে ধান্, ভান্‌তে আছি ওদাধান্" অর্থাৎ দিতে আছে বলিয়া না দিয়া, কোন্ সময়ে বমন বিরেচনাদির প্রয়োগ ও কোন্ সময়ে লুচি কচুরী, মোহনভোগ ইত্যাদির ব্যবস্থা করিতে হইবে, তাহা রোগীর অবস্থা ও রোগের উপসর্গাদির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া প্রয়োগ করা উচিত। কারণ, বসন্তে উদরাময়, আমাশয়, রক্তামাশয়, পেটফাঁপা প্রভৃতি উপসর্গ ও উপস্থিত হইতে পারে। ঐ সময়ে ঐ সকল গুরুপাক পথ্য পড়িলে, রোগের ও রোগীর অবস্থা যে কিরূপ দাঁড়াইবে এবং উক্ত পথ্যাদি যে কি বিষময়ফল উৎপাদন করিবে, তাহা সহজেই উপলব্ধি করা যাইতে পারে।

বসন্তচিকিৎসায় এই কয়েকটী বিষয়ে বিশেষরূপে লক্ষ্য রাখা দরকার। [১] বসন্তের গুটিকা যাহাতে পরিষ্কার রূপে উঠিতে পারে, উঠিবার কোন বাঁধা না হয়, বা উঠিবার পর লয় পাইয়া না যায়। ঝাড়িয়া বাহির হইতে না পারিলে বা লাট খাইয়া গেলে অর্থাৎ বসন্তের গুটিকা উঠিবার পর যদি শরীরমধ্যে পুনর্ব্বার লয় পাইয়া যায়, তবে শরীরমধ্যে পচনক্রিয়া আরম্ভ হয়। এইরূপ হইলে রোগীর অবস্থা সাঙ্ঘাতিক হয়,

* যে সমস্ত দ্রব্য বা ক্রিয়াদ্বারা রস রক্তাদির বৃদ্ধি হইয়া শরীরের পুষ্টি হয়, তাহাদের নাম বৃংহণ।

গুরুতর উপসর্গ সকল আসিয়া উপস্থিত হয় এবং তখন রোগীর রক্ষা-পাওয়া ভার হইয়া উঠে। (২) দ্বিতীয়তঃ যাহাতে বসন্ত অতিরিক্ত না উঠে, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। বসন্ত অতিরিক্ত উঠিলে, সর্ব্ব-শরীর ফুলিয়া যায়, বেশী উপদ্রবাদি যুক্ত হয় এবং উহাদের শঙ্কায় (সন্তাপে বা টারসে) তীব্রজ্বর হয় এবং পূয়াদিও বেশী হইয়া থাকে। এই অবস্থায়ও চিকিৎসা কৃচ্ছ্রসাধ্য হইয়া উঠে। (৩) বসন্ত উঠিবার পর, বসন্ত যত শীঘ্র পাকে তাহার উপায় করা। বসন্ত পাকিয়া ভিতরে পূঁজ হইলে, যদিও আরোগ্য সম্বন্ধে একবারে নিরুদ্বেগ হওয়া যায় না, তথাপি আর বড় বেশী আশঙ্কা থাকে না।

হাম প্রভৃতি পিত্তশ্লৈষ্মিক রোগে নাতিকর্ষণ ও নাতিবৃংহণ চিকিৎসাই আয়ুর্ব্বেদের বিধি এবং সাধারণ জ্ঞানেও তাহা নিতান্ত যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয়। অতিকর্ষণে রসাদি শুষ্ক হইয়া বসন্তের গুটিকার উদ্‌গমের ব্যাঘাত জন্মাইয়া বিকারাদি আনয়ন করে; আর, অতিবৃংহণেও শ্লৈষ্মিক উপসর্গাদি উপস্থিত হইয়া নানা প্রকারে রোগীর জীবন সঙ্কটাপন্ন করিয়া তুলে। কেহ কেহ আবার বলেন যে, আমাবস্থায় (রোগের অপক্কা-বস্থায়) যদি বমন ও বিরেচন দ্বারা উত্তমরূপে দোষ নির্গত হইয়া যায়, তাহা হইলে রোগের অন্য অবস্থায় তাদৃশ ভয়ের সম্ভাবনা থাকে না এবং যন্ত্রণার লাঘব হইয়া ব্রণ সকল শীঘ্র পাকিয়া উঠে। বমন প্রয়োগে অসু-বিধা হইলে বিরেচন প্রয়োগ করিতে হয়। আমাদের বিবেচনা হয় যে, পূর্ব্বকালে যে বমন বিরেচনাদি দেওয়া হইত, তাহার কারণ, তৎকালে লোকের দেহ সবল ছিল। চরকের সময়ে লোকে আধসের রেড়ির তৈল (কেষ্টরঅয়েল) দ্বারা জোলাপ লইত। কিন্তু এখন আহার বিহারাদির নানা-প্রকার দোষের দরুণ আধুনিক লোকের দেহ আর পূর্ব্বকালের লোকের দেহের মত সবল নাই এবং এই জন্য আধুনিক কালে বমন বিরেচনাদির কুফল প্রত্যক্ষ করিয়া উহাদের প্রচলন উঠিয়া গিয়াছে, আর, "শমনঞ্চাবলে

নবে” ব্যবস্থার প্রচলন হইয়াছে অর্থাৎ দুর্ব্বলের পক্ষে বিরেচন দ্বারা দোষের সংশোধক ঔষধ প্রয়োগ না করিয়া উহাদের (বায়ু, পিত্ত ও কফের) সংশমনকর ঔষধ প্রয়োগাদির ব্যবস্থা চলিত হইয়াছে। সংশোধন ও সংশমন ঔষধ সম্বন্ধে পরিশিষ্ট দেখ।

আমাদের এই গ্রন্থ প্রণয়নকালে একজন চিকিৎসক বলিলেন যে, তিনি একটী বসন্তরোগীকে জোলাপ দেওয়াতে উহার রক্তামাশয় হইয়াছিল। ঐরূপ হইবার কারণ সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে, যথা—

“স্নিগ্ধস্বিন্নায় বান্তায় দদ্যাৎ সম্যগ্ বিরেচনম্।
অবান্তস্য ত্বধঃ স্রস্তো গ্রহণীং ছাদয়েৎ কফঃ।
মন্দাগ্নিং গৌরবং কুর্য্যাজ্জনয়েদ্ বা প্রবাহিকাম॥”

আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞানম্।

অর্থাৎ রীতিমত স্নেহস্বেদ প্রদানান্তর বমন করাইয়া পশ্চাৎ বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ করিবে। অগ্রে বমন নাকরাইলে অধঃপতিত কফ গ্রহণীকে আচ্ছাদন করিয়া মন্দাগ্নি বা প্রবাহিকা (আমাশয়) রোগ উৎপাদন করে। *

---

* “তিক্তস্য সর্পিষঃ পানং বিরেকো রক্তমোক্ষণং।” চরক। অর্থাৎ পিত্ত দমনের জন্য কুষ্ঠরোগোক্ত “তিক্তঘৃত” পান করিবে, আর উপযুক্ত সময়ে বিরেচন দিবে বা শস্ত্রদ্বারা বা জলৌকা দ্বারা রক্তমোক্ষণ করিবে। বসন্তরোগে পিত্ত ও রক্তের বিকৃতি বাহুল্যরূপে থাকে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পিত্তের ও রক্তের ধর্ম্ম ও চিকিৎসা এক। স্থলবিশেষে পিত্তের প্রকোপ দমনের জন্য তিক্তঘৃত পান, বিরেচন ও রক্তমোক্ষণ এই ত্রিবিধ ক্রিয়ারই দরকার হয়। তবে, বাগ্‌ভটে আছে—

“স্নেহস্বেদাবনভ্যস্য কুর্য্যাৎ সংশোধনন্তু যঃ।
দারুশুষ্কমিবানমা শরীরন্তস্য দীর্য্যতে॥”

অর্থাৎ স্নেহন বা স্বেদ ক্রিয়া দ্বারা শরীর স্নিগ্ধ বা স্বিন্ন না করিয়া যদি বিরেচন দেওয়া যায়, তাহা হইলে, শুষ্ক কাষ্ঠকে নোয়াইতে গেলে যেমন উহা নমিত না হইয়া ভগ্ন হইয়া যায়; সেইরূপ রুক্ষ শরীরে (অস্নিগ্ধ শরীরে) বিরেচন প্রদান করিলেও বায়ু কুপিত হইয়া

যাহাহউক, বমনাদি দিতে হইলে প্রথম বারের জ্বরের অতিপ্রারম্ভে ও রোগী বিশেষ রূপে সবল থাকিলে বমন দিলে বিশেষ দোষ নাই, আর বিরেচন (জোলাপ) প্রয়োগ করিতে হইলে বসন্ত সম্পূর্ণ বাহির হইবার পর এবং রোগীর কোষ্ঠবদ্ধাদি থাকিলে এবং রোগীর ঐ জন্য বিশেষ অশান্তি হইলে, মৃদু বিরেচন (Mild Purgative) প্রয়োগ করা যাইতে পারে। রোগ ও রোগীর অবস্থা বুঝিয়া স্থল বিশেষে ইহাদের প্রয়োগ মন্দ নহে। তাই বলিয়া বসন্তের উদ্গমের সময় বমন বিরেচন প্রয়োগ করিলে, রসাদি অতিরিক্ত নিঃসৃত হইয়া বসন্ত বসিয়া যাওয়ারই খুব সম্ভাবনা, সুতরাং কখনই উহাদের প্রয়োগ করিবে না। আর, জোলাপের বা বমনের সাধারণ ঔষধ দ্বারা জোলাপ বা বমন দিলে হইবে না। সাধারণতঃ বসন্তের জন্য নিম্নলিখিত বমন ও বিরেচন আয়ুর্ব্বেদে উপদিষ্ট আছে। পলতা ১ তোলা + নিমছাল ১ তোলা একত্র থেতো করিয়া আধসের জলে জ্বাল দিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া উহার মধ্য হইতে এক ছটাক আন্দাজ পাচন, সৈন্ধব লবণ ১ তোলা ও মধু ১ বা ২ তোলা একত্র মিশাইয়া পান করিলেই বসন্তের উৎকৃষ্ট বমন হয়। বিরেচন দিতে হইলে খদিরাষ্টক পাচন যথারীতি তৈয়ার করিয়া (পরিশিষ্ট দেখ) ঐ পাচন সহ ২ তোলা পরিষ্কার ক্যাষ্টরঅয়েল মিশাইয়া পান করিতে দিবে। বসন্তরোগে স্নিগ্ধ-জোলাপ ব্যবস্থা। সোণামুখী রুক্ষ

শরীরের অপকার করে। আর, কি বিরেচন, কি রক্তমোক্ষণ, উভয়ের দ্বারাই বায়ুর প্রকোপ হয় "বিরিক্তস্য স্রুতরক্তস্য চ পবনকোপভয়ং" সুতরাং বিরেচনাদি দ্বারা পিত্ত-দমন করিতে হইলে, আগে তিক্তঘৃত পানকরা কর্ত্তব্য। তিক্তঘৃত সেবনে পিত্তও নিবারিত হয় এবং শরীরও স্নিগ্ধ হয়। ইহাতেও যদি পিত্তের প্রকোপ শান্ত না হয়, তবে তখন বিরেচন দিতে হয়। আর, তাহাতেও কৃতকার্য্য না হইলে, তখন রক্তমোক্ষণ করিতেও কোন বাধা হয় না। এরূপ করিলে বায়ুর প্রকোপের আশঙ্কা থাকে না। তবে "বিরেকঃ পিত্তহরাণাম্" চরক। অর্থাৎ পিত্তনাশক সকল প্রকারের ক্রিয়ার মধ্যে বিরেচন সর্ব্ব প্রধান। (আয়ুর্ব্বেদ সঞ্জীবনী।)

বলিয়া বায়ুর প্রকোপ হওয়ার সম্ভাবনা আছে, সুতরাং সোণামুখীর জোলাপ দিবে না। আর, যদিই বা সোণামুখীর জোলাপ দাও তবে তৎ-সহ ঘৃত মিশ্রিত করিয়া (পূর্ণবয়স্ক লোকের পক্ষে, আধপোয়া পাচনে ১ তোলা গাওয়া ঘৃত দেওয়া বিধি। ঘৃত বলিলেই গাওয়া ঘৃত বুঝিবে। তৈল বলিলেই তিলতৈল বুঝিবে। আর গুড় বলিলেই এখগুড় বুঝিবে। * তবে যেখানে বিশেষ করিয়া নির্দ্দেশ থাকে, সেখানে অন্যরূপ বুঝিবে) অর্থাৎ স্নেহ-যুক্ত করিয়া প্রয়োগ করিবে। ঘৃতভিন্ন অন্য কোন প্রকার স্নেহ (ঘৃত, তৈল, বসা, মজ্জা এই ৪ প্রকার স্নেহ পদার্থ) যোগ করিবে না। তবে যেখানে বিশেষ নির্দ্দেশ থাকে, সেখানে পাচন সহ এরণ্ড-তৈলাদি যোগ করিতে পার। সোণামুখীর জোলাপে পেট কামড়ায়। ঐ দোষ দূর করিবার জন্য উহার সহিত শুন্ঠী, ধনে বা মৌরি যোগ করা যাইতে পারে। এখানে আধতোলা সোণামুখী ও দেড়তোলা শুঁঠ, ধনে বা মৌরী ইত্যাদির যাহা একটা যোগ করিয়া পাচন তৈয়ার করিতে পার। অথবা ত্রিফলার পাচন যথারীতি তৈয়ার করিয়া (ত্রিফলা—আঁঠি-বাদে হরিতকী, আমলকী, বহেড়া সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল আধসের, শেষ আধপোয়া) সমস্ত পাচন টুকু সহ তেউড়ীমূল-চূর্ণ শিকিভরি কি ⁄০ আনা ও গাওয়া ঘৃত ১ তোলা মিশাইয়া বিরেচনার্থ পান করিতে দিবে। অথবা ২ তোলা আমলকীর পাচন যথারীতি তৈয়ার করিয়া, সমস্ত পাচনটুকু সহ তেউড়ীমূলচূর্ণ।০ শিকিভরি হইতে আধতোলা ও

"সিদ্ধার্থঃ সর্ষপে গ্রাহ্যো লবণে সৈন্ধবংমতম।
মূত্রে গোমূত্রমাদেয়ং বিশেষো যত্রনেরিতঃ॥
পয়ঃ সর্পিঃ প্রয়োগেষু গব্যমেব প্রশস্যতে।

*   *   *   *   *

দ্রবেঽনুক্তে জলং গ্রাহ্যং তৈলেঽনুক্তে তিলোদ্ভবম্॥"

ইত্যাদি।

গাওয়াঘৃত ১ তোলা মিশাইয়া সেবন করিবে। কিস্‌মিসের কাথ (পাচন) ও ঐরূপ তৈয়ার করিয়া তেউড়ীচূর্ণ সহ দেওয়া যায়।

যাহাহউক, হাম বসন্তাদিতে জোলাপ দেওয়ার দরকার হইলে, এই সকলের মধ্যে কোন একটী দিতে পার। শিশু প্রভৃতির মাত্রা অবশ্যই কমাইয়া দিবে। গর্ভিণীকে বমন ও বিরেচনাদি কোন প্রকার সংশোধন ঔষধ দিবে না। কেবল ইহাই যথেষ্ট নহে, অধিকন্তু গর্ভিণীকে পাচন দিতে হইলে, পাচনের মধ্যে হরিতকী, কটকী প্রভৃতি বিরেচক দ্রব্য থাকিলে ঐ সমস্ত বিরেচক দ্রব্য বাদ দিয়া, বাকী দ্রব্য দ্বারা পাচন তৈয়ার করিয়া সেবন করিবার ব্যবস্থা করিবে। গর্ভিণীকে বিরেচন বমনাদি দিলে গর্ভস্রাবাদি হইয়া রোগিণী মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। বসন্ত সম্যক্ উঠিবার পর যদি রোগীর দাস্ত পরিষ্কার না থাকে এবং তজ্জন্য শরীরে বিশেষ গ্লানি থাকে, আর রোগী বিশেষরূপ সবল থাকে, তবেই বিরেচন প্রয়োগ করিতে হয়। কিন্তু, এরূপ স্থলেও মৃদু বিরেচন ভিন্ন তীক্ষ্ণ জোলাপ ব্যবস্থা করিবেনা।

আয়ুর্ব্বেদে তৈলবর্জ্জনের বিধি আছে। বাস্তবিক উহা প্রাথমিক জ্বরাবস্থার ও গুটিকার আমাবস্থার (অপক্কাবস্থার) প্রতিই লক্ষ্য করিয়া ঐরূপ বিধি দেওয়া হইয়াছে অর্থাৎ ঐ ঐ সময়ে তৈলাদি প্রয়োগ করিবে না এবং বসন্ত আরাম হইবার পরও কিছুকাল তৈলাদি ভক্ষণ করিতে বিরত থাকিবে। * বসন্ত একপ্রকার স্ফোটক (ফোঁড়া) রোগ বিশেষ। উহা পাকিবার পর ব্রণের নিয়মানুসারে চিকিৎসা করিতে হয়। "কুর্য্যাদ্ব্রণবিধানঞ্চ" চক্রদত্তঃ। সুতরাং পক্কাবস্থায় তৈলাদির বাহ্যপ্রয়োগের বাধা

---

* কিন্তু পাকতৈল (ঔষধ সহ সিদ্ধতৈল) সর্ব্বাবস্থায়ই প্রয়োগ করা যাইতে পারে। কারণ, ঔষধ সহ তৈল সিদ্ধ করিলে, তৈল নিজের গুণ পরিত্যাগ করিয়া ঔষধের গুণ-গ্রহণ করিয়া থাকে। ("তৈলাদয়ো হি দ্রব্যান্তরসংস্কৃতাঃ সন্তঃ স্বগুণং বিহায়ৈব সংস্কারকদ্রব্যগুণানবহন্তি।" চক্রদত্তঃ)

নাই। আমরা সচরাচর দেখি যে, সামান্য একটা ব্রণের (ফোঁড়ার) অপক্কাবস্থায় তাহাতে তৈল লাগিলে, উহা জাম্‌ড়ো হইয়া যায় অর্থাৎ তখন উহা পাকেও না এবং বসেও না। বসন্তের গুটিকাগুলি পাকিবার পর আয়ুর্ব্বেদোক্ত পিণ্ডতৈল (পরিশিষ্ট দেখ) প্রয়োগে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। গুটিকাসকল বিদীর্ণ করিয়া পূঁজ নির্গত করিয়া পিণ্ডতৈল দ্বারা সর্ব্বদা ক্ষতগুলি ভিজাইয়া রাখিলে, চুলকণা বেদনা প্রভৃতি বসন্ত-ক্ষতের অসহ্য যন্ত্রণা যেন আগুণে জল ঢালার মত নিবিয়া যায় ও রোগী ঘুমাইয়া পড়ে।

পথ্যাদি সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদের যুক্তি এই যে, প্রথমে রোগীকে লঙ্ঘনের অর্থাৎ লঘুভোজনের উপর রাখিতে হয়। *

লঙ্ঘন দুই প্রকার—একপ্রকার উপবাস ও অন্যপ্রকার লঘু-ভোজনকে বুঝায়। এখানে উপবাস নহে। কারণ, উপবাস কর্ষণ-কারক, সুতরাং রসাদির শুষ্কতা কারক। রোগের পরিণামে (যেমন গুটিকার পক্কাবস্থায়) বৃংহণ অর্থাৎ বলকারক পথ্য দিতে হয়। লঘু-ভোজন ও বৃংহণপথ্য কি, তাহা পূর্ব্বেই একবার উল্লেখ করা হইয়াছে। পথ্যাদির বিস্তৃত ব্যবস্থা পরে দেওয়া যাইবে।

কোন রোগের চিকিৎসাই বাধাবাধি ভাবে কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়মানু-

---

* "যৎকিঞ্চিল্লাঘবকরং দেহে তল্লঙ্ঘনং স্মৃতম্।" চরক।

অর্থাৎ যে কিছু পদার্থ দেহের পক্ষে লঘুতা সম্পাদক, তাহাকে লঙ্ঘন কহে। দেহের পুষ্টিকর পদার্থের নাম বৃংহণ।

"শরীরলাঘবকরং যদ্দ্রব্যং কর্ম্ম বা পুনঃ।
তল্লঙ্ঘনমিতি জ্ঞেয়ং বৃংহণন্তু পৃথগ্বিধম্॥"

ভাব প্রকাশ।

যে দ্রব্য অথবা কর্ম্ম শরীরের লঘুতা সম্পাদক তাহাকে লঙ্ঘন বলে। বৃংহণ ইহা হইতে পৃথক্ অর্থাৎ লঙ্ঘন ও কর্ষণের বিপরীত শরীরপোষক।

সারে হইতে পারে না। মূল রোগ ও উপসর্গাদির অবস্থা, রোগীর বয়স ও সাধারণ স্বাস্থ্যাদির বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়। কেহ কেহ বলেন যে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত নিয়মে বসন্ত-রোগীর চিকিৎসা কবা যাইতে পারে, যথা—

সাধারণতঃ বসন্ত হউক আর নাই হউক, নূতন জ্বরে রক্তের উত্তাপ ১০০° ডিগ্রির বেশী হইলেই এবং বসন্ত হইতে পারে এরূপ সন্দেহ করিবার কারণ বর্ত্তমান থাকিলে (বসন্ত রোগের পূর্ব্বলক্ষণ দেখ) এবং রোগী বমনের অযোগ্য না হইলে, বসন্তের জন্য যে বমন নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহা সেবন করাইয়া বমন কবাইবে। শাস্ত্রে বসন্তের জন্য নানাবিধ বমনেব বিধি আছে, কিন্তু যেটী আমবা পূর্ব্বে দিয়াছি, সেইটিই সহজ। নিম্নলিখিত স্থলে বমন দেওয়া নিষেধ। যথা—গুহ্যদ্বাবে পিচ্‌কারী দেওয়ার পর বমন দিবে না। হৃদ্‌রোগ, মূত্রাঘাত, প্লীহা, গুল্ম, উদব, স্বরভঙ্গ, শিরোরোগ, রক্তবমি, কর্ণরোগ, অক্ষিরোগ বক্ষে বেদনা, গর্ভ-বতী ইত্যাদি স্থলে বমন করান নিষেধ। না বুঝিয়া বসন্তের উদ্‌গমের অবস্থায় বমন দিলে প্রায়শঃ বসন্ত উঠিবার পক্ষে ব্যাঘাত হয় ও রোগ সাঙ্ঘাতিক হয়। আব, বসন্ত উঠিবার কালে আপনা হইতেও অতিরিক্ত বমন হইতে পারে, ঐরূপ হইলেও বোগ সাঙ্ঘাতিক হয়। বিশেষতঃ চারিদিকে বসন্ত হইতে থাকিলে ২।১ দিন জ্বর ভোগ না করিয়া কোনও রোগী প্রায় চিকিৎসকের শরণাগত হয় না, সুতরাং অনেক স্থলে বমনের কাল উত্তীর্ণ হইয়া যায়। এই সমস্ত কারণে আজ কাল আর প্রায়শঃ বমনাদির প্রয়োগ হয় না।

যাহাহউক, বমনকারক ঔষধ সেবনের পব শয়ন করা বা নিদ্রা যাওয়া নিষেধ। বমনকারক ঔষধ সেবনের পব বমন হইতে গৌণ হইলে, আবশ্যক হইলে গলায় আঙ্গুল দিবে। বমনের পর শরীর ও মন সুস্থির হইলে, খৈ আধপোয়া + মিছরি /• একছটাক + পিণ্ডখেজুর ৫১• আধ-

ছটাক+কিস্‌মিস্ ১ তোলা, একত্র আধসের জলে ভিজাইয়া রাখিবে। মিছরি গুলিয়া (গলিয়া) গেলে, অল্প চট্‌কাইয়া ছাঁকিয়া পান করিতে দিবে। বমন দেওয়ার পূর্ব্বেই এই দ্রব্যগুলি ভিজাইয়া রাখার দরকার হয়। বমনের দিনে বা তৎপর দিন অন্য কোন ঔষধ দিতে নাই। তবে, মধ্যাহ্নে ১ পুরিয়া ও সন্ধ্যার সময় ১ পুরিয়া মকরধ্বজ (১ রতি মাত্রায়) বেদানার রস বা মিষ্ট কমলা নেবুর রস ১ ঝিনুক ও মিছরি সহ দিতে পার। ইহাতে রোগীর বলাধান হয় এবং বমনের পর পাকস্থলীর যে একটুকু আধটুকু উত্তেজনা থাকে ও শরীরে যে একটুকু অস্বাস্থ্যের মত বোধ হয়, তাহা বিদূরিত হয়।

বমনের তৃতীয় বা ৪র্থ দিনে বিরেচন দিতে হয়। বমন, বিরেচন প্রভৃতিকে সংশোধন বলে (পরিশিষ্ট দেখ)। বমন ও বিরেচন দ্বারা কোষ্ঠ-শুদ্ধি হইলে পর সংশমন (পরিশিষ্ট দেখ) ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়। কিন্তু, রোগী বমন বিরেচনাদি সংশোধনের অযোগ্য হইলে প্রথম হইতেই সংশমন ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

যাহাহউক, যে নিয়মে বসন্তের চিকিৎসা করা যাইতে পারে, তাহার আভাস নিম্নে দেওয়া গেল। যথা—

মসূরী দেখা দিবার পূর্ব্বে যে জ্বর হয়, তাহার বিশেষ কোন চিকিৎসা করিতে হয় না। রোগীকে লঘু পথ্যের উপর, যেমন, সাগু, বার্লি, কাঁচা-মুগের যূষ, মসূরের যূষ প্রভৃতি খাওয়াইয়া রাখিতে হয়। উক্ত লঘু-পথ্যের মধ্যে সাগু ও কাঁচামুগের যূষ, মৃদুসারক এবং বার্লি ও মসূর-যূষ মৃদু-ধারক। রোগীর কোষ্ঠকাঠিন্য কি পাতলাদাস্ত আছে বিবেচনা করিয়া যেটী উপযুক্ত হয় প্রয়োগ করিবে। ইহাই বসন্তের প্রথমবারের জ্বরের সাধারণ চিকিৎসা। তবে, বিশেষ সাঙ্ঘাতিক উপসর্গাদি উপস্থিত হইলে (যেমন, অতিরিক্ত ভেদ, বমন ইত্যাদি) সেই সেই উপসর্গের সাধারণ ঔষধাদি প্রয়োগ করিতে হয়। তবে, হাম ও বসন্তের জ্বরে রোগী

জল যত কম খায় ততই মঙ্গল। তাই বলিয়া পিপাসার সময় জল একবারে না দেওয়া নিতান্তই দোষ।

"তৃষ্ণা গরীয়সী ঘোরা সদ্যঃ প্রাণবিনাশিনী।
তস্মাদ্দেয়ং তৃষ্ণার্ত্তায় পানীয়ং প্রাণধারণম্॥"

হারীতসংহিতা।

অর্থাৎ তৃষ্ণা অতি গুরুতর ও ভয়ঙ্কর। ইহাদ্বারা সদ্যই প্রাণ বিনষ্ট হইতে পারে। এইজন্য পিপাসার্ত্ত ব্যক্তিকে প্রাণধারণের নিমিত্ত, পান করিতে জল প্রদান করিবে। তৃষ্ণার সময় জল না পাইলে নিম্নলিখিত দোষ হয়—

"তৃষিতো মোহমায়াতি মোহাৎ প্রাণান্ বিমুঞ্চতি।
অতঃ সর্ব্বাস্ববস্থাসু ন কচিৎ বারি বার্য্যতে॥"

সুশ্রুত।

তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তি জল না পাইলে তাহার মোহ হইতে পারে। মোহ হওয়ার দরুণ মৃত্যু উপস্থিত হইতে পারে। সুতরাং যে কোন অবস্থাতেই তৃষ্ণা উপস্থিত হউক না কেন, সকল অবস্থাতেই জল প্রদান করিতে হইবে। জল কখনও বারণ করিবে না। (বসন্তের পিপাসার সময় করণীয় বিষয় পরে দেখ)। বসন্তের গুটিকা ভাল হইয়া উঠিতে যদি কালবিলম্ব ঘটে অথবা উত্থিত পিড়কা লাট খাইয়া যায় অর্থাৎ শরীরমধ্যে পুনর্ব্বার বসিয়া যায়, তবে শরীরে জ্বালা, অরতি (মনের অস্থিরতা) সর্ব্বশরীরে চিট্ মিট্ করা (চর্ম্মের ভিতরে চুলকণার ন্যায় একপ্রকার যন্ত্রণা বোধ করা) প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। এইরূপ হইলে নিম্বাদি পাচন (পরিশিষ্ট দেখ) সেবন করিতে হয়। এই পাচন সেবন করিলে, বসন্তগুটিকা সকল শীঘ্র শীঘ্র বাহির হয় ও জ্বরের বেগ এবং শরীরের অন্যান্য যন্ত্রণা কমে।

বসন্তরোগে সাধারণতঃ, নিম্বাদি পাচন, অমৃতাদি, পটোলাদি, গুড়ূচ্যাদি, উশীরাদি, ভূনিম্বাদি অষ্টাদশাঙ্গ পাচন ও খদিরাষ্টক পাচন (এই

সকল পাচনের বিবরণ পরিশিষ্টে দেখ) রোগীর অবস্থা ও উপসর্গাদির বিবেচনায় প্রযুক্ত হইয়া থাকে। আয়ুর্ব্বেদে যতগুলি সংশমন ঔষধ আছে তন্মধ্যে, বিশেষতঃ পৈত্তিক বসন্তে অর্থাৎ বসন্তে পৈত্তিক লক্ষণ বেশী প্রকাশ পাইলে নিম্বাদি কষায় (পাচন) বিশেষ উপকার করে।

চক্রদত্ত মতে কজ্জলী বসন্তের উৎকৃষ্ট ঔষধ। এস্থলে কজ্জলী-প্রস্তুতের সময় পারা ১ ভাগ ও গন্ধক ২ ভাগ নিতে হয়। কজ্জলীর বিষয় পরিশিষ্টে দেখ। সাধারণতঃ, বসন্তচিকিৎসকেরা কজ্জলীর পরিবর্ত্তে রসসিন্দুর বা মকরধ্বজ প্রয়োগ করিয়া থাকেন।

মসূরীপিড়কার অপক্কাবস্থায় অর্থাৎ গুটিকা না পাকা পর্য্যন্ত প্রাতে নিম্বাদি পাচন ; ১০টার সময় ১ বার ও ৪টার সময় ১ বার কজ্জলী, প্রতি-বারে ৪।৫ রতি মাত্রায় লইয়া, পানের রস ও মধু সহ দেওয়া যাইতে পারে। এই সঙ্গে রাত্রে একটী রুদ্রাক্ষ জল সহ পাথরের বাটীতে ঘষিয়া, সেই ঘষা (ক্বাথ) আধতোলা, গোলমরিচচূর্ণ ২।৩ রতি ও ঠাণ্ডাজল সহ সেবন করিতে দিবে। পীড়া গুরুতর হইলে এই ব্যবস্থার সঙ্গে, মধু সহ শৃগালকণ্টকের অর্থাৎ শিয়ালকাটা গাছের মূল আধতোলা, বাসিজল সহ বাটীয়া শীতল জলে গুলিয়া পান করিতে দিবে।

এইত গেল নানা মুনির নানা মত ও আমাদের সমালোচনা। যাহা-হউক, কার্য্যক্ষেত্রে যেরূপে ভাগ বিলি করিয়া এই রোগের চিকিৎসা করা হয় তাহা নিম্নে দেওয়া গেল। এই বইর সঙ্গে মিলাইয়া মিলাইয়া চিকিৎসা করিলেই রোগী আরাম করিতে পারিবে। যথা—

প্রথমবারের জ্বর (Primary Fever).

সাধারণতঃ, এইজ্বরে বমন বা বিরেচন দিবে না। কারণ, রক্ত ও পিত্তের প্রকোপ ব্যতীত বসন্ত হয় না। রক্ত ও পিত্তের ধর্ম্ম ও চিকিৎসা এক। পিত্ত সারক ; কাজেই বিরেচনাদি দিলে অতিরিক্ত তরলভেদাদি উপস্থিত

হইয়া নানাদোষ ঘটিতে পারে। তবে বিশেষ দরকার বোধ করিলে দিতে পার। এই জ্বরে ৩।৪ দিন পর্য্যন্ত কোনও প্রকারের জ্বর নাশক ঔষধ দিবে না। রোগীকে জলসাগু, জলবার্লি, কাঁচামুগের যূষ বা মসূরের যূষ (অবস্থা বুঝিয়া) প্রভৃতির উপর রাখিয়া দিবে। ডাক্তারিতে দুগ্ধ দেয়, আয়ুর্ব্বেদ-মতে তরুণজ্বরে দুগ্ধ বিষতুল্য, সুতরাং নিষিদ্ধ। শাস্ত্রে আছে যে—

"জীর্ণজ্বরে কফেক্ষীণে ক্ষীরংস্যাদমৃতোপমম্।
তদেব তরুণেপীতং বিষবদ্ধন্তি মানবম্॥"

চক্রদত্তঃ।

অর্থাৎ জীর্ণজ্বরে কফক্ষীণ হইলে অর্থাৎ বায়ু বা পিত্তের প্রাধান্য অবস্থায় দুগ্ধপান, অমৃতপানের ন্যায় হিতকারী। কিন্তু তরুণজ্বরে (নবজ্বরে) দুগ্ধপান, বিষপানের ন্যায় প্রাণনাশক হয়। অতএব দুগ্ধ দিবে না। তবে, বসন্ত বাহির হইবার পর দুগ্ধসাগু দিতে পার। বিশেষ গুরুতর উপসর্গ উপস্থিত হইলে, সেই সেই উপসর্গ নিবারণের চেষ্টা করিবে অর্থাৎ ঐ ঐ উপসর্গের সাধারণ চিকিৎসা করিবে। উপসর্গাদির বিবরণ পরে পাইবে। উপসর্গাদির পৃথক্ পৃথক্ ভাবে যেরূপ চিকিৎসা করিতে হয়, জ্বরের সঙ্গে যুক্ত থাকিলেও সেইরূপেই চিকিৎসা করিতে হয়। রোগী জল যত কম খায় সেইদিকে দৃষ্টি রাখিবে, কিন্তু পিপাসার সময় জল না দেওয়াও গুরু-তর দোষ, ইহা ইতিপূর্ব্বেই একবার বলিয়াছি। বসন্ত দেখা না দেওয়া পর্য্যন্ত গরমজল ঠাণ্ডা করিয়া পিপাসার সময় অল্প অল্প করিয়া পান করিতে দিবে। চারিদিকে বসন্ত দেখা দিবার সময় সকল জ্বরেই যে বসন্ত বাহির হইবে, সকল জ্বরই যে বসন্তের জ্বর এমত নহে। বসন্ত দেখা দিবার পর জ্বর থাকিলে বা পরে জ্বর হইলে গরমজল কখনও দিবে না, ঠাণ্ডাজল দিবে। "জলঞ্চ শীতলং দদ্যাজ্জ্বরেঽপি নতু তৎপচেৎ।" অর্থাৎ যদি জ্বরও হয় তথাপি শীতলজল দিবে, উষ্ণজল কদাপি দিবে না। তবে জল দূষিত থাকিলে উহা খুব ফুটাইয়া, জলের দোষ নষ্ট করিয়া এবং পরে

উহা খুব ঠাণ্ডা করিয়া সকল অবস্থাতেই দিতে পার। বসন্তের বিজাতীয় পিপাসার সময় কিরূপ পানীয় দিতে হয় পরে, দেখ। বিশেষ দরকার হইলে, বসন্তের উদ্‌গমের পূর্ব্বে, জ্বর ত্যাগ করিবার জন্য "মৃত্যুঞ্জয়রস" প্রয়োগ করিতে পার।

মন্তব্য—কোন কোন কবিরাজ মহাশয়দের মত এই যে, বসন্তের নূতন-জ্বরই হউক আর অন্য প্রকারের নূতনজ্বরই হউক, বুঝিতে পার আর না পার, প্রাতে ১টী "স্বল্পলক্ষ্মীবিলাস রস," বৈকালে ১টী "কফচিন্তামণি" ও রাত্রে আর একটী "স্বল্পলক্ষ্মীবিলাস রস" শুধু মধুর সহিত বা পানের রস ও মধু সহ দিলে, রসের পরিপাক হইয়া জ্বরের লাঘব করে এবং বসন্তের জ্বরেও ইহাতে অপকার করে না।

বসন্ত বাহির হইলে কি করিবে ?

——————§*§——————

বসন্ত চিকিৎসকেরা, প্রায়শঃ প্রথম বারের জ্বরের চিকিৎসা করিতে সুযোগ পান না। কারণ, জ্বর হইলে প্রথম ২।৪ দিন হয় রোগী ঔষধ খায় না অথবা ডাক্তার কবিরাজ ডাকিয়া থাকে। তবে, নিজের বাড়ীর রোগী হইলে ভিন্ন কথা। যাহাহউক, বসন্ত বাহির হইলে, রোগীকে পরিষ্কার শয্যায় শয়ান করাইয়া দিবে। ঐ শয্যায় নিমের কচি পাতা, ডাঁটা ফেলিয়া ছড়াইয়া দিবে। এইরূপ শয্যায় রোগী বিশেষ আরাম বোধ করে। নিশিন্দা বা নিমপাতা সহ উহাদের ডাল (শাঁখা) কাটিয়া আনিয়া তদ্দ্বারা আস্তে আস্তে রোগীকে বাতাস করিতে থাকিবে। এই সময় রোগীর খুব জ্বালাপোড়া হইয়া থাকে। জয়ন্তী ফুলের পাতা অথবা সিদ্ধিপাতা (ভাঙ্গের পাতা) চূর্ণ করিয়া পুরু ও পরিষ্কার কাপড়ে বেশ করিয়া ছাঁকিয়া সেই চূর্ণ বসন্তের উপর বার বার ছড়াইয়া দিয়া, করতল দ্বারা বসন্তের উপর আস্তে আস্তে পুনঃ পুনঃ মার্জ্জনা করিবে। পরে রোগীকে পুরু ও

পরিষ্কার কাপড়ে আচ্ছাদিত করিয়া (ঢাকিয়া) নির্ব্বাত স্থানে রাখিয়া দিবে। যিনি শুশ্রূষা করিবেন, তাঁহাকেই এই সব করিতে হয়। তবে, কোন কোন স্থলে শুশ্রূষাকারী, করতল দ্বারা চূর্ণাদি মাজিয়া দিতে আশঙ্কা বা ঘৃণা বোধ করেন। এইরূপ ঘটিলে, পরিষ্কার পাতলা নেকড়াতে ঐ চূর্ণাদি রাখিয়া পুটুলীর মত করিয়া ঐ পুটুলী আস্তে আস্তে রোগীর সর্ব্বাঙ্গে বুলাইবে। ইহাতে নেকড়ার ছিদ্র দিয়া চূর্ণাদি রোগীর সর্ব্বাঙ্গে বিস্তৃত হইবে। কেহ কেহ, এই স্থলে সিদ্ধিপত্রাদির চূর্ণের পরিবর্ত্তে শুধু হরিদ্রাচূর্ণ ব্যবহার করেন। ইহাদের মধ্যে সকল দ্রব্যেই সমান ফল হয়, তবে হরিদ্রাচূর্ণ সহজে পাওয়া যায়। বসন্তের গুটিকার উপর করতল দ্বারা চূর্ণাদি মার্জ্জনা করিবার সময় অথবা বসন্তের উপরি পুটুলী বুলাইবার সময়, এরূপ ভাবে সতর্ক থাকিবে যেন গুটিকাগুলির মাথা ছিঁড়িয়া না যায়। ইহাতে অতি আশ্চর্য্যরূপে শরীরের জ্বালাপোড়ার নিবৃত্তি হয়। এই সঙ্গে প্রতিদিন প্রাতে খদিরাষ্টক পাচন বা নিম্বাদি পাচন যথারীতি তৈয়ার করিয়া প্রাতে সেবন করাইবে এবং বৈকালে ঐ পাচনের ছিব্ড়া (প্রাতের সিদ্ধকরা বকালগুলি) একপোয়া জলে সিদ্ধ করিয়া ৵০ এক ছটাক থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া পান করিতে দিবে। যতদিন জ্বর থাকিবে, ততদিন এই নিয়মে পাচন সেবন করাইবে। বসন্তের গুটিকার উদ্‌গমের অবস্থা হইতে পূয়াদি নির্গত হওয়ার অবস্থা পর্য্যন্ত এই পাচন ব্যবহার করা যায়। ইহাতে জ্বর ও বসন্তের প্রকোপ নষ্ট হয়। এই হরিদ্রা চূর্ণ প্রভৃতি ঐরূপ ভাবে শরীরের উপর ছড়াইয়া দেওয়াকে "অবচূর্ণন" বলে। খদিরাষ্টক পাচন আঠা আঠা এবং নিতান্ত তিক্তাস্বাদ, বিশেষতঃ গিলিতে গলায় জড়াইয়া ধরে বলিয়া অনেকে, বিশেষতঃ কোমলাঙ্গিনী স্ত্রীলোক ও বালকে, খাইতে কষ্ট বোধ করে। তবে, নিম্বাদি পাচনও কম তিক্ত নয়। যাহাহউক, উহার কোন একটি পাচন দিলেই হইল। গর্ভিণীকে পাচন দেওয়ার সময় সর্ব্বদা মনে রাখিবে যেন

হরিতকী, কটকী প্রভৃতি পাচনে থাকিলে উহা বাদ দেওয়া হয়। বাদ দিয়া কিরূপভাবে অবশিষ্ট দ্রব্য ওজন করিতে হইবে, তাহা পরিশিষ্টে পাইবে। সমস্ত বই আগাগোড়া ১০।১২ বার ভালরূপ না পড়িয়া ও উহার মর্ম্ম ভালরূপে অবগত না হইয়া ঔষধ দিতে যাইও না। চিকিৎসাকরা অলস ব্যক্তির কর্ম্ম নয়।

প্রলেপ ও ছোব্ দেওয়া।

ঔষধাদি দ্রব্য বাটীয়া গায়ে লাগাইবার নাম প্রলেপ। দ্রব্যগুলি সমান ভাগে লইয়া বাটীয়া প্রলেপ দিতে হয়। বাসি প্রলেপ অর্থাৎ আগের দিনের প্রস্তুত প্রলেপ, পরের দিন ব্যবহার করিবে না। প্রলেপ দেওয়ার পর, শরীর হইতে যদি প্রলেপ পড়িয়া যায়, তাহা উঠাইয়া গায়ে লাগাইবে না। প্রলেপ দিবাভাগে দিতে হয়। রাত্রিতে প্রলেপ দেওয়া নিষেধ। রোমকূপের প্রতিলোমে অর্থাৎ নীচ হইতে উর্দ্ধদিকে, ধীরহস্তে প্রলেপ দিতে হয়। বসন্তের প্রলেপ মাত্রেই প্রকুপিত রক্ত ও পিত্তেরপ্রশমন করে বলিয়া এক দোষের প্রলেপ অন্য দোষেও ব্যবহার করা যায়। বসন্তের জন্য নানাবিধ প্রলেপের ব্যবস্থা আছে। আজকাল প্রলেপ প্রায় দেওয়া হয় না ও তৎপরিবর্ত্তে ছোব্ দেওয়া হয়।

অবচূর্ণন দ্বারা যদি গায়ের জ্বালাপোড়া না কমে, তবে সপ্তধৌতমাখম (মাখম ৭ বার জলে ধুইয়া), নিমপাতার রস, গন্ধভাদালিয়ার [গান্ধাইলের] পাতার রস, কাঁচা হরিদ্রার রস, সমান ভাগে পাথরের কি কাঁচের বাটীতে লইয়া, বেশ করিয়া মিশাইয়া, সমস্ত গায়ে ৩।৪ বার করিয়া ছোব্ দিবে। ছোট ছোট বসন্তও পরিণামে ফাঁটিবার সম্ভব। এই ছোবে শরীরের জ্বালাপোড়া নষ্ট হয় ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বসন্ত পরিপুষ্ট হইয়া উদ্গত হয়। কাঁচা হরিদ্রার রস, মাখম ইত্যাদি নেকড়ার পুটুলীর

ভিতব লইয়া গায়ের উপব থুপ্ থুপ্ করিয়া দেওয়ার [সংলগ্ন করার] নাম "ছোব্ দেওয়া"।

বসন্ত লাট খাইয়া যাওয়া।

——§*§——

বসন্তের গুটিকা ২।১টী উঠিয়া আর না উঠিলে বা উঠিবার পর লয় পাইয়া গেলে [১] নিম্বাদি পাচন দুইবেলা পূর্ব্ববৎ পান করাইবে। অর্থাৎ ২ তোলা পাচনেব দ্রব্য প্রাতে ৵॥ আধসের জলে জ্বাল দিয়া আধ-পোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া পান করাইবে। আর, বৈকালে ছিব্‌ড়াগুলি ৵। একপোয়া জলে সিদ্ধ করিয়া ৴০ ছটাক থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া পান করিতে দিবে। [২] রক্তকাঞ্চনের ছাল ২ তোলা, জল ৵॥ আধসের, পাকশেষ আধপোয়া লইয়া, তৎসহ শোধিত স্বর্ণমাক্ষিক-চূর্ণ ৩।৪ রতি পান করাইবে। [৩] শালকাষ্ঠ চন্দনের ন্যায় ঘষিয়া ঐ ঘষা [ক্বাথ], তেলাকুচার পাতা ও ডাঁটার রস, কাঁচাহরিদ্রার রস, এই তিন দ্রব্য সমানভাগে লইয়া একত্র মিশ্রিত করিয়া সর্ব্বাঙ্গে পূর্ব্ববৎ ছোব্ দিবে অথবা ঐ মিশ্ররস প্রলেপের মত করিয়া গায়ে দিবে। [৪] একটী লাউ, খড় দ্বারা [কোন কোন স্থানে খড়্‌কে খেড়্ বলে, উহা ধানের শুষ্ক গাছ মাত্র] অর্দ্ধদগ্ধ করিয়া অর্থাৎ আধপোড়া গোছের করিয়া উহাব ভিতবের রস সর্ব্বাঙ্গে লেপিয়া দিবে। এই সকল উপায়ে বসন্ত শীঘ্র শীঘ্র উঠে।

মন্তব্য—কিন্তু এই সকলগুলি উপায় কোন এক রোগীতে এক সময়ে ব্যবস্থা করিবে না। যেটী যেখানে সহজলভ্য, সেটী সেখানে প্রয়োগ করিতে হয়। সাধারণতঃ, নিম্বাদি পাচন খাওয়াইলে ও সঙ্গে সঙ্গে তেলা-কুচার রস ইত্যাদির ছোব্ দিলেই যথেষ্ট হয়। তবে দরকার হইলে এবং একটীর দ্বারা শীঘ্র ফল না পাইলে তথায় অন্যটী অবশ্যই প্রয়োগ

করিবে। * তবে এখানে তোমাকে সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে তুমি চিকিৎসক, সুতরাং তোমাকে সর্ব্বদা ধীরতা অবলম্বন করিয়া কার্য্য করিতে হইবে। বসন্ত আপনা হইতেই উঠিতেছে দেখিয়াও অনর্থক অধীর হইয়া তাড়াতাড়ি আরাম করিবার জন্য এই সকল অস্বাভাবিক উপায় অবলম্বন করিবে না। করিলে অনিষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। মহামুনি সুশ্রুত বলেন—

"অপ্রাপ্তে বা ক্রিয়াকালে প্রাপ্তেতু ন কৃত ক্রিয়া।
ক্রিয়াহীনে হতিরিক্তেহপি সাধ্যেষপি ন সিদ্ধতি॥"

অর্থাৎ ক্রিয়ার কাল উপস্থিত হইলে যদি ক্রিয়া না করা যায় অথবা ক্রিয়ার কাল উপস্থিত না হইতে হইতেই যদি ক্রিয়া করা যায়, তবে প্রথমোক্তস্থলে ক্রিয়াহীনতা ও শেষোক্তস্থলে অতিরিক্ত ক্রিয়া করার দরুণ, সাধ্য রোগও আরাম করা যায় না। অবশ্য ইহা ব্রণরোগ সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহা যাহাতে খাটাইতে চাও তাহাতেই খাটে। অতিরিক্ত শৈত্য ক্রিয়াতে শোথাদি আসিতে পারে। তবে, পাচনটী সেবন করাইবার বাঁধা নাই। আর, এখানে চিকিৎসা সম্বন্ধে একটী অত্যাবশ্যকীয় কথা বলিয়া রাখি যে, কোন রোগের যদি তোমার ২।৩টী ঔষধ জানা থাকে, আর সেই সকল ঔষধ একত্র দিবার যদি কোন বাধা না থাকে, তবে, ঐ রোগে একটী ঔষধ দ্বারা যেরূপ ফল পাওয়া

---

* "ক্রিয়ায়াস্তু গুণালাভে ক্রিয়ামন্যাং প্রযোজয়েৎ।
পূর্ব্বস্যাং শান্তবেগায়াং ন ক্রিয়াসঙ্করোহিতঃ॥"

চক্রদত্তঃ।

ইহার অর্থ এই যে, কোন ক্রিয়া দ্বারা ফল না পাইলে অন্য ক্রিয়া অবলম্বন করিবে। কিন্তু, পূর্ব্বক্রিয়ার বেগ শান্ত হইলেই নূতনক্রিয়া আরম্ভ করা উচিত; নতুবা ক্রিয়া-সঙ্কর উপস্থিত হয়। অবশ্য ইহা খাওয়াইবার ঔষধ সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে, কিন্তু এই নিয়ম বাহ্য প্রলেপাদিতেও খাটে।

খায়, ঐ ২।৩টী ঔষধ একত্র দিলে তাহা হইতে অধিকতর ফল পাওয়া যায়। কি খাওয়ার ঔষধ, কি প্রলেপাদির ঔষধ, সকল স্থলেই এই নিয়ম খাটে। তবে, উহার বিচার করা একটু পাণ্ডিত্যের দরকার বটে। কাহারও কাহারও বসন্ত বসিয়া গিয়া শরীর বাঙ্গিফাঁটা হইয়া যায় অর্থাৎ "ফাঁটিয়া যায় ফুঁটীর প্রায়" ফাঁটিয়া যাইয়া তন্মধ্য হইতে ক্লেদ নির্গত হইতে থাকে। ঐ সঙ্গে অসহ্য যন্ত্রণা ও মোহ হইতে পারে। এই অবস্থায় হরিদ্রা, মটরের ডাল, তেলাকুচার পাতা ও ডাঁটা সমান ভাগে লইয়া বেশ করিয়া বাটীয়া, গায়ে প্রলেপের মত করিয়া দিবে। ইহাতে সত্বর বসন্ত উঠে।

উদ্‌গত বসন্ত পরিপুষ্ট ও পরিপক্ক করা এবং অনুদ্‌গত বসন্ত উঠাইবার উপায়।

কেহ কেহ উপরোক্ত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিম্নলিখিত ঔষধ নিম্নলিখিত প্রণালীতে ব্যবহার করেন যথা—

প্রথম দিনে, তেলাকুচা পাতার ও ডাঁটার রস, নিমপাতার রস, কাঁচা-হরিদ্রার রস, এই তিন প্রকার রস সমান ভাগে লইয়া ও বেশ করিয়া মিশ্রিত করিয়া রোগীর গায়ে দিনে, ২ বার ছোব্ দেন। দ্বিতীয় দিনে, তেলাকুচা পাতার ও ডাঁটার রস, আম্বলী পাতার (আমরুল শাকের রস) ও ডাঁটার রস, কাঁচা হরিদ্রার রস, এই তিন প্রকারের রস সমান ভাগে বেশ করিয়া মিশাইয়া, ২ বার ছোব্ দেন। তৃতীয় দিনে, আমরুল শাকের ডাঁটার ও পাতার রস, নিমপাতার রস, কাঁচা হরিদ্রার রস, পুঁই শাকের পাতার রস, তেলাকুচার পাতার ও ডাঁটার রস সমান ভাগে মিশাইয়া সর্ব্বশরীরে, ২ বার ছোব্ দেন বা প্রলেপের মত করিয়া দেন। আবার,

কাহারও কাহারও মতে, ইহাদের যে কোন একটীর ছোব্ ৪।৫ দিন দিলেই জ্বালাপোড়াদি নষ্ট হয়, বসন্ত গুটিকা পরিপুষ্ট হয় ও পাকিয়া যায় এবং যে সকল বসন্ত ভাল করিয়া উঠে নাই তাহারাও উঠিয়া পরিপুষ্ট হয়। কেহ কেহ পরিপুষ্ট বসন্তকে পাকাইবার জন্য, প্রথমে শুধু জলের ছোব্ (পরিষ্কার নেকড়া জলে ভিজাইয়া বসন্তের উপর থুপ্ থুপ্ করিয়া জল-সংলগ্ন করার নাম ছোব্ দেওয়া), তৎপর দিন, শুষ্ক নাল্‌তেপাতা (পাটপাতা) ভিজান জলের ছোব্, তৎপর দিন কাঁচা হরিদ্রার রস, মাখম, তেলাকুচার পাতার ও ডাঁটার রস, নিমপাতার রস এই চারি প্রকার দ্রব্য সমান ভাগে লইয়া বেশ করিয়া মিশাইয়া ছোব্ দেন, ইহাতে গুটিকা শীঘ্র শীঘ্র পাকে।

আবার কেহ কেহ বলেন, কাঁচা হরিদ্রার রস, নিমপাতার রস, তেলা-কুচার পাতা ও ডাঁটার রস, কুলপাতার রস, দাড়িম ফলের রস, ছাঁচি কুমড়ার জল, শতমূলীর রস, চুকাপালং শাকের রস, ভূই কুমড়ার রস, অল্প সৈন্ধব লবণ, কচি আম পাতার রস, মাখম, ডাবের জল ও শ্বেত চন্দন এই সমস্তের যত প্রকার জিনিষ মিলাইতে পারা যায়, সেই সমস্ত মিলাইয়া অপক্ক বসন্তের উপরি ছোব্ দিলেই গুটিকার ভিতর পূয়াদি হইয়া পাকিয়া উঠে।

কেহ কেহ খড় দ্বারা ঝাটার মত তৈয়ার করিয়া, ঐ ঐ রসে উক্ত ঝাটা ডুবাইয়া তদ্দারা রস ঝাড়িয়া ঝাড়িয়া রোগীর গায়ে ছোব্ দিয়া থাকেন। *

প্রলেপ বা ছোব্ দিতে হইলে, দিনে ১ টার সময় ১ বার ও এই প্রলেপ শুষ্ক হইলে (আন্দাজ ২ ঘণ্টা পরে) আর একবার ছোব্ দিবে। প্রলেপ বা ছোব্ রাত্রে দেওয়া নিষেধ।

মন্তব্য—পূর্ব্বেই অনেকবার বলিয়াছি যে, রক্ত ও পিত্তের প্রকোপ ভিন্ন

* বিবিদের মুখে পাউডার দিবার জন্য আজ কাল একপ্রকার অতি নরম রকমের ব্রাস (ব্রুস) বাহির হইয়াছে। উহাদ্বারা ছোব দেওয়াও মন্দ নহে।

বসন্তরোগ হয় না, আর, বসন্তজ্বর স্ফোটকজ্বর মাত্র। অর্থাৎ বসন্ত ও বিস্ফোটকাদি এক জাতীয় পীড়া। বিস্ফোটকাদি শরীরে ২।৪।১০টা হয়, আর বসন্ত রোগে ঐরূপ ফোঁড়া অসংখ্য হয়। বিস্ফোটকাদিতে ২।৪।১০টা ফোঁড়ার যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় এবং উহাদের টারসে যে জ্বর হয় তাহা সহ্য করিতে হয়, আর বসন্ত রোগে ঐরূপ অসংখ্য ফোঁড়ার যন্ত্রণা ও জ্বরাদি ভোগ করিতে হয়। শাস্ত্রে আছে—

"অগ্নিদগ্ধাইব স্ফোটাঃ সজ্বরা রক্তপিত্তজাঃ।
ক্বচিৎ সর্ব্বত্র বা দেহে বিস্ফোটা ইতি তে স্মৃতাঃ॥"

নিদানম্।

তথাচ—

"যদা রক্তঞ্চ পিত্তঞ্চ বাতেনানুগতং ত্বচি।
অগ্নিদগ্ধনিভান্ স্ফোটান্ কুরুতঃ সর্ব্বদেহগান্॥"

ভাবপ্রকাশ।

অর্থাৎ যে রোগে রক্ত ও পিত্তের প্রকোপজনিত পিড়কা, জ্বরের সহিত, শরীরের কোন স্থানে বা সমস্ত দেহে অগ্নি দগ্ধ জন্য স্ফোটকের ন্যায় হইয়া উৎপন্ন হয়, তাহার নাম বিস্ফোট। সকল প্রকারের শূল রোগেই (শূল বেদনা) যেমন বায়ুর প্রাধান্য থাকে, সকল প্রকার বিস্ফোটেই তেমন রক্ত ও পিত্তের প্রাধান্য থাকে। যৎকালে বায়ুর সহিত রক্ত ও পিত্ত কুপিত হইয়া ত্বক্‌গত হয়, তখন সমস্ত দেহে অগ্নিদগ্ধের ন্যায় স্ফোটক উৎপন্ন করে। রক্ত ও পিত্তের ধর্ম্ম এক। পিত্ত না থাকিলে শরীর গরম থাকিত না, ঠাণ্ডা হইয়া যাইত। শাস্ত্রে আছে—

"উষ্মা পিত্তাদৃতে নাস্তি, জ্বরনাস্ত্যুষ্মণা বিনা।"

অর্থাৎ পিত্ত ভিন্ন গরমত্ব নাই এবং গরমত্ব ভিন্ন জ্বর নাই। অমুক লোকের জ্বর হইয়াছে বলিলে বুঝিবে যে উহার শরীর গরম হইয়াছে, শরীর গরম হইয়াছে বলিলে বুঝিবে যে উহাব পিত্ত বৃদ্ধি হইয়াছে।

পিত্তও যেমন শরীরের তাপ রক্ষা করে, রক্তও সেইরূপ শরীরের গরমত্ব বজায় রাখে। শরীর গরম না থাকিলে মানুষ বাঁচিতে পারে না। আবার, কেহ কেহ বলেন যে রক্ত নিজে উষ্ণ নহে, উহা পিত্তের বলেই গরম হইয়া থাকে। যাহাহউক, এই যে বসন্তের স্ফোটকাদিতে না পাকা পর্য্যন্ত জ্বালা পোড়াদি হয়, ইহা বৈগুণ্য প্রাপ্ত রক্ত ও পিত্তের প্রকোপের লক্ষণ। জ্বরাদিও ঐ কারণেই হইয়া থাকে। বসন্ত রোগে প্রথমতঃ রক্ত ও পিত্ত বৈগুণ্য প্রাপ্ত হয় অথবা বৈগুণ্য প্রাপ্ত পিত্ত রক্তকে দূষিত করিয়া থাকে। পরে দূষিত রক্ত ও পিত্ত বায়ু দ্বারা চালিত হইয়া ত্বক্ দেশে সঞ্চিত হইয়া পিড়কারূপে আবির্ভূত হয়। তখন জ্বালা পোড়াদি প্রদাহের লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই মাত্র বলিলাম রক্ত ও পিত্তের ধর্ম্ম এক। কাজেই, ঐ সকল ঠাণ্ডা প্রলেপ ও ছোব্ প্রভৃতি দ্বারা রক্ত ও পিত্তের প্রকোপ শান্ত হয় এবং তদ্দরুণ জ্বালা পোড়াদি দূর হইয়া বসন্ত গুটিকা-সকল পরিপুষ্ট হইয়া উঠে।

বসন্ত রোগীর জ্বর ত্যাগ করান।

——§*§——

বসন্ত উঠিলে পর প্রায়শঃ জ্বর থাকে না, কিন্তু কোন কোন স্থলে জ্বর লাগা থাকে। বসন্ত রোগীর জ্বর ত্যাগ করিবার জন্য নিম্বাদি বা পটোলাদি বা খদিরাষ্টক পাচনই যথেষ্ট। দরকার হইলে প্রথম বারের জ্বরের জন্য (Primary Fever এর জন্য) মৃত্যুঞ্জয় রস প্রভৃতি ও পাকিবার অবস্থায় দ্বিতীয়বার যে জ্বর হয় (Secondary Fever এ), তাহার প্রশমনের জন্য কস্তূরীভৈরবাদি প্রয়োগ করিতে পার। তুলসী পাতা, পান বা আদার রসের সহিত প্রয়োগ করা যায়। এখানে একটী কথা বলিয়া রাখি যে, কবিরাজী বটিকাদির সহিত আদার রস ও মধু প্রভৃতি

যাহা যাহা মিশাইয়া খাওয়াইবার বিধি আছে তাহাদিগকে, উক্ত ঔষধের (বটিকার) সহপান বলে। সহপানের সহিত ঔষধ সেবন করার পর যাহা খাওয়া যায়, তাহাকে অনুপান কহে। অনুপান অর্থ পশ্চাৎ পান করা। অনু অর্থ পশ্চাৎ। যেমন, মধুর সহিত বটিকা মাড়িয়া খাইবার পর যদি দুগ্ধ পান করিবার বিধি থাকে, তবে মধুকে উক্ত বটিকার সহপান ও দুগ্ধকে অনুপান বলা যায়। আজ কাল সহপানকেই লোকে অনুপান বলিয়া থাকে।

মন্তব্য—সকল প্রকার রোগই নূতন ও পুরাতন ভেদে দুই প্রকারে চিকিৎসা করিতে হয়। নূতন রোগে রক্তের প্রকোপ থাকে, শরীরে বল থাকে, সুতরাং তাহার ঔষধ ও পথ্যাদিও সেইরূপ ব্যবস্থা করিতে হয়। রোগ পুরাতন হইলে শরীর নীরক্ত হইয়া দুর্ব্বল হয়, সুতরাং তাহার ঔষধ পথ্যাদিও এরূপ দিতে হয় যে, রোগীর দেহে ক্রমশঃ বলের সঞ্চার হইতে পারে। রক্তই আমাদের শরীরের বল ও ভরসা। বসন্তের প্রকোপের প্রথম ভাগে সেই রক্তের প্রকোপ থাকে, কিন্তু বলের তাদৃশ ক্ষীণতা হয় না, কারণ তখন পর্য্যন্তও রক্তের অপচয় ঘটে না। কিন্তু, বসন্তগুটিকা পাকিয়া গেলে, শরীরের বলস্বরূপ রক্তের অপচয় ঘটে বলিয়াই শরীর দুর্ব্বল হইয়া যায় এবং সেই জন্যই ঐ সময়ে বলকারক-ঔষধ ও পথ্য ব্যবস্থা করা যায়। শাস্ত্রে আছে—

"বলাধিষ্ঠান মারোগ্যং যদর্থোঽয়ং ক্রিয়াক্রমঃ।"

আরোগ্যের ভিত্তিই বল। রোগ সেই বলের নাশ করিয়া শরীর ধ্বংস করিয়া থাকে। চিকিৎসার উদ্দেশ্যই হচ্ছে, শরীরে সেই বলের সঞ্চার করিয়া দেওয়া। আর, "বলং হ্যলং নিগ্রহায় দোষাণাং" শরীরে বল সঞ্চার হইলে দোষেরও দমন হয়। সুতরাং রোগের পরিণামে সর্ব্বদা রোগীর বল রক্ষার জন্য চেষ্টা করিবে। এই জন্যই বলকারক ঔষধ ও পথ্য প্রয়োগ করার এত দরকার। তাই বলিয়া সকল রোগীর পক্ষেই

সকল প্রকার বলকারক দ্রব্য প্রযুজ্য নহে। রোগীর ও রোগের অবস্থাদি বিবেচনা করিয়া যাঁহার পক্ষে যে বলকারক ঔষধ বা পথ্য উপযুক্ত বোধ করিবে তাঁহাকে তাহাই প্রদান করিবে। যেমন লুচি, কচুরী প্রভৃতিও বলকারক, আর, দুগ্ধ সাগু প্রভৃতিও বলকারক। মাংসের যূষ ও মাংস প্রভৃতিও বলকারক; কাঁচা মুগ ও মসূরের যূষও বলকারক ইত্যাদি। আহার মাত্রই বলকারক। স্থল বিশেষে সামান্য একটু জল পানেও প্রভূত বলের সঞ্চার হইয়া থাকে। যে রোগীর পাতলা দাস্ত, আমাশয়, রক্তামাশয় প্রভৃতি আসিয়া জুটিয়াছে, তাহাকে লুচি, কচুরী প্রভৃতি গুরুপাক দ্রব্য দিবে না। দিলে ঐ সমস্ত উপসর্গ বৃদ্ধি পাইবে এবং হয়ত রোগী ঐ কারণেই মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। যে বসন্ত রোগীর কোষ্ঠকাঠিন্য আছে, তাহাকে কাঁচামুগের যূষ খাইতে দাও, উহা তাহার আহার ও ঔষধ দুয়েরই কাজ করিবে। কাঁচামুগের যূষ কোষ্ঠ কাঠিন্যও দূর করে। পাতলা দাস্ত থাকিলে মসূরের যূষ পাতলা করিয়া দিবে। মসূরের যূষ মাংসের কাথের ন্যায় বলকারক ও ধারক। ইহাতে রোগীর পাতলা দাস্তাদিও দূর হইবে এবং শরীরে প্রভূত বলের সঞ্চার হইবে। দাস্ত বন্ধ থাকিলেই প্রায়শঃ পেট ফাঁপার বৃদ্ধি হয়। বাহ্য প্রস্রাবাদি সরল থাকিলে প্রায়শঃ পেট ফাঁপা থাকে না বা কমিয়া যায়। কিন্তু, যে রোগীর অনবরত পাতলা দাস্ত হইতেছে অথচ পেট ফাঁপা কমিতেছে না, বরং বৃদ্ধি পাইতেছে, সেই স্থলে কি বুঝিবে? বুঝিবে যে, পাকস্থলী এত দুর্ব্বল হইয়াছে যে, সাগু, বার্লি যাহাই কেন দেওনা, কিছুই হজম করিবার শক্তি পাকস্থলীর নাই। সমস্ত আহারই পাকস্থলীতে গিয়া পরিপাক না হইয়া উৎপাচিত হইয়া (Fermented হইয়া) একপ্রকার গ্যাস বা বায়ুর সৃষ্টি করিতেছে এবং তাহাতেই রোগীর পেট ফাঁপার বৃদ্ধি করিতেছে। কোন নিমন্ত্রণ বাড়ীর পথের ধারে স্তূপীকৃত উচ্ছিষ্ট খাদ্যাদি পরের দিনে পচিয়া দুর্গন্ধ বিস্তার করে, বোধ হয় ইহা লক্ষ্য করিয়া

থাকিবে। ঐ উচ্ছিষ্ট খাদ্য পচিয়া একপ্রকার দূষিত গ্যাসের বা বাষ্পের সৃষ্টি করে এবং সেই গ্যাস বা বাষ্প, বায়ুদ্বারা চারিদিকে সঞ্চারিত হইয়া দুর্গন্ধ বিস্তার করে। পাকস্থলীতে খাদ্যাদি সম্যক্ পরিপাক পাইলে তাহা হইতে রস রক্তাদির সৃষ্টি হইয়া শরীরের পোষণ কার্য্যে ব্যয়িত হয় ও তদ্দ্বারা শরীরের বলাধান হয়। খাদ্য পরিপাক না পাইলে পাকস্থলীর ভিতরেও সেইরূপ গ্যাসের (দূষিত বাষ্পের) সৃষ্টি হয়। মুখ দিয়া যে চুঁয়াঢেকুর উঠে, তাহাই সেই গ্যাসের সৃষ্টির পরিচায়ক। আমরা যাহা আহার করি তাহা যে কেবল আমাদের আমাশয়েই (পাকস্থলীতেই) *

---

* পরিপাক যন্ত্রের বিবরণ--পরিপাক যন্ত্র বরাবর মুখ হইতে গুহ্যদ্বার পর্য্যন্ত বিস্তৃত। জিহ্বার পশ্চাতে গলার ছিদ্র দেখা যায়। এই গলার ছিদ্রই অন্ননালীর মুখ। অন্ননালীর মুখ হইতে গুহ্যদ্বার পর্য্যন্ত সমস্তটা, একটা মাংসের নল মাত্র। উহার এক মুখ উপরে; উহাই গলার ছিদ্র। অন্য মুখ নীচে; উহাই গুহ্যদ্বার। এই নলের কোন অংশ মোটা, কোন অংশ সরু, কোন অংশ ভিস্তির যন্ত্রের ন্যায় আকার বিশিষ্ট। গলার ছিদ্রদ্বারা আহার গলাধঃকরণ হয়। গলায় দুইটী ছিদ্র আছে, একটী শ্বাসনলী ও অন্যটী আহার নামিয়া যাইবার পথ। শ্বাসনলীর ছিদ্রটী সম্মুখদিকে অর্থাৎ জিহ্বা-মূলের নিম্নেই শ্বাসনলীর মুখ। আর, আহারের ছিদ্র তাহার পশ্চাদ্দিকে অর্থাৎ আগে শ্বাসনলীর মুখ ও তাহার তলদেশে অন্ননালীর মুখ। শ্বাসনলীর ডাক্তারি নাম ট্রকিয়া (Trachia). এই শ্বাসনলীরই উর্দ্ধাংশের নাম স্বরনালী। স্বরনালীর ডাক্তারি নাম ল্যারিংস্ (Larinx). তবেই, অন্ন শ্বাসনলীর মুখ পার হইয়া গিয়া অন্ন নালীর মুখে পড়ে এবং পাছে অন্ন শ্বাস নালীর মুখে পড়িয়া শ্বাস বন্ধ করিয়া কোন বিপদ্ আনয়ন করে, এই জন্য জিহ্বামূলে একটী মাংসের পরদার ঢাক্নী আছে। অন্ন ঐ পথে যাইবার সময় উক্ত ঢাক্নি শ্বাসনলীর মুখে চাপা পড়ে। কাজেই, অন্ন শ্বাসনলীর ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না। সংস্কৃতে এই ঢাক্নীর নাম উপজিহ্বা, ডাক্তারি নাম এপি-গ্লটিস (Epi-Glotis). গলায় টাক্ড়ার শেষে আল্জিব্ ঝুলিতেছে। আল্জিবের সংস্কৃত নাম গলশুণ্ড ও ডাক্তারি নাম উভুলা (Uvula). আল্জিবের নিকট হইতে একটী গর্ত্ত উঠিয়া নাসাপথে শেষ হইয়াছে। এই পথ দিয়াই নাসিকা দ্বারা শ্বাস প্রশ্বাস কার্য্য

পরিপাক পায় তাহা নহে। ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অন্ত্রও (পেটের নাড়ী ভুঁড়ি) পরিপাক যন্ত্র বটে। খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে আমাদের শরীরের পোষণোপযোগী যতটুকু সার পদার্থ পাওয়া যায়, তাহা সংগ্রহ করিবার জন্য, ঈশ্বরের অপূর্ব্ব কৌশলে মুখ হইতে গুহ্যদ্বার পর্য্যন্ত দ্রব্যাদির পরিপাক হইয়া থাকে।

নির্ব্বাহ হয়। আমরা খাদ্যদ্রব্য প্রথমতঃ দাঁত দ্বারা পিষ্টকরি, এই সময়ে পিষ্টদ্রব্যাদি আমাদের মুখের লালার সহিত মিশ্রিত হয়। এই লালাও এক প্রকার পাচক রস বিশেষ। খাদ্যদ্রব্য পিষ্ট ও লালার সহিত মিশ্রিত হইয়া অন্ন নালীর ভিতর দিয়া পাকস্থলীর ভিতরে পড়ে। এই পাকস্থলী আর কিছুই নহে—অন্ননালীর মুখ (খাবার ছিদ্র) বরাবর একটা মোটা মাংসের নল হইয়া নীচের দিকে নামিয়া গিয়া বুকের কড়ার কাছে গিয়া ভিস্তির যন্ত্রের ন্যায় (মোশকের ন্যায়) একটা মোটা যন্ত্র হইয়াছে। এই ভিস্তির যন্ত্রের ন্যায় (মোশকের ন্যায়) যন্ত্রেরই নাম পাকস্থলী। ইহা প্রায় ১২ ইঞ্চ লম্বা ও ৪ ইঞ্চ চওড়া। পাকস্থলীর অন্য নাম আমাশয়। এই পাকস্থলীতে খাদ্যদ্রব্যের অধিকাংশই আম অর্থাৎ অপক্কাবস্থায় থাকে বলিয়া ইহার নাম আমাশয়। ডাক্তারি নাম Stomach. ৺ ডাক্তার হেমচন্দ্র সেন এম্, ডি, বলেন যে, পক্কাশয়ের অনেকস্থলে অন্নের পরিপাক হইয়া থাকে বলিয়া ক্ষুদ্রান্ত্রের নাম পক্কাশয়। আমাশয়ের ইংরেজী নাম Stomach ও পক্কাশয়ের ইংরেজী নাম Small Intestine অর্থাৎ ক্ষুদ্রঅন্ত্র। বাস্তবিক, ক্ষুদ্র অন্ত্রকে পাকাশয় বলিলে ক্ষতি নাই, কারণ ক্ষুদ্রান্ত্রেও পরিপাক কার্য্য সমাধা হয়। কিন্তু, বিষ্ঠার সংস্কৃত নাম পক্ক। পক্কাশয় বলিলে বিষ্ঠার আশয় বা মলযন্ত্রকে বুঝায়। তবে মলযন্ত্রও অন্ত্রেরই অংশ বটে। যাহাহউক, খাদ্যদ্রব্য আমাশয়ে অর্থাৎ পাকস্থলীতে আসিলে তৎক্ষণাৎ আমাশয়ের গাত্র হইতে এক প্রকার অম্লরস নিঃসৃত হইয়া খাদ্যের সহিত মিশ্রিত হয়। এই রসের সংস্কৃত নাম ক্লেদনশ্লেষ্মা ও ডাক্তারি নাম গ্যাষ্ট্রীক্ যূষ। দিবারাত্রে এই রস পৌনে চারিসের হইতে ৭॥৹ সাড়ে সাতসের পর্য্যন্ত (১০ হইতে ২০ পাইন্ট) নিঃসৃত হয়। ক্লেদনরসের সহিত খাদ্যদ্রব্য মিশ্রিত হইলে পাকস্থলীর আকুঞ্চন ও প্রসারণে উক্ত খাদ্যদ্রব্যাদি বাম হইতে দক্ষিণ দিকে এবং দক্ষিণ হইতে বামদিকে পুনঃ পুনঃ সঞ্চালিত হয়। প্রধানতঃ এই পাচক রসেই খাদ্যদ্রব্য পরিপাক পাইয়া থাকে। পাকস্থলীতে খাদ্য তরলভাব প্রাপ্ত হইয়া গ্রহণী নামক আশয়ে প্রবেশ করে। ক্ষুদ্র অন্ত্রের প্রথম দ্বাদশ অঙ্গুলি পরিমিত অংশের

খাদ্য দ্রব্যাদি আমাশয়ে পচিয়া গ্যাসের সৃষ্টি করিলে চুঁয়াঢেকুর ও পেটফাঁপা দ্বারা তাহার পরিচয় পাওয়া যায়, আর, অন্ত্রের ভিতরে (নাড়ীভুঁড়ির ভিতরে) পচিলে দুর্গন্ধযুক্ত অধোবায়ুর নিঃসরণ ও পেট-ফাঁপার দ্বারা তাহার নির্ণয় করা যায়।

নাম গ্রহণী। এই আশয় আহার্য্য গ্রহণ করে বলিয়া ইহার নাম গ্রহণী। "অগ্ন্যা-ধিষ্ঠানমন্নস্য গ্রহণাৎ গ্রহণীমতা।" চরক। গ্রহণীর ডাক্তারি নাম ডিওডিনম্। এই স্থলে পাচক পিত্ত ও ক্লোম রস নামক আর দুইটী রসের সহিত খাদ্যদ্রব্যের মিলন হয়। এই পাচক পিত্ত পিত্তকোষ হইতে আসে। যকৃত হইতে পিত্ত, পিত্তকোষে পূর্ব্বে সঞ্চিত থাকে। অন্নরসাদি গ্রহণীতে আসিয়া পঁহুছিলে পিত্ত, পিত্তকোষ হইতে আসিয়া গ্রহণীতে নামে। পিত্তকোষের ডাক্তারী নাম গল্‌ব্লাডার। যকৃতের ডাক্তারি নাম লিভার। ক্লেদনরস কতকটা পিত্তের ন্যায় কাজ করে ও কতকটা লালার ন্যায় কাজ করে। ক্ষুদ্র-অন্ত্রে পরিপাকপ্রাপ্ত খাদ্য দুইভাগে বিভক্ত হয়। কতকটা কঠিন মলে পরিণত হয়, আর, কতকটা দুধের ন্যায় সাদা তরল দ্রব্যে পরিণত হয়। এই তরল পদার্থের নাম রস। ডাক্তারি নাম কাইল Chyle. এই রস অতি সূক্ষ্ম রসবাহিনী শিরা সকল দ্বারা, (লিম্ফেটিক ভেসেল দ্বারা) শোষিত হইয়া রক্তের সহিত মিশিয়া শরীরের রস ধাতুর পুষ্টিবিধান করে ও ক্রমে রস হইতে রক্ত, রক্ত হইতে মাংস, মাংস হইতে মেদ, মেদ হইতে অস্থি, অস্থি হইতে মজ্জা ও মজ্জা হইতে শুক্রে পরিণত হইয়া, শরীরের আপ্যায়ন ও পোষণ কার্য্য সম্পন্ন করে। আর, মলভাগ শরীর হইতে পরিশেষে বাহির হইয়া যায়।

তবেই দেখ, গলার ছিদ্র হইতে গুহ্যদ্বার পর্য্যন্ত একটী মাংসের নল মাত্র। গলার ছিদ্র হইতে বুকের কড়ার নীচ পর্য্যন্ত ঐ নলের নাম অন্ননালী। অন্ননালী বুকের কড়ার নীচে গিয়া মোটা হইয়া ভিস্তির যন্ত্রের ন্যায় যন্ত্রে পরিণত হইয়াছে। ঐ ভিস্তির যন্ত্রের আকারের ন্যায় যন্ত্রের নাম পাকস্থলী। পাকস্থলীর মোটা দিক্‌টা পেটের বাম ভাগে, আর, সরু মুখটা দক্ষিণ ভাগে আছে। এই মুখ হইতে ক্ষুদ্র অন্ত্র আরম্ভ হই-য়াছে। ক্ষুদ্র অন্ত্র ও বৃহৎ অন্ত্রকে ভাষায় নাড়ীভুঁড়ি বলে। এই অন্ত্রের প্রথম দ্বাদশ অঙ্গুলি বা ৮।১০ ইঞ্চি পরিমিত অংশের নাম গ্রহণী বা অগ্ন্যাধান নাড়ী, ডাক্তারি নাম ডিওডিনম। এই গ্রহণী ও পাকস্থলীর সংযোগ স্থলে একটী ছিদ্র আছে। ঐ ছিদ্রের ডাক্তারি নাম পাইলোরস্। গ্রহণী হইতে ক্ষুদ্র অন্ত্র পেটের মধ্যে জড়াইয়া জড়াইয়া আছে।

যাহাহউক, ঐ অবস্থায় (অনবরত পাতলা দাস্ত ও পেট ফাঁপার বৃদ্ধি থাকিলে) মসূরের জল (পরিশিষ্ট দেখ) তৈয়ার করিয়া বা ছানার জল (পরিশিষ্ট দেখ) তৈয়ার করিয়া তাহাই মাঝে মাঝে দিবে। এই অবস্থায় সাগু, বার্লি, খইএরমণ্ড, এরারুট, দুগ্ধ, কিছুই ভাল পথ্য নয়,

---

ডাক্তারিতে ক্ষুদ্র অন্ত্রের বেশ বিভাগ করা আছে। ক্ষুদ্র অন্ত্রের প্রথম ভাগের নাম ডিও-ডিনম্ (গ্রহণী), দ্বিতীয় অংশের নাম জেজুনম্ ও তৃতীয় অংশের নাম ইলিয়ম্। এই ইলিয়ম্ হইতে বড় অন্ত্র আরম্ভ হইয়াছে। বড় অন্ত্রের প্রথম অংশের ডাক্তারি নাম সিকম্, সংস্কৃতে উণ্ডুক বলে। এই স্থানে বিষ্ঠার সঞ্চয় হয়। দ্বিতীয় অংশের নাম কোলন্। এই কোলনের পর রেক্‌টাম্ বা মলভাণ্ড। এই রেক্‌টাম্, তলপেটের বামদিক দিয়া নামিয়া গুহ্যদ্বারে শেষ হইয়াছে। এই মলভাণ্ডে মল সঞ্চিত থাকে। ছোট অন্ত্র বড় অন্ত্র হইতে ঢের লম্বা, আর, বড অন্ত্র ছোট অন্ত্র হইতে ঢের মোটা। বড় অন্ত্র প্রায় ৪ হাত ও ছোট অন্ত্র প্রায় ১৩ হাত লম্বা। বড় অন্ত্র মোটা বলিয়া ইহার নাম বড় অন্ত্র। সংস্কৃতমতে সমস্ত অন্ত্রের পরিমাণ নিজ হাতের সার্দ্ধত্রিব্যাম।

"ক্ষুদ্র অন্ত্র নাভিস্থলে আরম্ভ হইয়াছে, অনন্তর জড়াইয়া জড়াইয়া নিম্নমুখে কিয়দ্দূর গিয়াছে, পরে ডানিদিকে ঘুরিয়া আসিয়া কুঁচ্‌কীর উর্দ্ধে ও কোঁকের নিম্নে ডানিদিকের তলপেটের সীমায় শেষ হইয়াছে। এই স্থানে স্থূলান্ত্র আরম্ভ হইয়াছে। স্থূলান্ত্র ও ক্ষুদ্রান্ত্রের সঙ্গমস্থলে একটী কবাট আছে।, ক্ষুদ্রান্ত্রের ভিতর হইতে এই কবাট ঠেলিয়া স্থূলান্ত্রের ভিতরে ঢুকিবার বাধা নাই, কিন্তু স্থূলান্ত্রের দ্রব্য এই কবাট ঠেলিয়া ক্ষুদ্রান্ত্রের ভিতরে ঢুকিতে পারেনা। এই কবাটের ডাক্তারি নাম ইলিওসিকাল্ ভাল্‌ব। এই কবাটের পরই স্থূলান্ত্রের প্রথম অংশ। উক্ত প্রথম অংশের সংস্কৃত নাম উণ্ডুক এবং ডাক্তারি নাম সিকম্ (Secum). ডাক্তারেরা বলেন যে, এখানেও পাকক্রিয়া সম্পূর্ণ হয় না। তাহাদের মতে বিষ্ঠারও পাক আছে। সমস্ত স্থূলান্ত্র পরিভ্রমণ না করিলে পাক সম্পূর্ণ হয় না। যাহাহউক, ইহার পর স্থূলান্ত্র দক্ষিণ পঞ্জর সমূহের প্রান্ত দিয়া এবং উহাদের দক্ষিণ সীমা পরিভ্রমণ করিয়া, উর্দ্ধমুখে যকৃৎ পর্য্যন্ত গিয়াছে। পরে যকৃৎকে বেষ্টন করিয়া পাকস্থলীর তলা দিয়া গিয়াছে। স্থূলান্ত্র এই এই স্থান পার হইয়া বক্ষের নিম্ন দিয়া বরাবর বাম মুখে প্লীহা পর্য্যন্ত গিয়াছে। পরে নিম্নমুখে, উদরের বাম সীমা পরিভ্রমণ পূর্ব্বক, গুহ্যদ্বারে শেষ হইয়াছে। এইরূপে পক্বাশয় সমস্ত উদরকে প্রদক্ষিণ

ইহা নিশ্চিত জানিবে। পাকস্থলী দুর্ব্বল বলিয়া অধিক আহার বা গুরু-পাক আহার পরিপাক করিতে পারে না, সুতরাং লঘু অথচ পুষ্টিকর আহার, মাত্রায় কম ও বারে অধিক দিতে হয়। এই স্থলে মসুরের জল ২।৪ ঝিনুক করিয়া ১০।১৫ মিনিট অন্তর অন্তর দিবে। আমরা একবার একটী নিতান্ত শিশুকে শুধু এইরূপ পথ্যের তারতম্য করিয়া, আসন্ন-মৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়া ছিলাম। মেয়েটী এখনও জীবিত আছে। ৪ মাস বয়সের সময় আমরা দেখিয়াছিলাম, এখন তাহার বয়স ৫ বৎসর। এই ক্ষুদ্র পুস্তকে পথ্যাদির বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া অসম্ভব, সামান্য আভাস মাত্র দেওয়া গেল। বসন্ত চিকিৎসার ধারাণে আয়ুর্ব্বেদীয় সমস্ত রোগের চিকিৎসাই লিখিত হইতেছে। আশা আছে, উহা শীঘ্রই বাহির করিব এবং উহাতে সকল রোগের পথ্যাদির প্রয়োগ কৌশলও সবিস্তারে বর্ণন করিব।

পাদ-দাহ (পায়ের জ্বালা)।

——§*§——

(১) বসন্তরোগে পায়ে অসহ্য জ্বালা হইতে পারে। এইরূপ হইলে, আতপ চাউল গুড়া করিয়া /১ সের লইয়া, /৬ ছয়সের জলে আগের দিন ভিজাইয়া, পরের দিন অর্থাৎ বাসি হইলে উপরের টল্‌টলে জল, পায়ে অনবরত সিঞ্চন করিবে (সেঁচিয়া সেঁচিয়া দিবে)। ইহাদ্বারা পাদ-দাহ অতি শীঘ্র নষ্ট হয়। (২) তেলাকুচা পাতার রস ও কাঁচা দই সমান ভাগে মিশাইয়া পায়ের তলায় অনবরত মালিস করিবে।

করিয়াছে। এই প্রকাণ্ড বিষ্ঠানলের কোন স্থানে বা সর্ব্বত্র কামড়ানি হইলে আমরা তাহাকে অম্লপিত্ত কহিয়া থাকি। আর, দীর্ঘকাল কামড়ানির পর, বায়ুশক্তি ক্ষীণ হওয়াতে বেদনা হইলেই তাহাকে শূল বলিয়া থাকি।"

পিপাসা।

——§০§——

বসন্তজ্বরে প্রবল পিপাসা হইতে পারে। বসন্তরোগের সঙ্গে সঙ্গেই পিপাসা আসিয়া উপস্থিত হয় এবং শেষ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকে। বসন্তগুটিকাতে পূঁজ জন্মিবার সময় পিপাসার বৃদ্ধি হয়। পূর্ব্বেই পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি যে, রোগী জল যত কম খায়, ততই তাহার মঙ্গল, অথচ তৃষ্ণা পাইলে জল দিতেই হইবে। শাস্ত্রে আছে—

"অরোচকে প্রতিশ্যায়ে প্রসেকে শ্বয়থৌক্ষয়ে।
মন্দাগ্নাবুদরে কুষ্টেজ্বরে নেত্রাময়ে তথা॥
ব্রণে চ মধুমেহে চ পানীয়ং মন্দমাচরেৎ॥"

সুশ্রুত।

অর্থাৎ অরুচি, সর্দ্দি, লালাপ্রসেক, ক্ষয়, কুষ্ঠ, জ্বর, নেত্ররোগ, ব্রণরোগ ও মধুমেহ রোগে অতি অল্প পরিমাণ জল ব্যবস্থা করিবে। যাহাহউক, (১) বটের ছাল মাটির খোলায় পোড়া পোড়া করিয়া ভাজিয়া অথবা নারিকেলের ছোব্ড়া পোড়াইয়া ঠাণ্ডাজলে কিছুকাল ভিজাইয়া রাখিয়া, ঐ জল ছাঁকিয়া, রোগীকে অল্প অল্প করিয়া পান করিতে দিবে। কলাগাছের শিকড় জলে সিদ্ধ করিয়া ছাঁকিয়া সেই জল অল্প অল্প করিয়া পান করিতে দিলেও পিপাসা বারণ হয়। ধনে, মৌরী, যষ্টিমধু, বেণারমূল, কচি আমপাতা, যথাপ্রাপ্ত (অর্থাৎ সকলগুলি না পাওয়া গেলে যাহা পাওয়া যায় তাহাই লইয়া) প্রত্যেক ॥ আধতোলা লইয়া ⁄১ সের ফুটন্ত গরমজলে আধঘণ্টা ভিজাইয়া ছাঁকিয়া পানার্থ ব্যবহার করিলে বিশেষ ফল হয়।

মন্তব্য—বসন্তরোগের জন্য এই সমস্ত পাচন ঠাণ্ডা করিয়া অথবা শুধু ঠাণ্ডা জল অল্প অল্প করিয়া পান করিবার বিধি। কেবল বসন্ত বলিয়া নহে, অন্যান্য রোগেও তৃষ্ণা পাইলে, উষ্ণই হউক আর শীতলই হউক,

জলপান করিবার যেরূপ বিধি থাকে, উহা অল্প অল্প করিয়াই পান করিতে হয়। নতুবা দোষ ঘটে। শাস্ত্রে আছে—

"অতি যোগেন সলিলং তৃষ্ণতোঽপি প্রযোজিতম্।
প্রয়াতি শ্লেষ্মপিত্তত্বং জ্বরিতস্য বিশেষতঃ॥"

ভাবপ্রকাশ।

অর্থাৎ তৃষিত ব্যক্তিকে যদি অতিশয় জল দেওয়া যায়, তবে ঐ জল কফ ও পিত্ত হইয়া অবস্থিতি করে, বিশেষতঃ জ্বরিত ব্যক্তির পক্ষে জানিবে অর্থাৎ জ্বর না থাকিলেও যদি তৃষ্ণার সময় অধিক জল পান করে, তাহা হইলেও সমস্ত জল শরীরে সমীকৃত (Assimilated) না হইয়া উগার কতকাংশ কফ ও পিত্তের বৃদ্ধি সাধন করিয়া থাকে, জ্বর থাকিলেত কথাই নাই। কিন্তু, বসন্তজ্বরাদি ভিন্ন অন্য জ্বরে বা নিম্নলিখিত স্থলে শীতল জল পান করিবে না। যথা—

"নবজ্বরে প্রতিশ্যায়ে পার্শ্বশূলে গলগ্রহে।
সদ্যঃশুদ্ধৌ তথাধ্মানে ব্যাধৌ বাতকফোদ্ভবে॥
অরুচি গ্রহণীগুল্ম শ্বাস কাশেষু বিদ্রধৌ।
হিক্কায়াং স্নেহপানে চ শীতং বারি বিবর্জ্জয়েৎ॥"

সুশ্রুত।

অর্থাৎ নবজ্বরে, প্রতিশ্যায়, পার্শ্বশূল, গলরোগ, সদ্যঃশুদ্ধ (যাহাকে সদ্যঃ বমনাদি প্রয়োগ করা হইয়াছে), আধ্মান (পেটফাঁপা), বাতরোগ, কফরোগ, অরুচি, গ্রহণী, গুল্ম, শ্বাস, কাস, বিদ্রধি (ব্রণ বিশেষ) ও হিক্কা রোগে এবং স্নেহপান করিয়া শীতল জল পান করিবে না।

অপিচ—"সেব্যমানেন শীতেন জ্বরস্তোয়েন বর্দ্ধতে।"

সুশ্রুত।

অর্থাৎ শীতল জল সেবিত হইলে জ্বর বৃদ্ধি পায়। কিন্তু, এখানে শীতল জল শব্দে অসিদ্ধ শীতলজল নিষিদ্ধ বলিয়া বুঝিতে হইবে। "অত্র শীতং

জলং অকথিতং নিষিদ্ধম্"। "জ্বরে পুনঃ পুনঃ পিপাসা পায় এবং জল পান করিবা মাত্র রোগী বমন করিয়া ফেলে। ঐরূপ ঘটিলে শীতল জল পান একবারে বন্ধ করিয়া মুখে সহ্য হয় অথচ কড়া রকমের গরম জল অর্দ্ধ বা একপোয়া একবারে সমস্তটা রোগীকে খাওয়াইয়া দিলে সমূহ উপকার করে। এইটী পরীক্ষিত। অনেকে মনে করিতে পারেন, গরমজল পানে বমন বৃদ্ধি হয়, কিন্তু ফলে ঠিক্ বিপরীত। উষ্ণজল পানে পিপাসা ও বমনোদ্বেগ এককালীন দূর হয় এবং রোগী ঘুমাইয়া পড়ে। জ্বরে বিজাতীয় পিপাসা হইলে শীতলজল ও শীতল পানীয় অপেক্ষা উষ্ণজল অল্প অল্প করিয়া পান করিলে অতি শীঘ্রই পিপাসার শান্তি হয়।" (৺পুলিন চন্দ্র সান্যাল এম্, বি, কৃত চিকিৎসা-কল্পতরু, ১ম খণ্ড, ৭৫ পৃষ্ঠা দেখ।)

বমি ও মুখশোষ একসঙ্গে থাকিলে কি করিবে?

——§*§——

(১) হরিতকীর গুড়া।॰ শিকিভরি + কমলানেবুর রস ১ তোলা + চিনি।॰ শিকিভরি একত্র করিয়া সেবন করিবে। (২) অথবা হরিতকী-চূর্ণ মধু সহ লেহন করিবে।

"হরিতকীনাং চূর্ণন্তু লিহ্যান্মাক্ষিক সংযুতং।
অধোভাগীকৃতে দোষে ছর্দ্দিঃ ক্ষিপ্রং নিবর্ত্ততে॥"

চক্রদত্তঃ।

অর্থাৎ দোষ (বায়ু, পিত্ত, কফ) ঊর্দ্ধগামী হইলেই বমি হয়। হরিতকী চূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিলে সেই দোষ অধোগামী হয় এবং বমনও নিবৃত্ত হয়।

(৩) মকরধ্বজ বা রসসিন্দুর ১ রতি, শ্বেতচন্দন ঘষা ॥॰ আধতোলা সহ চাটিতে দিতে পার।

মন্তব্য—বমি দুই প্রকারে হইয়া থাকে। পাকস্থলীর নিজের উদ্দীপনা থেকে এক প্রকার বমি হয়। ইহাকে আসল বমি বলিতে পার। আর, জরায়ু, মস্তিষ্ক ও অন্ত্রাদির (পেটের নাড়ীভুঁড়ির) দোষের দরুণ যে বমি হয়, তাহাকে শঙ্কার বমি বলে। শঙ্কার শব্দের অর্থ পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সকল প্রকারের বমিতেই পাকস্থলীর উদ্দীপনা (উত্তেজনা—Irritation) হয়। তবে শেষোক্ত স্থলে, পাকস্থলীর সহিত মস্তিষ্ক, জরায়ু প্রভৃতি যে যে যন্ত্রের নিকটসম্বন্ধ আছে, ঐ ঐ যন্ত্রের উত্তেজনা পাকস্থলীতে প্রতিফলিত হয় এবং এই প্রতিফলিত ক্রিয়া দ্বারা পাকস্থলীর উদ্দীপনা হইয়া বমন হয়। এই এই স্থলে মস্তিষ্ক, জরায়ু প্রভৃতির দোষ প্রশমিত না হইলে বমন নিবৃত্ত হয় না। বমনের আসল কারণের ধ্বংস না হইলে বমন নিবৃত্ত হইবে কেন? যেমন, রক্তামাশয়ে বমন হয়। রক্তামাশয়ে বড় অন্ত্রেই ঘা হয়, কিন্তু বেশী পুরাতন হইলে ও অচিকিৎসিত থাকিলে ঘা কুচিকিৎসিত হইলে ঐ ঘা ক্রমশঃ বিস্তৃত হইতে পারে এবং ছোট অন্ত্রেও ঘা হইতে পারে। এই সব ঘায়ের দরুণ পাকস্থলীর উদ্দীপনা, হয় এবং সেই উদ্দীপনার দরুণ বমন হইতে থাকে। রক্তামাশয় না সারিলে—অন্ত্রের ঘা আরোগ্য না হইলে এই বমন বা বিবমিষার (বমনের ইচ্ছার) নিবৃত্তি হয় না। বমন সম্বন্ধে অনেক বলিবার আছে, কিন্তু বসন্ত চিকিৎসাতে এই পর্য্যন্তই বলা গেল। আয়ুর্ব্বেদের যে বই লিখিতেছি তাহাতে সকল উপসর্গেরই বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া যাইবে।

শঙ্কার বমিকে ডাক্তার মহাশয়েরা সিম্পেথেটিক্ ভমিটিং (Sympathetic Vomitting) বলেন।

গলায় বেদনা।

——§*§——

(১) দুর্ব্বার শিষ্ (মাইজ্) + আতপ চাউল + আদা, সমান ভাগে লইয়া একত্র বাটিয়া উষ্ণ করিয়া গলায় প্রলেপ দিবে। কিন্তু গলায় মসূরিকা থাকিলে দিবে না।

মন্তব্য—অতিরিক্ত শৈত্য ক্রিয়া করিলে গলার ভিতর আল্ জিবের দুই পাশে যে দুইটী গ্রন্থি (গুল্লি) আছে তাহা ফোলে ও টাটায়। তাহাতেই গলায় বেদনা হয়, এমন কি ঢোক্ গিলিতেও বেদনা করে। ঐ স্থানে বসন্ত হইলেও গুল্লি দুইটীর প্রদাহ হইয়া গলায় বেদনা হয়। গলনালীর প্রদাহ হইলেও ব্যথা হইয়া থাকে। ঐ গুল্লি দুইটীকে তালুমূলগ্রন্থি বলে। ডাক্তারিতে টন্‌সিল্ বলে। গুল্লির প্রদাহকে টন্‌সিটাইলিস্ বলে। সাধারণ অবস্থায় ঐরূপ হইলে গরমজল পান, গরম গরম দুগ্ধ পান, প্রাতে ১ বড়ি ও সন্ধ্যায় ১ বড়ি লক্ষ্মীবিলাস (স্বল্প) পান ও আদা থেতো করা রস, প্রতিবারে ৻১০ আধছটাক লইয়া গরম করিয়া বড়ি সহ মাড়িয়া সেবন করিলে ও গরমে থাকিলে ২।১ দিনেই সারিয়া যায়। বসন্তের গলার বেদনার জন্য কি ঔষধ সেবন করিবে তাহা পরে দেখ।

কাশি ও গলার বেদনা একসঙ্গে থাকিলে।

——+*+——

কাশি ও গলায় বেদনা একসঙ্গে থাকিলে উক্ত প্রলেপ ত দিবেই, অধিকন্তু তৎসঙ্গে রোগী যে পাচন খাইতেছে তৎসহ শুঁঠ, পিপুল, মরিচ (গোলমরিচ), যষ্টিমধু, তেজপাতা, বাকস ছাল যোগ করিয়া, পূর্ব্বোক্ত পাচন ও এই সকল দ্রব্যের সমস্ত পদ সমভাগে লইয়া মোটের উপর দুই

তোলা লইয়া, যথারীতি পাচন তৈয়ার করিয়া ব্যবহার করিবে। মনে কর যেন, রোগী খদিরাষ্টক পাচন সেবন করিতেছে। এখন দেখ, এই পাচনের মধ্যে আছে ৮টী পদ এবং শুঁঠ, পিপুলাদি হইল ৬টী পদ। সুতরাং মোটের উপর হইল ১৪টী পদ। কাজেই, এস্থলে এই ১৪টী পদের প্রত্যেক পদ ১৪ রতি লইয়া, আধসের জলে জ্বাল দিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ব্যবহার করিবে। ৵৷৷০ আধসের জলের অর্থ, ৩২ তোলা জল এবং আধপোয়া অর্থ, ৮ তোলা জল। কবিরাজীতে ৬৪ তোলায় সের ধরা হয়। যত পদেই পাচন হউক না কেন, সমভাগে মোটের উপর ২ তোলা লইবে ও ৵৷৷০ আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া, আধ-পোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইতে হইবে। এই হইল পাচন প্রস্তুত করার সাধারণ রীতি। তবে বিশেষ বিধি থাকিলে, সেই বিধির অনুসরণ করিবে। ৯৬ রতিতে ১ তোলা হয় এবং ৬ রতিতে ৵০ একআনা হয়। এই হিসাবে ১৪টী পদের প্রত্যেকটী ১৪ রতি করিয়া লওয়ার ব্যবস্থা করা হইল।

মন্তব্য—পাচন অধিক জল দিয়া অনেকক্ষণ সিদ্ধ করিলেই যে বেশী উপকার হইবে এমন মনে করিওনা। গাছ গাছড়া বেশীক্ষণ জ্বাল দিলে গাছ গাছড়ার "মাড়" পাচনের সঙ্গে বাহির হইয়া পাচনের গুণান্তর করে এবং উহা সময় সময় অনিষ্টও করিয়া থাকে। দেখ, চা বেশীক্ষণ গরম জলে রাখিলে বা জল সহ অধিকক্ষণ সিদ্ধ করিলে বিষাক্ত হয় এবং শরীরের বিলক্ষণ অপকার করিয়া থাকে। অতএব শাস্ত্রের যেরূপ বিধি আছে সেইরূপই করিবে। পাচনাদির তৈয়ারের বিবরণ পরিশিষ্টে দেখ।

গলার বেদনা স্থলে প্রাতে ১ বড়ী স্বল্প লক্ষ্মীবিলাস ও সন্ধ্যার সময় ১ বড়ী স্বল্প লক্ষ্মীবিলাস পানের রস ও মধু সহ দিবে। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, এ যাবৎ কোন স্থলেই ত বটিকাদির বিশেষ উল্লেখ নাই। তবে কি কেবল পাচন দিয়াই বসন্তের চিকিৎসা করিব। বাস্ত-

বিক কেবল বসন্ত বলিয়া কেন, পাচন, চূর্ণ ও পথ্যাদি দ্বারা সকল রোগেরই চিকিৎসা চলিতে পারে। আর পাচনাদির চিকিৎসাই উৎকৃষ্ট চিকিৎসা।* তবে, শাস্ত্রে একটু বিশেষ জ্ঞান না থাকিলে পাচনাদি, আবশ্যক মতে, পরিবর্ত্তন করিয়া প্রয়োগ করা কষ্টকর হইয়া উঠে। বটিকাদ্বারা চিকিৎসা করা সহজ, কিন্তু উহাদিগকে তৈয়ার করা নিতান্তই কষ্টকর এবং সাধারণের পক্ষে অসম্ভব। ৺ গঙ্গাধর কবিরাজ মহাশয় চিকিৎসায় যে এত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা এই পাচন চিকিৎসার বলেই বলিতে হইবে। আর, এই যে আজকাল কবিরাজী চিকিৎসায় এত উপকার পাইতেছ ও বড় বড় কবিরাজ মহাশয়েরা চিকিৎসা দ্বারা অতুল ঐশ্বর্য্য সঞ্চয় করিয়া অগাধ ধনী হইতেছেন, উহারও মূলে পাচনের শক্তিই নিহিত আছে। কবিরাজী ব্যবসা যাহার প্রতাপে আজকাল এত গৌরবান্বিত, তাহা 'চক্রদত্ত' নামক পুস্তকের গুণেই বলিতে হইবে। আর, এই যে "চক্রদত্ত" দেখিতেছ, উহার মধ্যে পাচনাদির ব্যবস্থাই বাহুল্যরূপে আছে।

স্বরভঙ্গ হইলে কি করিবে ?

——§*§——

(১) শাস্ত্রোক্ত অষ্টাঙ্গাবলেহ মধু সহ মাড়িয়া মাঝে মাঝে চাটিতে দিবে। (২) শুধু খদিরাষ্টক পাচন সেবনেও ঐ ফল হয়। (৩) আকড়করা বচ্‌চূর্ণ ও সোহাগার খৈচূর্ণ সমান ভাগে লইয়া বেশ করিয়া মিশাইয়া মধুসহ চাটাইতেও পার। (৪) অথবা পিপুলের গুড়া ৩ রতি ও হরিতকীর গুড়া ৬ রতি মধুসহ লেহন করিতে দিবে।

---

* "সর্ব্বৌষধেষু পাচন মুনিভিঃ শ্রেষ্ঠমুচ্যতে।
যতো ব্যাধিপ্রপীড়িতং স্বস্থং করোতি সত্বরম্॥"

অত্যন্ত কাশি হইলে কি করিবে?

(১) তেজপাতা, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, যষ্টিমধু, বাকস ছাল (কোন কোন স্থানে বাসক ছালও বলে এবং বাসক ছালই বিশুদ্ধ কথা) মোট ২ তোলা, যথারীতি পাচন তৈয়ার করিয়া অল্প অল্প করিয়া পান করিতে দিবে। (২) অথবা বাকস ছাল ॥০ আধতোলা, অনন্ত মূল ॥০ আধ-তোলা, কিস্‌মিস্ ।০ শিকিভরি, যষ্টিমধু ।০ শিকিভরি, তেজপাতা ।০ শিকি-ভরি, আকড়করা বচ্ ।০ শিকিভরি, তালের মিছরি ১ তোলা, আধসের জলে জাল দিয়া, আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে ও ২।১ ঝিনুক করিয়া মাঝে মাঝে পান করিতে দিবে। এই শেষোক্ত পাচনটী বিশেষ উপকারক।

মন্তব্য—এখানে একটী কথা ভাবিয়া দেখিবার আছে। হচ্ছে বসন্তের চিকিৎসা, আসিয়া জুটিল কাশি এবং ব্যবস্থা করা হইল কাশির সাধারণ ঔষধ অর্থাৎ বসন্ত না হইয়াও যদি শুধু কাশি হইত, তাহাতেও এই পাচনাদিই ব্যবস্থা করা হইত। কথাটী খুব সত্য। কাশি মূলরোগই হউক অথবা অন্য রোগের উপসর্গরূপেই আসিয়া উপস্থিত হউক, উহার চিকিৎসার বিশেষ পার্থক্য নাই। কাশি আসল রোগ হইলেও তার যে চিকিৎসা, অন্য রোগের উপসর্গ হইলেও তার সেই চিকিৎসা। তবে উভয়ের পার্থক্য এই যে, কাশি আসল রোগ হইলে শুধু কাশির চিকিৎসা করিলেই হয়, আর,জ্বরাদি অন্যান্য রোগের উপসর্গাদিরূপে আসিয়া জুটিলে, কাশি ও জ্বরের যুগপৎ (এক সময়ে) চিকিৎসা করিতে হয়। তবে, শেষোক্ত স্থলে লক্ষ্য রাখিতে হয় যে, একের চিকিৎসা অন্যের বিরোধী না হয় অর্থাৎ মূল রোগের চিকিৎসা এমন ভাবে করিতে হয়, যেন উপ-সর্গের বৃদ্ধি না পায় অথবা উপসর্গের চিকিৎসা এরূপে করিতে হয়, যেন

উপসর্গের চিকিৎসা দ্বারা মূল রোগের বৃদ্ধি না হয়। উপসর্গ যেখানে ক্ষীণবল থাকে সেখানে উপসর্গের চিকিৎসা না করিলেও চলে। মূল-রোগের দমনে উপসর্গাদি আপনা হইতেই তিরোহিত হইয়া যায়। যেমন, একজনের জ্বর হইয়াছে ও রোগী প্রলাপ বকিতেছে। আরও লক্ষ্য করিতেছ যে, জ্বর যখন কম থাকে প্রলাপও তখন কম থাকে, আর, জ্বরের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রলাপও বৃদ্ধি পায়। এস্থলে সহজেই বুঝা যায় যে, জ্বর খাটো করিতে পাবিলেই বোগীর প্রলাপাদি আপনা হইতেই দূরীভূত হইবে। তবে উপসর্গাদি উৎকট হইলে, তাহাদেব যন্ত্রণা নিবাবণ করিবাব জন্য উহাদের সাময়িক চিকিৎসাব দরকার হয়। আব, উপসর্গ অত্যন্ত উৎকট হইয়া জীবনও নষ্ট কবিতে পারে বলিয়া স্থল বিশেষে মূল বোগের সঙ্গে সঙ্গে উপসর্গের চিকিৎসারও দবকাব হইয়া থাকে।

চক্ষুরোগ।

——————§*§——————

চক্ষু রক্তবর্ণ হইলে (১) শামুকের গুগ্‌লির জল (কচি শামুকের ভিতরের জল) ২ ফোঁটা পরিমাণ লইয়া চক্ষুব ভিতরে দিবে। (২) উৎকৃষ্ট গোলাব জলে অল্প একটু ফিট্‌কারী গুড়া করিয়া ভিজাইয়া সেই জল ফোঁটা ফোঁটা করিয়া চক্ষুতে দিলেও হয়। (৩) বসন্তের দরুণ চক্ষু আঁটিয়া গেলে (বন্ধ হইয়া গেলে) প্রথম দিন বেলপাতার রস ২ ফোঁটা, দ্বিতীয় দিন কাঁচা হরিদ্রার রস ২ ফোঁটা ও তৃতীয় দিন পাকা ডালিমের রস রৌদ্রে পক্ক করিয়া (পাকা ডালিমের রস পাথরের কিম্বা কাঁচের বাটীতে করিয়া রৌদ্রে ৪ প্রহর রাখিয়া পরিষ্কার নেকড়ায় ছাঁকিয়া লইতে হয়) তাহা হইতে ২ ফোঁটা রস চক্ষুব ভিতরে দিবে। এই সমস্ত সাধারণ

উপায় দ্বারা, চক্ষুর সামান্য সমান্য দোষের উপকার হইতে পারে, কিন্তু চক্ষুর ভিতরে বসন্ত হইলে সতর্কতা সহকারে ও বিলম্ব না করিয়া, অশ্চোতন, সেঁক ও প্রলেপাদির ব্যবস্থা করিবে। তুচ্ছ করিলে রোগী অন্ধ হইতে পারে।

গড়্গড়ে ১ তোলা ও যষ্টিমধু ১ তোলা লইয়া যথারীতি পাচন তৈয়ার করিবে ও ছাঁকিয়া লইবে। এক খণ্ড ফ্লানেল এই পাচন মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া ও নিংড়াইয়া (চিপড়িয়া) ঈষদুষ্ণ অবস্থায় চক্ষুর উপর সেঁক দিবে। ইহা দ্বারা চক্ষুর যাতনাদি দূর হয় ও চক্ষুস্থ বসন্তের রসাদি স্থানান্তরে সঞ্চারিত হইয়া থাকে।

চক্ষুতে সেঁক দিবাভাগেই দিতে হয়। সমস্ত দিনে ৩।৪ বার সেঁক দেওয়া যায়। একবারে ১ দণ্ডের বেশী সেঁক দিতে নাই। পাচন দ্বারা সেঁক দিতে হয়। নিম্নলিখিত প্রকারে সেঁক দিলে রোগীর বিশেষ উপকার হয়। গুলঞ্চ ১ তোলা + যষ্টিমধু ১ তোলা, জল একসের; শেষ আধপোয়া, এই পাচন ঈষদুষ্ণ থাকিতে থাকিতে নিম্নলিখিত প্রকারে চক্ষুর উপর সেঁক দিবে। যথা—

একটি মেটে ঘটের তলদেশে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ৬টী ছিদ্র করিবে। বাম হাতের তেলো (তলদেশ) দ্বারা ঘটের ছিদ্র বন্ধ করিয়া, ঐ পাচন ঘটের মধ্যে দিবে। রোগীকে বালিশে মাথা রাখিয়া চিৎ হইয়া শুইতে বলিবে ও চক্ষু বুজিয়া থাকিতে বলিবে। ঐ ঘট চক্ষুর ৪ অঙ্গুলি ঊর্দ্ধে ধরিয়া ছিদ্র মোচন করিবে। সরু ধারায় ঐ পাচন চক্ষুর উপর পড়িবে। এই-রূপ কার্য্যের নাম সেঁকক্রিয়া।

অশ্চোতন—অর্থাৎ বিন্দু বিন্দু করিয়া চক্ষুর ভিতরে নিক্ষেপ। হাঁস বা অন্য কোন পাখীর পালক সংগ্রহ করিয়া তাহার মূলদেশ হইতে ৫।৬ অঙ্গুলি দীর্ঘ অংশ গ্রহণ করিবে। উহার ভিতর বেশ পরিষ্কার করিয়া তলদেশে মুগের মত একটী সরু ছিদ্র করিবে। এই ছিদ্র বন্ধ করিয়া

নিম্নলিখিত পাচনের জল উহার ভিতরে পুরিবে। রোগী বালিশে মাথা রাখিয়া চিৎ হইয়া চক্ষু মেলিয়া (চক্ষু চাহিয়া) থাকিবে। উন্মীলিত নেত্রের ২ অঙ্গুলি ঊর্দ্ধে ঐ পাচনপূর্ণ নল ধরিয়া ছিদ্র মোচন করিতে হয়। ইহাতে ঐ পাচন ফোঁটা ফোঁটা করিয়া চক্ষুর ভিতরে পড়িবে। ইহা দিনে ৩।৪ বার দেওয়া যায়। প্রতিবারে ৮ হইতে ১০ ফোঁটা পর্য্যন্ত দেওয়া যাইতে পারে। ইহা দিনে দিতে হয়। রাত্রিতে দেওয়া নিষেধ। অশ্চোতনের পাচন যথা—যষ্টিমধু, হরিতকী, আমলকী, বহেড়া, দারুহরিদ্রা, সুঁদিফুল (সুঁদি সাপ্‌লার ফুল। ইহার ভাল নাম নীলোৎপল), বেণার মূল (ভাল কথা বীরণ মূল; কোন কোন স্থানে বীন্নার মূলও বলে।) লোধ, মঞ্জিষ্ঠা, সূচীমুখীর কাণ্ড (বোড়া চক্র) মোট ২ তোলা, জল ॥৹ আধসের, পাকশেষ আধপোয়া। সমস্ত দ্রব্য না পাইলে, যথাপ্রাপ্ত সংগ্রহ করিয়া মোট ২ তোলা লইবে।

প্রলেপ—উক্ত জিনিষ গুলি জলে বাটিয়া ঝিনুকের ভিতরে লইয়া ঈষৎ গরম করিয়া চক্ষুর পাতার উপরিভাগে প্রলেপ দিতে হয়। ইহাতেও গুটিকাসকল প্রশমিত হয়। নিম্নলিখিত প্রলেপটী বিশেষ ফলপ্রদ, যথা—আঁটি বাদ দিয়া হরিতকীর খোসা লইবে ও টুকরা টুকরা করিয়া কাটিবে। পরে একখানা লোহার হাতায় গাওয়া ঘৃত লইয়া উননের উপর ধরিবে। ঘৃত নিষ্ফেন হইলে হরিতকীর খণ্ডগুলি উহার মধ্যে দিয়া নাড়িয়া নাড়িয়া অল্প ভাজিয়া লইবে। দেখিবে যেন একবারে পুড়িয়া না যায়। এই হরিতকী জল সহ বাটীয়া চক্ষুর পাতার উপর প্রলেপ দিলে বিশেষ উপকার হয়।

মাথাধরা বা ঘোরা।

——(*)——

অত্যন্ত মাথাধরা বা ঘোরা থাকিলে (১) সাদা চন্দন বাটিয়া ব্রহ্মতালুতে প্রলেপের মত করিয়া দিবে। (২) পুরাতন ঘৃতও ঐরূপে দেওয়া যায়। (৩) অথবা উভয় দ্রব্য মিশাইয়া দিবে। (৪) ভৃঙ্গরাজের (ভীমরাজের) পাতা বাটীয়া পুরাতন ঘৃত সহ ব্রহ্মতালুতে দিবে। (৫) সতেজ কুড়কাষ্ঠ জল সহ বেশ করিয়া বাটীয়া কপালে ও ব্রহ্মতালুতে দিলে যেমন মাথাধরা হউক না কেন অগৌণে সারিয়া যায়।

বসন্ত গুটিকাতে অত্যন্ত জল হইয়া শরীর ফুলিলে।

——§*§——

নিমপাতা, কেলেকড়ার পাতা, নাটার ডগা, তুলসী পাতা ও আদা এই সমস্তের মধ্যে যথাপ্রাপ্ত দ্রব্যের রস একত্র করিয়া মিশ্রিত করিয়া, স্ফোটকের উপরি অল্প পরিমাণে প্রলেপ দিলে, অতিরিক্ত জল শোষিত হইয়া যাইবে। কেহ কেহ এই অবস্থায় নিমপাতার রস, নাটার ডগার রস, আপাঙ্ পাতার রস, কেলেকড়ার পাতার রস, গিমাশাকের রস, যথাপ্রাপ্ত এই সকলের রস সমভাগে লইয়া, তৎসহ কিঞ্চিৎ নারিকেল তৈল জাফ্রান, আদার রস, পিয়াজের রস, এই সকল অল্প অল্প যোগ করিয়া বসন্তের গুটিকার উপর ছোব্ দেন। ইহাতে জল শোঁষণ হয়।

পেট ফাঁপিলে কি করিবে ?

——∞✻∞——

(১) গ্যাঁদাফুলের পাতার রস, সোরা সহ বাটীয়া উদরে প্রলেপ দিবে। (২) সাবান জলে গুলিয়া গরম করিয়া উদরে প্রলেপ দিবে।

(৩) আমলকী ও আদা সমভাগে প্রয়োজন মত লইয়া, জলসহ বাটীয়া ঈষৎ গরম করিয়া অথবা তৎসহ অল্প পুরাতন ঘৃত মিশাইয়া ঈষৎ গরম করিয়া পেটে প্রলেপ দিবে। পেটের উপরে বসন্ত হইলে এই প্রলেপটী দিবে না। শুধু আমলকী জল সহ বাটীয়া প্রলেপ দিবে। (৪) মুলতানি হিং জলে গুলিয়া গরম করিয়া নাভির চারিদিকে প্রলেপ দিলেও উপকার হয়। (৫) সোবা, আমলকী, নিশাদল ও কৃষ্ণতিল জলসহ বাটীয়া নাভির চারিদিকে প্রলেপ দিবে। এই শেষোক্ত প্রলেপটী সময় সময় ইন্দ্রজালের মত কাজ করে।

মন্তব্য—পেটফাঁপা অতি সাঙ্ঘাতিক উপসর্গ। পাকস্থলীর মধ্যে এবং অন্ত্রের (পেটের নাড়ীভুঁড়ির) মধ্যে বাতাস জমিলেই পেট ফাঁপে। সহজ শরীরেও পেট ফাঁপিতে পারে, আবার, রোগের দরুণও পেট-ফাঁপিতে পারে। বদহজমি হইলে সামান্য একটুকু আধটুকু সকলেরই পেটফাঁপা হয়। এই বাতাস অল্প পরিমাণে জমিলে পেটফাঁপা অল্প হয়, আর, খুব বেশী পরিমাণে জমিলে পেট ফুলিয়া ঢাক হয়। এই পেটফাঁপা দুই কারণে উৎপন্ন হয়। (১) বাহিরের বাতাস পেটের ভিতরে ঢুকিয়া পেট ফাঁপিতে পারে। যেমন, তামাকের ধূয়া গিলিলে, বাতাস পেটের ভিতরে যাইতে পারে এবং তদ্দরুণ পেটও অল্প বিস্তর ফাঁপিতে পারে। কিন্তু এ রকম পেটফাঁপা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়। (২) দ্বিতীয়তঃ পেটের (পাকস্থলীর ও অন্ত্রের) ভিতরের জিনিষ (ভুক্ত দ্রব্যাদি), পচিয়া এক প্রকার দুষ্ট বাষ্প বা গ্যাসের সৃষ্টি করিয়া পেট-ফাঁপা উৎপন্ন করিতে পারে। খাদ্যদ্রব্য সম্যক্ পরিপাক না পাইলে কিরূপে পেট ফাঁপার সৃষ্টি হয় তাহা ইতি পূর্ব্বেই একবার বলিয়াছি। বাতশ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক, কঠিন রকমের বসন্তজ্বর প্রভৃতি শক্ত রকম জ্বর জারিতে পরিপাক যন্ত্র ক্ষীণবল হইয়া যায়। শক্ত রোগে রোগী যেমন উপরে দুর্ব্বল হয়, তাঁহার ভিতরের যন্ত্রাদিও সেইরূপ দুর্ব্বল হইয়া থাকে।

সেই কারণে পরিপাক যন্ত্র দুর্ব্বল হওয়াতে, রোগী আর পূর্ব্বের মত খাদ্যদ্রব্য পরিপাক করিতে সমর্থ হয় না। সেই জন্যই ঐ সময় দুগ্ধ, বার্লি প্রভৃতি লঘু অথচ পুষ্টিকর পদার্থ রোগীকে খাইতে দিতে হয়। লঘু অর্থাৎ সহজে যাহা পরিপাক পাইতে পারে; কারণ, পরিপাক যন্ত্রের পূর্ব্বের মত কাজ করিবার শক্তি নাই। পুষ্টিকর অর্থাৎ শরীরের বলকারক; কারণ, ভিতরের যন্ত্রাদির যাহাতে সত্বর বলবিধান হয়, এরূপ পথ্য প্রদান করা তখন দরকার হইয়া উঠে। শুধু লঘু হইলেও হইবে না, আর, শুধু পুষ্টিকর হইলেও হইবে না। দুগ্ধ ও বার্লি, রোগী সহজে পরিপাক করিতে পারে এবং কাজেই তাহার ক্রমশঃ বলাধান হয়। কিন্তু, শক্ত রোগে রোগী এত দুর্ব্বল হইতে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার পাকস্থলী প্রভৃতি ভিতরের যন্ত্রাদিও এত দুর্ব্বল হইতে পারে যে, ঐ সমস্ত লঘুপাক জিনিষও তখন হজম করিবার শক্তি পাকস্থলীর থাকে না। দুগ্ধ ও বার্লি প্রভৃতি যাহাই কেন আহার করিতে দেওনা, তাহাই পাকস্থলীতে বা অন্ত্রমধ্যে উৎপাচিত হইয়া (Fermented. হইয়া) গ্যাস বা বাতাসের সৃষ্টি করে এবং বাতাসের সৃষ্টি হওয়াতে পেট ফাঁপারও বৃদ্ধি হয়। রোগের শক্তিতেই পেটফাঁপা উৎপন্ন হয়। রোগের শক্তি ক্ষীণ হইলে পরিপাক যন্ত্রও আবার সতেজ হইয়া নিজ নিজ কার্য্য করে। যাহাহউক, এই অবস্থায় দুগ্ধ, সাগু, বার্লি, এরারুট প্রভৃতি কিছুই ভাল পথ্য নহে। অন্য কোন ঔষধ না দিয়া শুধু ধনে ভিজান জল, শ্লেষ্মার বৃদ্ধি থাকিলে শুঁঠ ভিজান জল, অথবা উভয় দ্রব্য একত্র ভিজান জল (খুব গরম জলে ধনে ভিজাইয়া ঠাণ্ডা হইলে ছাঁকিয়া) পেটফাঁপা রোগীকে খাইতে দিবে এবং পূর্ব্বোক্ত প্রলেপাদি প্রয়োগ করিবে। বসন্তরোগীকে ধনের জলই দিতে হয়। পথ্যের মধ্যে ছানার জল বা মসূরের জল দিবে। পরিশিষ্ট দেখ।

সর্ব্বদা মনে রাখিবে যে, শক্ত রোগে পেটফাঁপা বিশেষতঃ ছেলেদের পেটফাঁপা একপ্রকার শেষ উপসর্গ। পেটফাঁপার একটু বাড়াবাড়ি হইলেই অমনি শ্বাস ধরে ও রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

অসহ্য গাত্রদাহ হইলে কি করিবে ?

——§*§——

(১) "ব্যুষিতং বারি সক্ষৌদ্রং পীতং দাহ গুড়ীহরম্।"

অর্থাৎ বাসি ঠাণ্ডাজল সহ অল্প মধু মিশাইয়া মিষ্টাস্বাদ করিয়া রোগীকে পান করাইবে। ইহাতে বসন্তের গুটিকা ও তজ্জন্য দাহের শান্তি হয়। মধু এমন ভাবে মিশাইবে যেন সাধারণ রকমের মিষ্টাস্বাদ হয়।

(২) "উত্তানসুপ্তস্য গভীর তাম্রকাংস্যাদিপাত্রং প্রণিধায় নাভৌ।
তত্রাম্বুধারা বহুলাপতন্তী নিহন্তিদাহং ত্বরিতং সুশীতা ॥"

চক্রদত্ত।

"সর্ব্বত্রৈব কফসম্বন্ধং বিনা যথা গাত্রে অম্বুকণা ন পতন্তি তথাকার্য্যং।"

অর্থাৎ রোগীকে চিৎ করিয়া শোয়াইয়া নাভির উপর একটী বড় গোছের তামার বা কাঁসার বাটী রাখিবে। বাটি যেন সমতল হয় অর্থাৎ বাটির খুর না থাকে। গায়ে জল না পড়ে এই জন্য নাভি প্রদেশ ভিন্ন সর্ব্বশরীর কাপড় দ্বারা ঢাকিয়া দিবে। একটী গাড়ুতে (ঝারিতে) বরফজল বা খুব ঠাণ্ডাজল পূর্ণ করিয়া নাভির ১ হাত উপর হইতে বাটির মধ্যে ঐ ঠাণ্ডাজলের ধারণা দিবে। এইরূপ আধঘণ্টা থানেক করিলে প্রবল গাত্র দাহও নিবৃত্ত হয়। শ্লেষ্মার বাড়াবাড়ি থাকিলে ইহা প্রয়োগ করিবে না। (৩) কলম্বী (কল্মী) শাকের রস গায়ে প্রলেপের মত করিয়া মাখাইয়া দিলেও বসন্তজনিত জ্বালা প্রশমিত হয়।

বমন।

——§*§——

বমি ও মুখশোষের বিষয়ও দেখ। (১) অতিশয় বমন হইতে থাকিলে শ্বেত চন্দন ঘষা (শ্বেত চন্দন পাথরের উপর জলসহ ঘষিয়া ঐ ঘষা বা কাথ) ॥০ আধতোলা, অল্প মধু সহ চাটিতে দিবে। (২) জিউলি বা জিকা গাছের বাকল ঐরূপ ঘষিয়া।০ শিকি ভরি প্রমাণ খাইতে দিবে। (৩) মুড়ি ভিজান জল পানেও বমি নিবৃত্ত হয়। টাট্‌কা মুড়ি হইতে বালুকা ঝাড়িয়া ফেলিয়া জলে ভিজাইয়া ছাঁকিয়া লইতে হয়। [৪] আমের আঠির শাঁস+খৈ+সৈন্ধব লবণ সমান ভাগে লইয়া, মধু সহ মাড়িয়া চাটাইলে বিশেষ উপকার হয়।

মস্তিষ্ক গরম হইলে কি করিবে ?

——‡*‡——

[১] পুরাতন ঘৃত বা চন্দনতৈল ব্রহ্মতালুতে প্রলেপের মত করিয়া দিবে। [২] মাথা ঘোরার ঔষধও ইহাতে প্রয়োগ করা যায়।

ভেদ বা তরল দাস্ত থাকিলে কি করিবে ?

——§*§——

[১] ভেদ ও বমি একসঙ্গে থাকিলে, বেলশুঁঠ ১ তোলা, আমের আঠির শাঁস ১ তোলা, যথারীতি পাচন তৈয়ার করিয়া ৩।৪ বারে খাওয়াইবে। ইহাতে অতি আশ্চর্য্য রকমে ভেদ বমি প্রশমিত হয়। পাচন খাওয়াইবার সময়ে প্রতিবারে।০ শিকিভরি চিনি ও।০ শিকিভরি মধু সহ পাচন মিশাইয়া সেবন করাইতে হয়। [২] ভেদবমিতে খদিরাষ্টক

প্রভৃতি অন্য পাচন না দিয়া, তৎপরিবর্ত্তে উশীরাদি পাচন পূর্ব্বের পাচনের নিয়মে দিতে হয়। [৩] অতিসার বা আমাশয় বা রক্তামাশয়ে বিল্বাদি পাচনে বিশেষ কাজ করে। [৪] ভেদ হইতে থাকিলে প্রত্যেক দাস্তের পর নিম্নলিখিত ঔষধ খাওয়াইবে। যথা, ২০টী মুথা, আতপ চাউল-ধোয়াজল সহ বাটীয়া, পুনরায় ৵১০ আধছটাক আতপ চাউল ধোয়া জলে গুলিয়া ছাঁকিয়া লইবে। প্রতিবারে ১ ঝিনুক আতপ চাউল ধোয়া জল ও এই প্রস্তুতীকৃত ঔষধ ৪।৫ ফোঁটা একত্র মিশাইয়া গরম করিয়া পান করাইবে। দাস্ত বন্ধ হইলে আর পান করাইবে না। ইহাও বিশেষ পরীক্ষিত ও ফলপ্রদ ঔষধ।

মন্তব্য—কেবল দাস্ত বন্ধ করাইলেই হইবে না। দাস্ত বন্ধ হইলেও রোগের বৃদ্ধি পায়। অধিকবার পাতলা দাস্ত হওয়া ত দোষেরই কথা বটে। যাহাতে স্বাভাবিক ভাবে কোষ্ঠ খোলাসা হয়, সেইরূপ চেষ্টা করিবে। পথ্যাদির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। পথ্যাদির ব্যতিক্রম না হইলে দাস্তেরও প্রায় ব্যতিক্রম হয় না।

অধিক ঘর্ম্ম হইলে কি করিবে?

—§+§—

রোগীর অত্যধিক ঘর্ম্ম হইলে শঠীর পালো সর্ব্বাঙ্গে মর্দ্দন করিবে। বিকারাবস্থায় অতিঘর্ম্ম বিশেষ দুর্লক্ষণ মনে করিতে হইবে। বিকারাবস্থায় ঐরূপ হইলে শঠীরপালো মর্দ্দন ত করিবেই, অধিকন্তু মৃগনাভি ২ রতি ও মকরধ্বজ ১ রতি মিশ্রিত করিয়া মধু সহ সেবন করাইবে। পানের রসাদি সংযোগেও দিতে পার।

রক্তবাহ্য, রক্তবমন ও রক্তপ্রস্রাব ইত্যাদি।

[১] রক্তবমন, রক্তপ্রস্রাব, রক্তবাহ্য প্রভৃতি একসঙ্গে থাকিলে অন্য পাচনের পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত পাচন দিবে, যথা—মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন, রক্তকাঞ্চন বৃক্ষের ছাল, যথাপ্রাপ্ত মোট ২ তোলা, জল ⁄৷৷ আধসের শেষ আধপোয়া। ইহা পূর্ব্বের পাচনের নিয়মে সেবন করাইবে এবং এই পাচন গরম গরম লইয়া উদরে সেঁক দিবে। [২] মুখ দিয়া রক্ত পড়িলে, জিউলী বা জিকার ডালের বাকল ত্যাগ করিয়া ঐ কাষ্ঠ চন্দনের মত করিয়া ঘষিয়া, ঐ ঘষা (ক্বাথ) আধভরি আন্দাজ খাইতে দিবে। [৩] রক্তপ্রস্রাব হইলে উপরোক্ত পাচন সেবনের সঙ্গে সঙ্গে নিম্নলিখিত প্রলেপটী, যোগাড় করিতে পারিলে, দিবে। যথা—সোরা, ইন্দুরের নাদি [লাদি বা বিষ্ঠা] জলসহ বাটীয়া নাভির চারিদিকে প্রলেপ দিতে হয়। [৪] মুখ, নাক, কান, চক্ষু প্রভৃতি দেহের উর্দ্ধভাগ দিয়া রক্ত পড়িলে, অন্য পাচনের পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত পাচনটী দিলে বিশেষ উপকার হয়—

"আটরূষক মৃদ্বীকা পথ্যা ক্বাথঃ সশর্করঃ।
ক্ষৌদ্রাঢ্যঃ কসনশ্বাসরক্তপিত্তনিবর্হণঃ॥"

ভাবপ্রকাশ।

অর্থাৎ বাকস ছাল, কিস্‌মিস্‌, হরিতকী সমভাগে মোট ২ তোলা, জল ⁄৷৷ আধসের শেষ আধপোয়া। ঠাণ্ডা হইলে চিনি ও মধু সহ মিশাইয়া ২।৩ বারে সেবন করাইতে হয়। ইহাদ্বারা সর্ব্বপ্রকার কাস, শ্বাস ও রক্তপিত্ত নষ্ট হয়। [৫] প্রস্রাব ও মলদ্বার দিয়া রক্ত পড়িলে—

"দুরালভাপর্পটকপ্রিয়ঙ্গু ভূনিম্ববাসাকটুরোহিণীনাম্।
জলং পিবেচ্ছর্করয়ানগাঢং তৃষ্ণাস্রপিত্তজ্বরদাহযুক্তঃ॥"

চক্রদত্তঃ।

অর্থাৎ দুরালভা, ক্ষেতপাপড়া, প্রিয়ঙ্গু ,চিরতা, বাকস, ও কট্‌কী এই সকলের ক্বাথ [পাচন] সেবন করিলে পিপাসা, রক্তপিত্ত, জ্বর ও দাহ নষ্ট হয়। পাচন তৈয়ার হইলে ছাঁকিয়া ঠাণ্ডা করিয়া যথেষ্ট চিনি সহ মিশাইয়া সেবন করাইবে। ইহাও ২।৩ বারে পান করাইবে এবং প্রতি-বারে ১ তোলা কাশির চিনি সহ [ইক্ষুজাত চিনি, এথচিনি বা কাশির চিনি) মিশাইয়া সেবন করাইবে। অধোগত রক্তপিত্তের, বিশেষতঃ রক্তপ্রস্রাবের পক্ষে এমন মহৌষধ আর আছে কিনা সন্দেহ।

মন্তব্য—কট্‌কী ভেদক, সুতরাং বসন্ত রোগীর রক্তপ্রস্রাব ও রক্ত-বাহ্যে কট্‌কীর পরিবর্ত্তে দূর্ব্বা দিবে।

বসন্ত রোগীর প্রস্রাবে জ্বালা ও মূত্রাল্পতা থাকিলে।

——§*§——

বসন্তরোগীর প্রস্রাবে জ্বালা ও মূত্রাল্পতা থাকিলে। [১] সোরা ২।৩ রতি অথবা "বজ্রক্ষার" ৪।৫ রতি, মসিনাভিজান জল সহ দিবে। প্রতি-বারে এইরূপ মাত্রায় লইয়া ২।৩ বার সেবন করাইবে। ২ তোলা মসিনা [তিসি] এক ছটাক জলে ৪।৫ ঘণ্টা ভিজাইয়া ছাঁকিয়া লইতে হয়।

নাসিকাদ্বারা রক্তপড়া।

(১) দূর্ব্বার ডাঁটা ও পাতা ছেঁচিয়া তাহার রস নস্য করিবে অর্থাৎ নাকের ভিতরে দিয়া অল্প অল্প করিয়া টানিবে। (২) আমলকী জলসহ বাটীয়া, পুরাতন ঘৃতসহ মিশাইয়া, কপালে প্রলেপ দিলেও রক্ত পড়া বন্ধ হয়

বসন্তস্ফোটক হইতে রক্তস্রাব হইলে কি করিবে ?

——§০§——

নিম্বাদি পাচন দ্বিগুণ (ডবল) মাত্রায় তৈয়ার করিয়া ঠাণ্ডা হইলে কাশির চিনি /০ একছটাক সহ মিশাইয়া রাখিবে ও ৩।৪ বারে সেবন করিতে দিবে।

মন্তব্য—শরীরের নানাস্থান দিয়া রক্তস্রাব হওয়া রক্তপিত্তের লক্ষণ। এই রক্ত নাক, মুখ, চোখ্, কান দিয়া স্রুত হইতে পারে, এইরূপ অবস্থায় ইহাকে উর্দ্ধগ রক্তপিত্ত বলে। আবার, মলদ্বার, প্রস্রাবদ্বার, প্রসবদ্বার প্রভৃতি অধোমার্গ দিয়াও রক্ত স্রুত হইতে পারে। এইরূপ হইলে তাহাকে অধোগ রক্তপিত্ত বলে। আবার, উর্দ্ধ ও অধঃ উভয় মার্গ দিয়াও রক্ত স্রুত হইতে পারে। রক্ত ও পিত্তের অত্যন্ত প্রকোপ থাকিলে, চাই কি, সমস্ত রোমকূপ দিয়াও রক্ত নির্গত হইতে পারে। নিদান স্থানে পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি যে, রক্ত ও পিত্তের প্রকোপ ভিন্ন বসন্ত রোগ হয় না। সুতরাং বসন্তে রক্তপিত্তের লক্ষণাদি উপস্থিত হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। রক্ত উর্দ্ধ, অধঃ ও সমস্ত রোমকূপ প্রভৃতি যে স্থান দিয়াই নির্গত হউক না কেন, বাকস পাতার রস, বাকস ছালের পাচন বা রস পান করা বিশেষ উপকারক। বাসককে রক্তপিত্তের মহৌষধ (Specific) বলা যাইতে পারে। শাস্ত্রে আছে—

"বাসায়াং বিদ্যমানায়াং আশায়াং জীবিতস্য চ।
রক্তপিত্তী ক্ষয়ী কাসী কিমর্থ মবসীদতি॥"

চক্রদত্তঃ।

অর্থাৎ বাসক পৃথিবীতে বিদ্যমান থাকিতে, রক্তপিত্ত ক্ষয়, কাস পীড়িত রোগী কেন অবসন্ন হয় ? মোট কথা, বাসক ঐ ঐ রোগের মহৌষধ। অতএব জীবনে নিরাশ না হইয়া বাসক সেবন কর।

নিমোনিয়া, ব্রংকাইটিস্ প্রভৃতি। *

——§*§——

নিমোনিয়া, ব্রংকাইটিস্ প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হইলে, অন্য পাচনের পরিবর্ত্তে, ভূনিম্বাদি অষ্টাদশাঙ্গ পাচন পূর্ব্বের পাচনের নিয়মে দিবে। সঙ্গে সঙ্গে কজ্জলী বা রসসিন্দূর যথা মাত্রায় (পূর্ব্বের ব্যবস্থা দেখ) লইয়া, পানের রস গরম করিয়া তৎসহ দিনে ২ বার ও রাত্রে ১ বার দিবে। আবশ্যক হইলে অর্থাৎ বিকারাদির লক্ষণ দেখিলে বা রোগী দুর্ব্বল হইলে, বিশেষতঃ ঐ সঙ্গে বায়ু ও শ্লেষ্মার বেশী প্রকোপ থাকিলে, স্বল্প কস্তুরী-ভৈরব দিবে। কস্তুরী ভৈরব সান্নিপাতিক জ্বরের প্রায় সকল অবস্থাতেই দেওয়া যায়। ইহা যেমন জ্বরঘ্ন ও স্নায়বিক বলকারক, তেমনিই ইহাতে পরস্পর বিরুদ্ধ দুইটী বিশিষ্ট গুণ দেখা যায়। ফলতঃ বেলকে (বিল্বফলকে) যেমন সারকও বলা যায়, আবার, ধারকও বলা যায়—কারণ, বেল

---

* নিমোনিয়া ও ব্রংকাইটিস্ প্রভৃতি বুঝিতে হইলে ফুস্ফুসের আকৃতি, সংস্থান ও ক্রিয়া বুঝিবার দরকার হয়।

গলা টিপিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে যে গলার সন্মুখে কণ্ঠা পর্য্যন্ত একটা গ্রন্থি-যুক্ত নল লম্বালম্বি ভাবে আছে। এই নলে অনেকগুলি গাঁইট আছে এবং উক্ত নলটী ফাঁপা। পরিপাক যন্ত্রের বিবরণে বলিয়াছি যে জিহ্বার গোড়ায় একটা ছিদ্র আছে, উহাই শ্বাস নলীর মুখ। এই মুখের তলদেশে অন্ননালীর মুখ। গলার সন্মুখের এই ফাঁপা নলের নাম শ্বাসনলী বা টুকিয়া (Trachia). টুকিয়ার উপরি ভাগটা কিছু মোটা গোছের। এই মোটা অংশের নাম লেরিংস; সংস্কৃত নাম স্বরনালী। এই শ্বাস-নলী কণ্ঠার নীচে দুইটী নলে বিভক্ত হইয়াছে। একটা নল বামদিকের ফুস্ফুসে গিয়াছে ও অন্যটা দক্ষিণ দিকের ফুস্ফুসে গিয়াছে। এই নল দুটী দুই ফুস্ফুসে গমন করিয়া অসংখ্য শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া ফুস্ফুসের ভিতর ভিতর গিয়াছে। এই সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম নল দ্বারা ফুস্ফুসের বায়ুকোষের ভিতরে বাতাস যায়। এই গুলির নাম বায়ুনলী বা ব্রংকাইয়েল্ টিউব্।

খাইলে অতিসারগ্রস্ত রোগীর অতিসার ভাল হয়, আবার, কোষ্ঠবদ্ধ রোগীর কোষ্ঠও খোলাসা হয়, সেইরূপ কস্তূরীভৈরব, অবসাদগ্রস্ত হৃদ্‌পিণ্ডকে উত্তেজিত করে, আবার, হৃদ্‌পিণ্ডের অতিরিক্ত উত্তেজনার দমনও করে। অতিসার ও কোষ্ঠবদ্ধতা যেমন অন্ত্রের মেদোধরা কলার

ফুস্‌ফুসের চলিত কথা ফুল্‌কো। ইহারা বুকের দুইদিকে ২টা আছে। প্রত্যেক ফুক্কোর শিরোভাগ কণ্ঠাস্থির এক বা আধ ইঞ্চি উপর পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। দক্ষিণ ফুস্‌ফুসের নিম্নসীমা, ডান্‌দিকের ৬ষ্ঠ বা ৭ম পঞ্জরাস্থি (পাঁজড়ের হাড়) পর্য্যন্ত এবং বাম ফুস্‌ফুসের নিম্নসীমা, বাঁদিকের ৭ম পঞ্জরাস্থি পর্য্যন্ত নামিয়াছে। দুই ফুস্‌ফুসের ভিতর দিকের দুইধার বুকের ঠিক মাঝখানে আসিয়া ঠেকাঠেকি হইয়া মিলিয়াছে।

ফুক্কোর মধ্যে হাজার হাজার বায়ুনলী আছে। আবার, এই হাজার হাজার বায়ুনলী হইতে লক্ষ লক্ষ বায়ুকোষ তৈয়ার হইয়াছে। বায়ুনলী গুলিই সূক্ষ্ম হইয়া বায়ুকোষগুলি তৈয়ার করিয়াছে। এই বায়ুকোষ গুলির গায়ে কোটি কোটি শির, জালের মত ছাইয়া রহিয়াছে। হৃদয় হইতে রক্ত সমস্ত দেহে সঞ্চারিত হইয়া সর্ব্বদা অপরিষ্কার হইতেছে। একবার নিঃশ্বাস ফেলিয়া পুনরায় শ্বাস লইতে যতটুকু সময় লাগে, ইহারই মধ্যে পরিষ্কার রক্ত অপরিষ্কার হইয়া এই ফুস্‌ফুসের বায়ুকোষ গুলির গায়ে ছড়ান সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরগুলির মধ্যে আসিয়া জমে। শ্বাস লইলেই বায়ুনলী গুলির ভিতর দিয়া বাতাস ঢুকিয়া ফুস্‌ফুসের বায়ুকোষ গুলিকে বায়ুপূর্ণ করে। তখন ফুস্‌ফুস্ ও বুক ফুলিয়া উঠে। ইহা নিজেই বুঝিতে পার। নিঃশ্বাস ফেলিলে ফুস্‌ফুসের বায়ুকোষ গুলির বায়ু বহির্গত হইয়া যায় এবং কাজেই বুক নামিয়া পড়ে। রক্তের মধ্যে সাদা ও লাল বিন্দু (শোণিকা) অসংখ্য আছে। এই লাল বিন্দুর মধ্যে (শোণিকার মধ্যে) লৌহের অংশ আছে। এবং এই জন্যই লৌহ-ঘটিত ঔষধ সময় বিশেষে শরীরের পক্ষে অত্যন্ত হিতকর। বাতাসের মধ্যে ৩ প্রকার জিনিষ আছে (১) অক্‌সিজেন্ (২) নাইট্রোজেন্ (৩) কার্ব্বনিক এসিড্ গ্যাস। ইহাদের মধ্যে বাতাসের প্রায় ৫ ভাগের এক ভাগ অক্‌সিজেন্ ও ৪ ভাগের ১ ভাগ নাইট্রোজেন নামক গ্যাস থাকে। বাতাসে কার্ব্বনিক এসিড্ গ্যাস খুব সামান্য থাকে। ২৫ ভাগ বাতাসে মাত্র ১ ভাগ কার্ব্বনিক এসিড্ গ্যাস থাকে। [এই তিনটী জিনিষ ভিন্ন, বাতাসে আরও ৫ প্রকার জিনিষ থাকে, যথা—(১) জলীয় বাষ্প; (২) সামান্য পরিমাণ আর্গন (Argon); (৩) নিয়ন (Neon); (৪)

(শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির) দুর্ব্বলতার পরিচায়ক অর্থাৎ অন্ত্রের মেদোধরা কলা (শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি) দুর্ব্বল না হইলে যেমন অতিসার, কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি, কোনও প্রকারের পেটের ব্যারাম উপস্থিত হয় না এবং বিল্বফল যেমন অন্ত্রের মেদোধরা কলার বল বিধান করে বলিয়াই, অতিসার ও কোষ্ঠ-

---

জিনন (Xenon) ও (৫) ক্রীপটন (Crypton).] জীব জন্তুর ফি নিঃশ্বাসে কার্ব্বনিক এসিড্ গ্যাস তৈয়ার হয়। আর, গাছ গাছড়ার ফি নিঃশ্বাসে অক্সিজেন্ তৈয়ার হয়। বাতাসের মধ্যে যে অকসিজেন্ আছে, তাহার সঙ্গে এই লৌহাংশের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। অক্সিজেন্‌কে সংস্কৃতে বিষ্ণুপদামৃত বা অম্বরপীযূষ বলে। অম্বরপীযূষের কথা পরে বলিতেছি। যেই ফুস্‌ফুসের বায়ুকোষগুলি বায়ুপূর্ণ হয়, অমনি রক্তের লাল বিন্দু সকল উক্ত বায়ুর অক্সিজেন্ টানিয়া লয়। সমস্ত দেহ পরিভ্রমণ করাতে অপরিষ্কার হওয়া বশতঃ রক্ত যে মলিন হইয়াছিল, এই অক্সিজেন্ টানিয়া লওয়াতে তৎক্ষণাৎ শোধিত হইয়া, রক্ত আবার পূর্ব্বের মত টুক্‌টুকে লাল হয়। যতবার শ্বাস গ্রহণ করিবে, ততবারই অপরিষ্কার রক্ত এইরূপে শোধিত হইয়া লাল হয়। এই পরিষ্কার রক্ত সরু সরু শির হইতে ফুস্ফোর খুব বড় একটা শির দিয়া হৃৎপিণ্ডের বাম কুঠরিতে যায়। তৎপরে তথা হইতে পরিষ্কার রক্ত হৃৎপিণ্ড দ্বারা দেহের সর্ব্বত্র চালিত হয়। হৃৎপিণ্ডের ও ফুস্‌ফুসের এই কার্য্য সর্ব্বদা চলিতেছে। মুহূর্ত্তের জন্য বন্ধ হইলেই প্রাণী মরিয়া যায়। বাতাসের মধ্যের অক্সিজেন্ আমাদের পক্ষে প্রাণ স্বরূপ। বাতাসের অক্সিজেন্ আমরা গ্রহণ করি, আর, তৎপরিবর্ত্তে কার্ব্বনিক এসিড্ গ্যাস নামক দূষিত বাষ্প আমরা ত্যাগ করি। কার্ব্বনিক এসিড্ গ্যাস আমাদের পক্ষে বিষ স্বরূপ। কিন্তু, গাছ গাছড়ার পক্ষে আবার কার্ব্বনিক এসিড্ গ্যাস প্রাণ স্বরূপ। গাছ গাছড়ারা কার্ব্বনিক এসিড্ গ্রহণ করিয়া জীবিত থাকে এবং তৎপরিবর্ত্তে অকসিজেন যাহা গাছ গাছড়ার পক্ষে বিষ স্বরূপ, তাহা ত্যাগ করে। রাত্রে গাছ গাছড়ারা অক্সিজেনের সঙ্গে সঙ্গে একটু একটু কার্ব্বনিক এসিড্ও ত্যাগ করে। এই কার্ব্বনিক এসিড্ আমাদের পক্ষে বিষ বলিয়া শাস্ত্রে আছে, "রাত্রৌ চ বৃক্ষমূলানি দূরতঃ পরিসর্পয়েৎ" অর্থাৎ রাত্রে বৃক্ষমূল পরিত্যাগ করিবে। বাতাসের অক্সিজেনকে সংস্কৃতে বিষ্ণুপদামৃত বা অম্বর পীযূষ বলে। বিষ্ণুপদ অর্থ আকাশ। বিষ্ণুপদামৃত অর্থাৎ আকাশে যে অমৃত বা অমৃতবৎ পদার্থ থাকে। অম্বর অর্থ আকাশ এবং পীযূষ অর্থ

বদ্ধতা এই দুইটী পরস্পর বিরুদ্ধ প্রকৃতির ব্যারামের প্রশমন করিতে সমর্থ হয়, কস্তুরীভৈরবও তেমনি হৃদ্‌পিণ্ডের বল বিধান করিয়া উহার ক্রিয়াকে স্বাভাবিক অবস্থায় আনয়ন করে।

মন্তব্য—নিমোনিয়া প্রভৃতির চিকিৎসাও শিক্ষিত চিকিৎসক ভিন্ন অন্যের করা উচিত নহে। এই রোগের শীঘ্র শীঘ্র প্রতিকার করিতে না পারিলে রোগীর সমূহ বিপদের আশঙ্কা আছে। আর, নিমোনিয়া বলিয়াও নহে, সমস্ত রোগেরই প্রথমে সুচিকিৎসা দ্বারা উপশম করিতে না পারিলে

অমৃত। অম্বর-পীযূষ অর্থ আকাশে যে অমৃত থাকে। অর্থাৎ অক্‌সিজেন, বিষ্ণুপদামৃত বা অম্বরপীযূষের ইংরেজী নাম মাত্র। শার্ঙ্গধরে আছে—

"নাভিস্থঃ প্রাণপবনঃ স্পৃষ্ট্বা হৃৎকমলান্তরম্।
কণ্ঠাদ্বহির্বিনির্যাতি পাতুং বিষ্ণুপদামৃতম্॥
পীত্বাচাম্বর পীযূষং পুনরায়াতি বেগতঃ।
প্রীণয়ন্ দেহমখিলং জীবয়ন্ জঠরানলম্॥"

শার্ঙ্গধর, ৫ম অধ্যায় ৪০—৪৪ শ্লোক।

অর্থাৎ নাভিস্থ প্রাণবায়ু, হৃদয় পথের অভ্যন্তর স্পর্শ করিয়া বিষ্ণুপদামৃত পান করিবার জন্য বহির্গত হয় এবং অম্বর-পীযূষ পানান্তে অখিল দেহের প্রফুল্লতা সম্পাদন ও জঠরানলকে জীবিত করিয়া পুনর্ব্বার বেগের সহিত শরীরে প্রবেশ করে। হৃদয়-পথের অর্থ হৃদয়ক্ষেত্রস্থ ফুস্‌ফুস্। সমস্ত বুকের নাম হৃদয়ক্ষেত্র। ফুস্‌ফুসস্থিত নাড়ী দ্বারাই বিশুদ্ধ রক্ত হৃদয়ে যায় বলিয়া ফুস্‌ফুসকে হৃদয়পথ বলে। আদত হৃদয়কে অর্থাৎ হার্টকে, হৃন্মর্ম্ম বলে। উহা পদ্মমুকুলের মত। যেন, ফিন্‌ফিনে চাদর মুড়ি দিয়া উবুড় হইয়া পড়িয়া আছে।

"পুণ্ডরীকেন সদৃশং হৃদয়ং স্যাদধোমুখং।"

ফুস্‌ফুস ও হৃদ্‌যন্ত্রের বিস্তৃত বিবরণ আমাদের অন্য বইতে লেখা হইতেছে। যাহাহউক, ফুস্‌ফুসের মোটা মোটা নলী গুলির প্রদাহ হইলে তাহাকে ডাক্তারিতে ব্রংকাইটিস্ বলে। সরু সরু বায়ুনলী গুলির প্রদাহকে ক্যাপিলারি ব্রংকাইটিস্ বলে। আর, আদত ফুস্‌ফুসের প্রদাহ হইলে নিমোনিয়া বলে। প্রদাহ কাহাকে বলে পরিশিষ্ট দেখ।

পরিণামে সামান্য রোগও কঠিন রোগে পরিণত হইতে পারে। কালী-তন্ত্রে আছে—

"জাতমাত্রং চিকিৎসেত নোপেক্ষ্যাল্পতয়াগদঃ।
বহ্নি শত্রু বিষৈস্তুল্যং স্বল্পোঽপি বিকরোত্যসৌ॥"

অর্থাৎ রোগ জন্মিবা মাত্র তাহার চিকিৎসা করা দরকার। রোগকে সামান্য বলিয়া উপেক্ষা করা সঙ্গত নহে। কারণ, অগ্নি, শত্রু ও বিষের ন্যায় অল্প রোগেও বিকার উৎপাদন করিতে সমর্থ হয়।

শোথাদিতে।

§*§

কনুই ও মণিবন্ধ স্থানে (হাতের কব্জায়) শোথ (ফুলা) প্রকাশ পাইলেই সর্ব্বাগ্রে ও সর্ব্বপ্রযত্নে উহা বসাইবার চেষ্টা করিবে। (১) যেস্থানে ও যেরূপ শোথই উপস্থিত হউক না কেন (ফোঁড়ার সর্ব্বাবস্থায়, নিম্নের লিখিত ঔষধ ইন্দ্রজালের ন্যায় কাজ করে) নিম্নলিখিত প্রলেপ, দিনে ৮।১০ বার ঈষদুষ্ণাবস্থায় শোথের উপর লেপন করিয়া দিলে, ইহাতে শোথ পাকিবার হইলে পাকিবে, বসিবার হয় বসিবে, ফাটিবার হইলে ফাটিবে এবং শুকাইবার হইলে শুকাইবে। অর্থাৎ শোথের যে অবস্থাই হউক না কেন, এইপ্রলেপটী দিলে, নিশ্চয় ফল পাইবে। ইহা অতি প্রসিদ্ধ ঔষধ। শাস্ত্রে আছে—

"তিলবদ্ যবকল্কন্তু কেচিদাহুর্ম্মনীষিণঃ।
শময়েদবিদগ্ধঞ্চ বিদগ্ধমপি পাচয়েৎ।
পক্কং ভিনত্তি ভিন্নঞ্চ শোধয়েদ্রোপয়েৎ তথা॥"

সুশ্রুত।

"তিলবদ্যবকল্কঃ অর্থাৎ তিলযুক্ত যবের কল্ক।"

(জেজ্জড় ও গয়দাস।)

অর্থাৎ তলযুক্ত যবের কল্ক অপক্ক শোথকে বসাইয়া দেয়, বিদাহযুক্ত শোথকে পাকাইয়া দেয়, পাকা শোথকে ভেদ করে এবং ভিন্ন শোথকে শোধন ও রোপণ করে। আমরা সচরাচর নিম্নলিখিতরূপে উক্ত প্রলেপ দিয়া বিশেষ ফল পাইয়া থাকি যথা—কৃষ্ণতিলের শাঁস ও যবের শাঁস, সমান ভাগে প্রয়োজন মত ওজন করিয়া লইবে। পরে উহা উৎকৃষ্ট মধুসহ বাটীয়া (জল না দিয়া বাটীয়া) প্রলেপ দিবে। প্রলেপ ২ অঙ্গুলি পুরু করিয়া দিতে হয়। দিনে ২ বার প্রলেপ দিবে। রাত্রে প্রলেপ দিতে নাই। প্রলেপের নিয়মাদি পূর্ব্বেই একবার উল্লেখ করিয়াছি। (২) কর্ণমূল কি বগল ফুলিলে, টাবা নেবুর ফল বা শিমূল গাছের আঠা বাসি হুকার জলে বাটীয়া, দিনে ৩৷৪ বার প্রলেপ দিবে। (৩) শোথ যদি রক্তপীতাভ ও কোমল হয় এবং উহাতে জ্বালা থাকে, আর, উহা স্পর্শ করিতেও যদি রোগী যন্ত্রণা বোধ করে, তবে, নিম্নলিখিত প্রলেপ দিনে ৩৷৪ বার দিলে উহা বসিয়া যাইবে। যথা—ঈষৎ ভাজা কৃষ্ণতিল গরম দুগ্ধে ফেলিবে। যে পরিমাণ দুগ্ধে ফেলিলে, তিল ও দুগ্ধ একত্র বাটীলে প্রলেপটি ঘন হয়, তাবৎ পরিমাণ দুগ্ধে ফেলিবে। তৎপর, দুগ্ধ ও তিল উত্তমরূপে বাটীয়া শোথস্থানে পুরু করিয়া প্রলেপ দিতে হয়।

মন্তব্য—রোগীকে অত্যধিক শৈত্যক্রিয়া করাইলেই প্রায়শঃ এই সকল উপসর্গের উৎপত্তি হইয়া থাকে। আবার, অত্যন্ত রুক্ষক্রিয়া (শুষ্ক বা কর্ষণ ক্রিয়া) করিলে মাথা ঘোরে এবং অতিসার ও দুর্ব্বলতা উপস্থিত হয়। উপবাস করা, স্নান বন্ধকরা, রুটী প্রভৃতি শুষ্ক জিনিষ খাওয়াকে রুক্ষ বা শুষ্ক ক্রিয়া বলে। আর, ঠাণ্ডা সরবৎ পান, স্নান করা, গায়ে ঠাণ্ডা প্রলেপাদি দেওয়াকে শৈত্যক্রিয়া বলে।

বসন্ত পাকিলে পর কি করিবে ?

পাকিবার সময় নিম্নলিখিত পাচন খাওয়াইতে হয়। পাকিবার সময় কেহ কেহ অন্য পাচনের পরিবর্ত্তে শুধু এই পাচনই ব্যবহার করিয়া থাকেন, যথা—গুলঞ্চ, যষ্টিমধু, কিস্‌মিস্‌, ইক্ষুমূল, দাড়িম-বীজ, সর্ব্বশুদ্ধ মোট ২ তোলা, জল ।৷৹ আধসের ও শেষ আধপোয়া, পূর্ব্ববৎ পান করিতে দিবে। ইহাতে শরীরের দূষিত রক্ত পূয়ঃভাবাপন্ন হইয়া সত্বর বহির্গত হয় অর্থাৎ বসন্তের গুটিকা শীঘ্র শীঘ্র পাকে এবং বায়ু বৃদ্ধি হয় না।

পক্ক গুটিকাসকল ধারাল সূঁচ বা কণ্টকাদি দ্বারা ভেদ করিয়া পূয়ঃ নিঃসারণ করতঃ খদিরাষ্টক পাচন দিয়া ধৌত করিয়া দিবে। কেহ কেহ বলেন যে, কণ্টক দ্বারা ভেদ করিয়া পূঁজ বাহির করা বড়ই কষ্টকর ব্যাপার, আর, না করিলেও বিশেষ অনিষ্ট হইবার কোন আশঙ্কা নাই। কারণ, বসন্তের পূঁজ শরীর মধ্যে প্রবেশ করে না, উহা শুষ্ক ও সংযত হইয়া (জমাট বাঁধিয়া) চুম্‌টীর (খোসের) সঙ্গে উঠিয়া যায়। কেহ কেহ বলেন যে, বসন্ত পাকিলে গালিয়া নিমছালের ক্বাথে ধুইবে, নিমছালের চূর্ণই ঘায়ে দিবে, আর, নিমছাল বাটীয়া ঘৃতসহ মিশ্রিত করিয়া ঘায়ের উপরে প্রলেপ দিবে। এই ব্যবস্থা সহজলভ্য ও বিশেষ উপকারক। গরিব রোগীর পক্ষে ইহা সকল প্রকারেই ভাল। কেহ কেহ বলেন, বসন্ত-ক্ষতে হলুদচূর্ণ, মাখম সহ মিশাইয়া প্রলেপ দিলে উহা শুকাইয়া যায় ও দাগ পড়ে না। এইটীও সহজলভ্য ও বিশেষ উপকারক। কাঁটাদেওয়া সম্বন্ধে কাহারও কাহারও মত এই যে, যথাসময়ে বসন্ত কাঁটা দিয়া গালিয়া দিলে বসন্তের দাগ প্রায় হয় না। পূঁজ বদ্ধ হইয়া অধিক ক্ষত হইলে বসন্তের দাগ পড়ে। পাকিবার সময় রোগী ২।১ দিন কথঞ্চিৎ যন্ত্রণা বোধ করে। এই সময়ে রোগী সচরাচর নিদ্রা যাইতে ভাল বাসে। পক্কাবস্থায়, হরিদ্রাচূর্ণ শীতলজলে

গুলিয়া অথবা কাঁচা হরিদ্রার রস লইয়া গায়ে দিবে। কতকগুলি গুটিকা আপনিই গলিয়া যায়। যেগুলি না গলে, তাহাদের মধ্যে কাঁটা প্রয়োগ করিবার জন্য, খেজুরকাঁটা, বাব্‌লাকাঁটা বা ধারাল ও সূক্ষ্মাগ্র সূঁচ ব্যবহৃত হয়। শুশ্রূষাকারী খুব সাবধানে দক্ষিণ হস্তে সূঁচ ধরিয়া গুটিকা গালিয়া দিয়া, বাম হস্তে পরিষ্কার নেকড়া বা তুলা লইয়া, তদ্দারা পূয়াদি পরিষ্কার করিয়া লইয়া তৎক্ষণাৎ ঐ স্থানে হরিদ্রাচূর্ণ পূর্ণ করিয়া দিবেন। এইরূপে কাঁটা দ্বারা গালিয়া দেওয়াকে "কাঁটা দেওয়া" বলে। সাবধান, শুশ্রূষাকারীর হস্ত যেন কোন স্থানে কর্ত্তিত না থাকে। এই পূয়ঃ শুশ্রূষাকারীর রক্তের সহিত মিলিলে তাঁহার টিকা দেওয়ার কাজ হইয়া যায় অর্থাৎ তাঁহারও যে বসন্ত বাহির হইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কাঁটা দিয়া গালিয়া উক্তরূপে পূঁজ নিঃসারণ করিলে রোগী খুব আরাম বোধ করে এবং ক্ষত গুলিও শীঘ্র শীঘ্র শুষ্ক হয়।

বিকারাবস্থায় বসন্ত পাকিলে কি করিবে?

———§*§———

বিকারাবস্থায় বসন্ত পাকিয়া উঠিলে, কদাচ কাঁটা দিয়া বসন্ত গালিয়া তন্মধ্য হইতে পূঁজ নির্গত করিবে না। বিকারাবস্থায় মৃগনাভি, মকরধ্বজ সহ, দরকার হইলে, প্রয়োগ করিবে। মৃগনাভি গাওয়া ঘৃতে অল্প ভাজিয়া লইতে হয়। গলা ঘড়্ ঘড়্ করিতে থাকিলে স্বল্পলক্ষ্মীবিলাস, রসসিন্দুর ও মৃগনাভি একত্র দিতে পার। শুধু স্বল্পলক্ষ্মীবিলাস ও রসসিন্দুরও দিতে পার। গলা ঘড়্ ঘড়ির সঙ্গে জ্বর থাকিলে মসূরের যূষ পথ্য দিবে।

মন্তব্য—উপরে আমরা "দরকার হইলে প্রয়োগ করিবে" এই কথা লিখিয়াছি। পূয়ঃ অবস্থার বিকারাদিতে রোগী খুব দুর্ব্বল থাকে, যেন নেতিয়ে পড়ে, নাড়ী সূক্ষ্ম হয় ও শ্লেষ্মার প্রাবল্য হয়, এই অবস্থায় মৃগ-

নাভি উত্তেজক হইয়া উপকার করে। রসসিন্দুর, বায়ু, পিত্ত ও কফ তিনেরই সমতা স্থাপন করে। "নাড়ীর বেগ সূতার মত সরু অথচ দ্রুত হইলে মৃত্যু নিকটে আসিতেছে বলিয়া মনে করিতে হয়। এরূপ স্থলে চোখ্ চাওয়া থাকিলে মৃগনাভি, কর্পূর ও আফিং দিবে। চক্ষু মুদ্রিত থাকিলে মৃগনাভি, কর্পূর ও ধূতরাবীজ দিবে। মৃগনাভির মাত্রা ২ বা ২॥০ আড়াই রতি (৪।৫ গ্রেণ), কর্পূরের মাত্রা অর্দ্ধ রতি (১ গ্রেণ), ধূতরাবীজ চূর্ণ এক রতির ৮ ভাগের এক ভাগ বা শিকি গ্রেণ। প্রথম-স্থলে কস্তুরীভৈরব ও শেষোক্তস্থলে লক্ষ্মীবিলাস ১ বড়ি + রসসিন্দুর + মৃগনাভি ঐ ঐ মাত্রায় একত্র করিয়া দেওয়া যায়।" আদার রস ও মধু সহ দিবে। মসূরের যূষ মাংসের ন্যায় বলকারক, লঘুপাক অর্থাৎ সহজে হজম হয়, জ্বরঘ্ন ও শ্লেষ্মার পক্ষে পরম উপকারী। যাহাহউক, সান্নিপাতিক বিকারাদিতে কোন শিক্ষিত সুচিকিৎসকের উপরই রোগীর চিকিৎসার ভার দেওয়া উচিত। চরকে আছে—"সন্নিপাতো দুশ্চিকিৎসিতানাম্" অর্থাৎ দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধির মধ্যে সান্নিপাতিক বিকারাদি শ্রেষ্ঠ। ভালুকি তন্ত্রেও আছে, "মৃত্যুনা সহ যোদ্ধব্যং সন্নিপাতং চিকিৎসতা" অর্থাৎ সান্নিপাতিক বিকারাদি চিকিৎসায় চিকিৎসককে সাক্ষাৎ যমের সহিত যুদ্ধ করিতে হয়। কাজেই, ঐরূপ চিকিৎসায় শিক্ষিত চিকিৎসক ভিন্ন অন্যের হস্তে চিকিৎসার ভার দেওয়া ভাল নয়।

মুখে ও কণ্ঠে বসন্ত জন্য ক্ষত হইলে কি করিবে?

——§*§——

মুখে ও কণ্ঠে বসন্তজন্য ক্ষত হইলে আমলকী ২ তোলা, যষ্টিমধু ২ তোলা, জল ৵১ সের, শেষ ৴।০ একপোয়া, ছাঁকিয়া গরম থাকিতে থাকিতে বার বার কুল্লী (কুলকুচা) করিবে। কুল্লীর জল যেন মুখের ভিতর

সমস্ত স্থানে ও কণ্ঠে ভালরূপে লাগিতে পারে, এরূপ ভাবে কুল্লী করিবে। ইহা দ্বারা মুখ ও কণ্ঠস্থ ক্ষতাদি শীঘ্র শুষ্ক হয়। কেহ কেহ নিম্নলিখিত পাচনের গণ্ডুষ ধারণ করিতে বলেন। যথা—জাতি (চামেলী) ফুলের পাতা, মঞ্জিষ্ঠা, দারুহবিদ্রা, সুপারি, শমী বা শাঁইবাবলা গাছের ছাল, আমলকী ও যষ্টিমধু যথাপ্রাপ্ত সংগ্রহ করিয়া, প্রত্যেক দ্রব্য ১ তোলা লইয়া /১॥০ দেড়সের জলে সিদ্ধ করিয়া, আধসের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। এই পাচনের গণ্ডুষ ধারণ করিতে হয়। অথবা অনন্তমূল, আমলকী, বেণার মূল ও মুথা, ইহাদের ক্বাথ (পাচন) দ্বারা কবল করিবে।

ক্ষতে অসহ্য চুলকণা হইলে কি করিবে ?

————§*§————

শরীরের স্থানে স্থানে অনেকগুলি পিড়কা ফাঁটিয়া গিয়া ক্লেদযুক্ত ব্রণের ন্যায় হইলে, ঐ ব্রণোপরি (১) পঞ্চবল্কল-চূর্ণ অবচূর্ণন করিবে অর্থাৎ ক্ষতোপরি ছড়াইয়া ছড়াইয়া দিবে। বসন্তের ক্ষতে অধিকতর পূঁজ হইলে ও ক্ষতে অসহ্য চুলকণা হইলে, ইহাদ্বারা নিবৃত্ত হয় ও ক্ষত-স্থান ঠাণ্ডা থাকে। (২) নিমছালচূর্ণও অবচূর্ণন করিতে পার। ইহাতেও একই ফল হয়। (৩) নাইলতা পাতার (পাটপাতার) গুড়া, মসূর কলায়ের চূর্ণ (মসূর ডাইলের চূর্ণ) ও খড়িমাটির গুড়া, সমানভাগে মিশাইয়া ক্ষতের উপর ঐ ভাবে দেওয়া যায়। এই সকল ঔষধদ্বারাও পঞ্চবল্কল চূর্ণের মত কাজ পাওয়া যায়। পঞ্চবল্কল চূর্ণ সম্বন্ধে পরিশিষ্ট দেখ।

মলদ্বারে বসন্ত।

——§*§——

গুহ্যদ্বারের ভিতরে বসন্ত হইলে মল ত্যাগ করিতে (বাহ্য করিতে) কষ্ট হয়। (১) বসন্তের অপক্কাবস্থায়, করল্লা বা উচ্ছে পাতার রস ও কাঁচা হলুদের রস একত্র করিয়া লাগাইবে। পক্কাবস্থায় সর্ব্বদা মাখম লাগাইবে।

কাণ পাকিলে কি করিবে ?

——(*)——

(১) কর্ণের ভিতরে বসন্ত হইয়া কাণ পাকিলে, ঈষদুষ্ণ জলের পিচ্‌কারী করিয়া কাণ ধুইয়া শম্বুকাদি তৈল প্রয়োগ করিবে অর্থাৎ উক্ত তৈল কয়েক ফোঁটা কর্ণের ভিতরে দিয়া তুলাদ্বারা বন্ধ করিয়া রাখিবে। কেহ কেহ বলেন, গরম দুগ্ধ ও জল মিশাইয়া ঈষদুষ্ণাবস্থায় লইয়া, তদ্দ্বারা পিচ্‌কারী সহযোগে কাণ ধুইতে হইবে ও পরে শম্বুকাদি তৈল প্রয়োগ করিবে। (২) কেহ কেহ বলেন, কাঁচা ফিট্‌কারী বেশ করিয়া মিহি গুড়া করিয়া ও পুরু কাপড়ে ছাঁকিয়া, কর্ণ মধ্যে ছড়াইয়া ছড়াইয়া উহার কতকটা গুড়া দিবে। ইহাতে বিশেষ ফল হয়। আমি নিজে পরীক্ষা করিয়াও ফল পাইয়াছি।

সর্ব্বশরীর কাঁকুড়ের ন্যায় ফাঁটিয়া ক্লেদ নির্গত হইলে।

——§*§——

এইরূপ অবস্থা হইলে রোগীর আরোগ্যের আশা খুব কম। যাহা-হউক, এই অবস্থায় (১) পঞ্চবল্কল-চূর্ণ অবচূর্ণন করিবে। (২) ঘা অপেক্ষাকৃত গভীর ও বিস্তৃত হইলে উননের পোড়ামাটী, ভাঙ্গা-পাথরের

গুড়া ও নিমপাতা খোলায় ভাজিয়া তাহার চূর্ণ, সমভাগে মিশাইয়া ও পুরু কাপড়ে ছাঁকিয়া, ফাঁটা স্থানে দিবে। রোগীর শরীরে অতিরিক্ত স্ফোটক উদ্‌গত হইলে, অথবা ফাঁটিয়া ক্ষত হইলে, বিছানার উপর কদলী বা মাণকচুর কচিপাতা পাতিয়া, তাহার উপর রোগীকে শয়ন করিতে দিবে। বসন্ত পাকিয়া গেলে ক্ষতের পূয়ঃ ভক্ষণের জন্য মাছি ও পিপীলিকাদির (পিপ্‌ড়ার) উপদ্রব হয়। রোগীকে পরিষ্কার মশারির ভিতরে রাখিলে, মাছির এবং বিছানার চারিদিকে হরিদ্রা-চূর্ণ ছড়াইয়া দিলে পিপ্‌ড়ার উপদ্রব থাকে না।

বসন্তে কীট জন্মিলে কি করিবে ?

বসন্তের ক্ষতমধ্যে কীটাদি উৎপন্ন হইলে (১) বটের আঠা, কাশির চিনি সহ মিশাইয়া ক্ষতমুখে অল্প পরিমাণে প্রলেপ দিলেই ক্রমে কীটগুলি মরিয়া যাইবে ও ক্ষত শুষ্ক হইবে। (২) নিমপাতার গুড়া বা হরিদ্রার গুড়া দ্বারা ক্ষতপূর্ণ করিয়া ১ দিন রাখিয়া, নিম্নলিখিত ঘৃত বা তৈলের কোন একটী ব্যবহার করিলেই ক্ষত শুষ্ক হইবে।

মন্তব্য—আগাগোড়া এই পুস্তকের উপদেশ মত রোগীর চিকিৎসা হইলে, বসন্তক্ষতে কীটাদি উৎপন্ন হইবে না। তবে, তোমাকে যে রোগী প্রথমাবস্থাতেই চিকিৎসার জন্য ডাকিবে এমন কোন কথা নাই। রোগীর যে অবস্থাতেই তোমাকে ডাকুক না কেন, সেই অবস্থারই চিকিৎসা করিবে।

ঘৃত।

——§*§——

লুচিভাজা ঘৃত, কর্পূর, গাঁজা, মনছাল (মনঃশিলা), পেতোকরা চাউলমোগড়ার বীজ, এই কয়েক বস্তু অনুমানে অল্প অল্প দিয়া, পাক করিয়া বেশ ভাজা ভাজা হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। এই ঘৃত অল্প গরম করিয়া তুলাদ্বারা বারে বারে ক্ষতের উপর দিতে হয়।

মন্তব্য—ইহা নিতান্তই হাতুড়ে ব্যবস্থা সন্দেহ নাই। অশিক্ষিত বসন্ত চিকিৎসকদের মধ্যে অনেকেই আন্দাজে এইরূপ ভাবে ঔষধাদি প্রস্তুত করেন। এখন রোগীর কপাল, আর, চিকিৎসকের হাতযশ!!! শাস্ত্রে আছে—

"প্রাণাঃ প্রাণভৃতামন্নং তদযুক্ত্যা নিহন্ত্যসূন্।
বিষং প্রাণহরং তচ্চ যুক্তিযুক্তং রসায়নম্॥"

নিদানম্।

অর্থাৎ যে অন্ন জীবগণের প্রাণস্বরূপ, সেই অন্নও অবিধিপূর্ব্বক সেবিত হইলে প্রাণনাশক হয়। প্রাণনাশক বিষও যদি যুক্তিপূর্ব্বক সেবিত হয়, তবে রসায়ন অর্থাৎ জরাব্যাধি নাশক হইয়া থাকে। যে ঔষধ যত উপকারী, ব্যবহারের দোষে সেই ঔষধ তত অপকারী হইয়া থাকে।

কেহ কেহ নিম্নলিখিত তৈল ব্যবহার করেন, যথা—

তিল তৈল ৵॥ আধসের।
গোমূত্র ৶১০ আড়াই ছটাক।
কেশুত্তের রস ৶১০ ,, ।
গুলঞ্চের রস ৵০ তিনছটাক।

তৈল সহ এই সমস্ত দ্রব্য অল্প অল্প জ্বালে পাক করিবে ও জল শুষ্ক হইলে নামাইবে। কড়াই হইতে খুন্তী দ্বারা একটু তৈল লইয়া আগুণে নিঃক্ষেপ করিলে যদি ছড়্ ছড়্ প্রভৃতি কোন্ প্রকার শব্দ না করিয়া দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে, তবে তৈলে জলের অংশ নাই বলিয়া বুঝিবে এবং তখন নামাইবে। খুব কড়া পাক ভাল নহে, আবার, জল সত্ত্বে নামাইলেও তৈলেব গুণ থাকে না।

কেহ কেহ নিম্ন লিখিত তৈল ব্যবহাব কবেন যথা—

তিল তৈল /৪ সেব।
কমলাগুড়ি /৷ পোয়া
বিড়ঙ্গ /৷ ,,
দারুহরিদ্রা /৷ ,,
কবঞ্জা ফল /৷ ,,

উপবোক্ত জিনিষ গুলি জলসহ বেশ করিয়া বাটীয়া লইবে। কড়াইয়ে তৈল দিয়া মৃদু মৃদু জ্বাল দিবে। নিফেন হইলে, কড়াই উনন হইতে নামাইবে। তৈল ঠাণ্ডা হইলে, ঐ পিষ্টকল্ক (ঐ বাটা পদার্থকে আয়ুর্ব্বেদে কল্ক বলে) তৈলের মধ্যে দিবে ও উহাদের সহিত ১৬ সের জল মিশাইয়া একত্র দস্তুরমত জ্বালে (কাঠের জ্বালে) তৈল জ্বাল দিবে। জল প্রায় শেষ হইয়া আসিলে, কড়াই নামাইয়া নূতন অথচ শক্ত গামছা দ্বাবা ছাঁকিয়া লইবে। পরে আবাব ঐ জলমিশ্রিত তৈল, জ্বালে চড়াইবে। সম্পূর্ণ জল নিঃশেষ হইল কি না তাহা যেরূপে পরীক্ষা করিতে হয়, তাহা এই মাত্র বলিয়াছি। সেইরূপে পরীক্ষা করিয়া নামাইবে। পাক শেষ হইয়া আসার সময় অনবরত হাতা দ্বারা (তাড়ু দ্বারা) কড়াইয়ের তলা নাড়িবে, নতুবা তলায় কল্ক ধবিয়া যাইতে পাবে। কড়াই নামাইয়া তৈল ছাঁকিয়া লইবে। এই তৈলটী চবকে আছে। ইহা বসন্ত-ক্ষতের খুব ভাল ঔষধ।

কোন কোন চিকিৎসক নিম্নলিখিত তৈল ব্যবহার করেন যথা—

তিল তৈল
ডাল করঞ্জার ফল
চাউলমোগড়া বীজ
আফিং
বুচ্‌কী দানা
গন্ধক

এই দ্রব্যগুলি কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দিয়া ও গিমা শাকের রস তিল তৈলের সমান লইয়া, সকল দ্রব্য একত্র জ্বাল দেন। বুচ্‌কীদানা, আফিং প্রভৃতি বাটীয়া তৈল সহ জ্বাল দিতে হয় এবং জল শুষ্ক হইলে ও ঐ সকল দ্রব্য ভাজা ভাজা হইলে তৈল নামাইয়া ছাঁকিয়া ব্যবহার করিতে হয়।

মন্তব্য—এই তৈলের দ্বারা অনেক অশিক্ষিত বসন্ত চিকিৎসক চিকিৎসা করিয়া থাকেন। তৈলের মধ্যে বুচ্‌কীদানা ও আফিং প্রভৃতি বিষাক্ত পদার্থ আছে, অথচ কোন্ দ্রব্য কি পরিমাণে লইতে হইবে তাহার বিধান নাই। তৈল পাকের সাধারণ বিধিও অনুসরণ করা যায় না, কারণ, "কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দিয়া" এইরূপ বিধানও ইহাতে রহিয়াছে। এই সমস্ত তৈল ব্যবহার না করাই মঙ্গল। যেহেতু, কোন কোন স্থলে ইহা-দের দ্বারা উপকার হইলেও অনেক স্থলেই অনিষ্ট হইতে পারে। সেই জন্যই চরক বলিয়াছেন যে "বিনাতর্কেন যা সিদ্ধির্যদৃচ্ছা সিদ্ধিরেব সা।" চিকিৎসা যুক্তিমূলক হওয়া দরকার। ঔষধে আরাম হওয়া এক কথা, আর, সেই ঔষধপ্রয়োগাদি যুক্তিমূলক কিনা, তাহা আর এক কথা। ঋষিগণ ত্রিকালদর্শী, তপোবলসম্পন্ন ও পরমজ্ঞানী ছিলেন সত্য এবং তাহাদের প্রণীত শাস্ত্রাদি, তা, চিকিৎসা শাস্ত্রই বল, আর অন্য শাস্ত্রই বল, যে অভ্রান্ত তাহাও সত্য, কিন্তু, আজকাল অনেকে ঋষি নামের দোহাই

দিয়া যা তা করিয়া, ঋষিদিগকে, শাস্ত্রকে ও নিজদিগকেও কলঙ্কিত করিতেছে। আর, ঋষি নামের এমনিই মাহাত্ম্য—সমাজে ঐ নামের এতই প্রভুত্ব যে, ঋষির নাম শুনিলেই লোকে আত্মহারা হইয়া যা তা চিকিৎসা গ্রহণ করিতেছে ও যা তা ঔষধ সেবন করিতেছে। আর একদিকে আবার, ঋষি মাহাত্ম্য বুঝিয়াই হউক, আর, না বুঝিয়াই হউক, অনেকে ঋষিদিগের অতিরিক্ত প্রশংসা করিতে গিয়াও উঁহাদিগকে অনেকের চক্ষে হেয় করিয়া তুলিতেছেন। "Greatmen Suffer more from their little friends than from their potent enemies." Landor. অর্থাৎ ঘোরতর শত্রু হইতে বড় লোকদের যত অনিষ্ট না ঘটে, তাঁহাদের নির্ব্বোধ বন্ধুদিগহইতে তদপেক্ষা বেশী অনিষ্ট ঘটে। আবার, এরূপও অনেককে দেখা যায় যে, ঋষিদের প্রণীত গ্রন্থাদি আদৌ পাঠ করেন নাই, পাঠ করিয়াছেন ত উহার মর্ম্ম অবধারণ করিতে সমর্থ হন নাই, অথচ, অযথা ঋষিদের নিন্দা করিয়া থাকেন। তাই মহাকবি কালিদাস বলিয়াছেন—

"অলোকসামান্য্যমচিন্ত্যহেতুকম্।
দ্বিষন্তি মন্দাশ্চরিতং মহাত্মনাম্॥"

(কুমার সম্ভবম্।)

অর্থাৎ মহাত্মাদিগের চরিত্র অলোকসামান্য (সাধারণ লোকদের মধ্যে সেরূপ চরিত্র দেখা যায় না) এবং তাঁহাদিগের কার্য্যাদির হেতু অচিন্তনীয় বলিয়া, বুঝিতে না পারায় দরুণ, মূর্খ লোকেরা তাঁহাদের (মহাত্মাদিগের) নিন্দা করিয়া থাকে।

যাহাহউক, শাস্ত্রোক্ত পিণ্ডতৈল ও ইতিপূর্ব্বে "চরকোক্ত" বলিয়া আমরা যে তৈলের উল্লেখ করিয়াছি সেই তৈল, এই দুই তৈলের যে কোন তৈল প্রয়োগ করাই ভাল।

বসন্তরোগীর শৌচকার্য্যের জন্য জল।

——§*§——

বসন্তরোগীব শৌচকার্য্যের জন্য নিম্নলিখিত পাচন ব্যবহার করিবে, যথা—খএর কাঠ ও বহুবাব বৃক্ষের (চাল্‌তা গাছেব) ছাল, মোট ৪ তোলা, জল /১ সের, পাকশেষ /৷৹ তিনপোয়া। অথবা অনন্তমূল, আমলকী, বেণার মূল (ভাল নাম বীবণ মূল। কোন কোন স্থানে ইহাকে বীন্নার মূল বলে। বউন্না নহে, বীন্না। বউন্না বা "বন্ন্যা" গাছকে বরুণ গাছ বলে) ও মুথাব পাচন উক্ত পবিমাণে ও উক্তপ্রকাবে তৈয়াব করিয়া শৌচের জন্য ব্যবহার কবিবে।

আরোগ্য-স্নান।

——§*§——

বসন্ত বাহিব হইবাব ১২ দিন পবে, জ্বব ত্যাগ হইলে ও বসন্তের ঘা শুষ্ক হইলে, নিমপাতা ও হলুদ বাটীয়া সর্ব্বাঙ্গে মালিস করিয়া স্নান করিবে। মোট কথা, ক্ষতগুলির মধ্যে পূঁজ নাই বুঝিলেই স্নান কবা যায়। কেহ কেহ বলেন, নিমপাতার রস, আমরুল শাকের রস, শুষ্ক নাল্‌তে পাতা ভিজান জল ও দধি সমভাগে একত্র মিশাইয়া সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া শীতল জলে স্নান করিবে। কেহ কেহ প্রথম দিনেব স্নানের জল নিম্ন প্রকারে তৈয়াব কবিয়া থাকেন, যথা—কাঠাল পাতা ও নিমপাতা সিদ্ধজল আগের দিন তৈয়ার করিয়া, সমস্ত বাত্রি, অনাবৃত স্থানে রাখিবে, যেন জলের উপব শিশির পড়িতে পারে। পরেব দিন ঐ সমস্ত জিনিষ (নিমপাতাব জল ইত্যাদি) গায়ে মাখিয়া, ঐ বাসি জলে স্নান করিবে। যাহাহউক, আবোগ্য স্নানেব সময়, বোগী, উপদেশেব বড় ধার ধারে না এবং প্রায়ই, আপন ইচ্ছায়, শীতল জলে স্নান করিয়া থাকে।

মন্তব্য—সকলের জানা না থাকিতে পারে, এই জন্য এস্থলে স্নান সম্বন্ধে একটা কথা বলিয়া রাখি। বসন্তরোগ হইতে আরোগ্য লাভ করিয়া ত শীতল জলেই স্নান করিতে হয়। অন্যান্য ব্যারাম হইতে মুক্ত হওয়ার পর যদি গরম জলে স্নান করিবার ব্যবস্থা থাকে, তবে, ফুটন্ত গরম জল ঈষৎ ঠাণ্ডা করিয়া পা হইতে গলা পর্য্যন্ত ধুইয়া ও মাথায় ঠাণ্ডা জল দিয়া স্নান করিতে হয়। এবং ঐ গরম জলই সম্পূর্ণ ঠাণ্ডা করিয়া মাথায় দিতে হয়। উষ্ণজল কদাপি মস্তকে দিবে না। কারণ, "উষ্ণাম্বুনাধঃকায়স্য পরিষেকো· বলাবহঃ। তেনৈব তূত্তমাঙ্গস্য বলহৃৎ কেশচক্ষুষোঃ॥" অর্থাৎ উষ্ণ-জল দ্বারা শরীরের অধোভাগ পরিষেচন করিলে শরীরের বলাধান হয়। কিন্তু, উষ্ণজল মস্তকে দিলে কেশ ও চক্ষুর বলের হ্রাস হইয়া থাকে।

আরোগ্য-স্নানের পর কর্ত্তব্য।

——§*§——

রোগী আরোগ্য-স্নানের পর দুই সপ্তাহ কাল, রৌদ্রভোগ, রাত্রি-জাগরণ, চীৎকার করা ও স্ত্রীসহবাস প্রভৃতি ত্যাগ করিবে। শরীর দুর্ব্বল থাকিলে কিছুদিন পর্য্যন্ত নৃপতিবল্লভ বা নবায়সলৌহ, প্রতিদিন প্রাতে ১টী করিয়া বড়ী, মধু সহ সেবন করিবে।

বসন্তের দাগ মিলান।

——‡*‡——

দাগগুলি প্রত্যহ ডাবের জল দ্বারা ধুইবে এবং উহাদের উপর ভাল তিল তৈল মালিস করিবে। শাঁখের (শঙ্খের) গুড়া ও ডাবের জল একত্র মিশাইয়া মাখিলে বিশেষ উপকার হয়। ঘা শুকাইবার পর, চামড়া কাল হইবার পূর্ব্বেই (অর্থাৎ যখন পর্য্যন্ত চামড়া ঈষৎ লাল থাকে) এই সব প্রয়োগ করিতে হয়। নতুবা ফল হওয়া দুর্ঘট।

বসন্ত পাকিলে পর পথ্য।

——§•§——

বসন্ত পাকিতে আরম্ভ করিলে বায়ুর রুক্ষতা বৃদ্ধি পায়। তজ্জন্য বৃংহণ বা বলকারক পথ্য দ্বারা বায়ুর রুক্ষতা প্রশমন করা দরকার হয়। কারণ, রুক্ষ বায়ু কোন কোন স্থলে পচ্যমান (পাকিতেছে যাহা) ও পক্ক বসন্তগুটিকা গুলিকে শুষ্ক করে। ইহাতে গুটিকার মধ্যগত পূয়াদি নিঃসৃত হইতে না পারাতে, বিকারাদি আসিয়া উপস্থিত হয়। এই অবস্থায় রোগীর মৃত্যু হইলে, উহাকেই চলিত ভাষায় "বসন্তের টানের সময় মারা গেল" বলে।

"পাককালেতু সর্ব্বান্তা বিশোষয়তি মারুতঃ।
তস্মাৎ সংবৃংহণং কার্য্যং নতু পথ্যং বিশোষণং॥"

চক্রদত্তঃ।

অর্থাৎ মসূরিকার পাক কালে, বায়ু দূষিত হইয়া পুঁজ সকল শুষ্ক করে, অতএব ইহাতে বৃংহণ অর্থাৎ যাহাতে শরীর স্নিগ্ধ থাকে, এইরূপ কার্য্য করিবে, কোন প্রকার শোষণকারক পথ্য বিধান করা কর্ত্তব্য নয়। এই অবস্থায় (গুটিকার পাক কালে) যে পাচন সেবন করিবার কথা বলা হইয়াছে, উহা রোগীর পক্ষে বিশেষ হিতকর জানিবে। উহা পানে বসন্তগুটিকা শীঘ্র পাকে এবং বায়ু ঐরূপ কুপিত হইতে পারে না। পাচনটী বিশেষ উপকারক বলিয়া পুনরায় এখানে উহার উল্লেখ করা গেল, যথা—গুলঞ্চ, যষ্টিমধু, কিস্‌মিস্, ইক্ষুমূল ও দাড়িমবীজ, এই সকলের কাথ (পাচন) এখগুড় আধতোলা প্রক্ষেপ দিয়া (পাচন সহ মিশাইয়া) পান করিবে। যাহাহউক, বসন্ত পাকিতে আরম্ভ করিলে, মাংসযূষ ও খই, দাড়িম রস সহ দিবে। রোগীর অরুচি থাকিলে মাংসযূষ সহ দাড়িমরস মিশাইয়া সেবন করাইলে রোগীর বিশেষ উপকার হয়। কেহ কেহ গুটিকা

বাহির হইবার পূর্ব্বে, অধিক জ্বরাবস্থায়, জল সাগু, বার্লি, শটীরপালো, এরারুট, মুগের যূষ, মসূরযূষ প্রভৃতি ও জ্বর কমিলে ,অথচ, গুটিকাগুলির অপক্কাবস্থায়, সরু ও পুরাতন চা'লের ভাত, পল্‌তা, হিংচা (হেলেঞ্চা), উচ্ছে (উইস্তা), কাঁকরোল ও একবল্কা দুগ্ধ দেন। জল খাবার জন্য কালজাম ও গোলাবজাম প্রভৃতি দিয়া থাকেন। গুটিকা পাকিলে, সরু চা'লের ভাত, কাচকলা, মাণ, ওল,পটোল ও সজ্‌নাথাড়া প্রভৃতির ঘৃতপক্ক ব্যঞ্জন, মুগের ডালের ঝোল প্রভৃতি আহার দেন। শুষ্কাবস্থায় মসূরের যূষ, মানকচু, কাচকলা,ওল,পটোল ও ডুমুর প্রভৃতির ঘৃতপক্ক ডাল্‌না দিয়া থাকেন। কাহারও কাহারও মত এই যে, বসন্তের কোন অবস্থাতেই মাংস ও মাংসযূষ প্রভৃতি পিত্তবর্দ্ধক জান্তব খাদ্য দেওয়া ভাল নয়। চলিত-মতে, মৎস্য ও মাংস প্রভৃতি বসন্তকালে খাওয়া নিষিদ্ধ। প্রচলিত মতে চৈত্রমাসে শিম (ছিমড়া) খাইতে নাই। চৈত্রমাসে শিম ভক্ষণ করিলে বসন্তরোগ জন্মে।

সাধারণ পাচনদ্বারা বসন্তের চিকিৎসা।

বসন্ত রোগের প্রথম বারের জ্বরের ভোগ ৯৬ ঘণ্টা বা ৪ দিন। তন্মধ্যে ৭২ ঘণ্টা অর্থাৎ ৩ দিন জ্বর ভোগের পর, বসন্ত বাহির হইতে থাকে। কেহ কেহ প্রাথমিক জ্বরের এই ৭২ ঘণ্টা বা ৩ দিন জ্বর ভোগের পর হইতে রোগের শেষাবস্থা পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত পাচন দিয়া চিকিৎসা করিয়া থাকেন, যথা—ক্ষেতপাপড়া ১ তোলা, চিরতা ১ তোলা,পল্‌তা ১ তোলা, বাকস ছাল ॥০ আধতোলা, মুথা ॥০ আধতোলা, ধনে ॥০ আধতোলা, অনন্তমূল ১ তোলা, রক্তচন্দন ॥০ আধতোলা, বালা ।০ শিকিভরি, কুড়

॥॰ আধতোঁলা ও নিমছাল ॥॰ আধতোলা লইয়া দ্রব্য সমষ্টির ১৬ গুণ জলে জাল দিয়া, জলের চতুর্থাংশ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া, ২ ঘণ্টা অন্তর ৻১॰ আধছটাক করিয়া পান করিতে দেন। আর, রোগীর কাশি থাকিলে, উক্ত পাচন সহ শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, যষ্টিমধু ও তেজপাতা প্রত্যেক ।॰ শিকি-ভরি লইয়া কুট্টিত করিয়া (থেতো করিয়া), উক্ত নিয়মে জাল দিয়া পান করিতে দেন। এই পাচন সেবনে, রক্ত পরিষ্কার হয়, জ্বর ত্যাগ হয়, অগ্নি বৃদ্ধি হয়, রক্ত ও পিত্তের প্রকোপ শান্ত হয়, কোষ্ঠ খোলাসা থাকে এবং গায়ের জ্বালাপোড়া ও পিপাসা প্রভৃতি বিদূরিত হইয়া বসন্তসকল নির্ব্বিকার হয়। প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত শুধু এই পাচন দিয়া চিকিৎসা করিতে হয়। অবশ্য, অন্যান্য উপসর্গ উপস্থিত হইলে, সঙ্গে সঙ্গে তাহাদেরও চিকিৎসা করিতে হইবে।

ছাত্রের প্রতি উপদেশ।

—§*§—

বসন্ত রোগীকে ঔষধাদি কমই খাওয়াইতে হয়। সচরাচর, দৈনিক একটী পাচন ও মকরধ্বজ ১ বার কি ২ বার প্রয়োগ করিলেই যথেষ্ট হয়। তবে, ছোব্ প্রলেপাদির মধ্যে, রোগীর অবস্থানুযায়ী বাছিয়া লইয়া ২।১টী প্রয়োগ করিবে। আমরা নানা জনের নানা মতের চিকিৎসা প্রণালী ও ঔষধাদির সংগ্রহ করিয়া এখানে দিলাম এবং বসন্তের চিকিৎসার ধারা ও সাধারণ প্রণালীরও উল্লেখ করিলাম। হয়ত এক বমন নিবারণের জন্যই ২।৩ প্রকারের ঔষধ আছে। কিন্তু, সকল ঔষধই যে এক সময়ে এক রোগীতে প্রয়োগ করিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। যেটী সহজে পাওয়া যায় ও যেটী যাঁহার অবস্থানুযায়ী উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে, তাঁহাকে সেইটীই প্রয়োগ করিবে। কোন্‌টী কাহাকে প্রয়োগ

করিতে হইবে, তাহা এই বইখানি একটু মনোযোগের সহিত 'পড়িলেই বুঝিতে পারিবে। তাড়াতাড়ি পড়িওনা। যাহা পড়িবে, তাহার বিষয় ভাবিবে অর্থাৎ কি পড়িলে তাহার বিষয় চিন্তা করিবে। কোন বিষয়, আলস্য বা অহঙ্কার বশতঃ তুচ্ছ করিওনা। যে বিষয় তুচ্ছ করিবে, তাহাতেই তোমার ত্রুটী হওয়ার সম্ভাবনা। কবি বলিয়াছেন—

"যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দে'খ ভাই।
পেলেও পাইতেঁ পার, লুকান রতন।"

যাহাহউক, "ছাত্র প্রচলিত কুসংস্কার সকল পরিত্যাগ করিয়া, দৃঢ়বিশ্বাস সহকারে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের অনুসরণ করিবেন! প্রচলিত মতে আমানি ঠাণ্ডা হইলেও, উহা আয়ুর্ব্বেদ মতে গরম। অতএব উহা (আমানি) বাতশ্লৈষ্মিক রোগীর তৃষ্ণায় নিঃশঙ্কে দেওয়া যায়। ধনুষ্টঙ্কার প্রচলিত মতে গরম হইতে উৎপন্ন হয়, কিন্তু আয়ুর্ব্বেদ মতে, কেবল ধনুষ্টঙ্কার নহে, তাবৎ বায়ু রোগই ঠাণ্ডা হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। অতএব ধনুষ্টঙ্কারে অগ্নিতাপ শঙ্কনীয় নহে। কাস রোগ প্রচলিত মতে ঠাণ্ডা রোগ, কিন্তু, পৈত্তিক কাস গরম রোগ, অতএব উহাতে নিত্য অবগাহন আবশ্যক। এইরূপ যক্ষ্মার কাস ও জ্বর থাকিলেও নিত্য অন্নাদি সেবন, তৈলাভ্যঙ্গ ও স্নান আবশ্যক হয়। এমনকি নবজ্বরেও দাহের আধিক্য থাকিলে, স্নান ও অবগাহন বিধি হইয়া থাকে। "শতমারী ভবেৎ বৈদ্যঃ সহস্রমারী চিকিৎসকঃ।" এরূপ একটী কথা সর্ব্বদা শুনা যায়। এ কথার অর্থ এই যে, যে ব্যক্তি লৌহের শতপুট দিতে জানেন না (অর্থাৎ লৌহের জারণ, মারণ জানেন না) তাঁহাকে বৈদ্য বলা যায় না ইত্যাদি। ইহার অর্থ এরূপ নহে যে, শত শত রোগীর বধ না করিলে বৈদ্য হওয়া যায় না। যদি চিকিৎসায় অধিকার না থাকে, তবে প্রত্যহ সহস্র বধ করিলেও চিকিৎসা শিখা যায় না।"

"মন্ত্রার্থং মন্ত্রচৈতন্যং যো ন জানাতি সাধকঃ।
শতলক্ষ প্রজপ্তোঽপি তস্য মন্ত্রো ন সিধ্যতি॥"

যে সাধক মন্ত্রের অর্থ কিংবা মন্ত্রের শক্তি জানে না, শতলক্ষ বার জপ করিলেও তাহার মন্ত্র সিদ্ধ হইবে না। যাহাহউক, রোগী পাইলেই, রোগীর অবস্থার সহিত, বইয়ের উপদেশ গুলি মিলাইয়া লইবে। প্রত্যেক রোগীতেই তোমাকে নূতন করিয়া পরীক্ষা দিতে হইবে এবং কাজেই তাহাকে আরাম করিবার জন্য তোমাকে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে, ইহা সর্ব্বদা মনে রাখিয়া কার্য্য করিবে। তোমার অপেক্ষা যিনি বেশী জানেন বা অনেক রোগী দেখিয়া যাঁহার বহুদর্শিতা হইয়াছে, কঠিন রোগীতে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিবে এবং উক্ত উপদেশ নিজের মনে ভাল বলিয়া বোধ করিলে, সেই অনুসারে কার্য্য করিবে। এইরূপ করিলেই সুচিকিৎসক হইতে পারিবে। সর্ব্বদা শিখিবার জন্য চেষ্টা করিবে। কি রোগী কি চিকিৎসক, প্রত্যেকের নিকট হইতেই তোমার শিক্ষা করিবার জিনিষ আছে। টাকা দিতে পারিবে না বলিয়া, দরিদ্র রোগীকে তুচ্ছ করিবে না। কর্ম্মের ফল, বিশেষতঃ চিকিৎসা কার্য্যের ফল, অবশ্যই আছে। শাস্ত্রে আছে—

"ক্বচিদর্থঃ ক্বচিদ্ধর্ম্মঃ ক্বচিন্মিত্রং ক্বচিদ্ যশঃ।
কর্ম্মাভ্যাসঃ ক্বচিন্নিত্যং চিকিৎসা নাস্তি নিষ্ফলা॥"

অর্থাৎ চিকিৎসা কখনই নিষ্ফলা হয় না। কোথাও অর্থ, কোথাও বা ধর্ম্ম, কোথাও বা মিত্রতা এবং কোথাও বা যশঃলাভ হয়। আর, কোথাও বা কর্ম্মাভ্যাস শিক্ষা হয় অর্থাৎ কার্য্যক্ষেত্রে চিকিৎসা কার্য্যের অভ্যাস হইয়া থাকে। আরোগ্য লাভ করিলে গরিব লোক টাকা দিতে না পারুক, তোমার যশঃ কীর্ত্তন করিবে এবং তোমার যশের কথা শুনিয়া ধনী লোকেরা টাকা দিয়া তোমাকে আহ্বান করিবে, আর, শুধু টাকার জন্যই তোমার ব্যবসা নহে, তোমার দায়িত্ব বড়ই গুরুতর রকমের। লোকের প্রাণ লইয়া তোমাকে খেলা করিতে হয়। সুতরাং সর্ব্বদা ধর্ম্মভীরু, অনুসন্ধিৎসু

ও পরদুঃখকাতর হইবে। লোক, ব্যারামের তাড়নায় ঠেকিয়া তোমার শরণাপন্ন হইবে, তুমি তোমার সাধ্যমত তাহাদের দুঃখ মোচন করিবার চেষ্টা করিবে। যে রোগীটী হাতে লইবে, তাহার আরোগ্যের জন্য তোমার সমস্ত বিদ্যা, বুদ্ধি ও পরিশ্রম প্রয়োগ করিবে। রোগী এখন তখন, ইহা দেখিয়া আসিয়া বেশ ঘুমাইতেছ, আলস্য বশতঃ কিসে রোগীকে রক্ষা করা যায়, কোন বই বা অন্য কোন চিকিৎসকের সহিত পরামর্শ করিয়াও রোগীকে রক্ষা করিতে পারা যায় কি না,তাহা না ভাবিয়া বেশ ঘুমাইতেছ! কিন্তু, তোমার একদিনের একটু বিশ্রাম, আর, অন্য দিকে আর একটী লোকের চির-বিশ্রাম! তোমার একদিনের সামান্য শ্রান্তি দূর করিবার জন্য এক রাত্রির নিদ্রা, আর, অন্য ব্যক্তির পক্ষে চিরনিদ্রা! ভাবিয়া দেখ যে, তোমার দায়িত্ব কত গুরুতর।

"খুন ক'রে পড়েনা ধরা।
এই সাহসেই ব্যবসা করা॥"

এরূপ নীতি-সূত্র কখনও অবলম্বন করিওনা। সর্ব্বদা সর্ব্ব বিষয়ে ঈশ্বরে বিশ্বাসী হইবে। "Trust in God, not in one thing or another, but in all." রোগী দেখিতে বাহির হইবার সময়, ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া ও তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিয়া বাহির হইবে। আর, টাকার জন্যই যদি তোমার আকাঙ্ক্ষা বেশী হয়, তাহার জন্যও তোমার ভাবনা নাই। তোমার যশঃ চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইলে টাকা আপনিই আসিতে থাকিবে। সর্ব্বদা সর্ব্ব বিষয়ে সত্য নির্ণয় করিবার জন্য যত্ন করিবে। সত্যনির্ণয় বিষয়ে গোড়ামি করিওনা এবং যাহা সত্য বলিয়া নিশ্চয় ধারণা করিতে পারিবে, তাহা সর্ব্বদা অবনত মস্তকে গ্রহণ করিবে। কাহাকেও ভয় করিয়া বা কাহারও খাতিরে, নিজ জ্ঞান ও বিশ্বা-সের বিরুদ্ধে কার্য্য করিবে না। তুমি প্লীহা রোগ বলিয়া বুঝিয়াছ, কিন্তু,

তোমা হইতে নামজাদা ও পসারওয়ালা গোছের একজন বড় চিকিৎসক, তাহাকে যকৃৎ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে, ইহাতে তোমার বিচলিত হইবার কোন কারণ নাই। তবে, তোমার ভূল কি না, সেই বিষয়ে ভাবিয়া দেখিতে পার, কি অন্য কাহারও সহিত পরামর্শ করিয়া দেখিতে পার। ভূল, ভ্রান্তি সকল লোকেরই হইতে পারে। কিন্তু অন্যের কথায়, নিজের বিশ্বাসের বিরুদ্ধে, তুমি কোন ঔষধ প্রয়োগ করিতে পার না, বা তোমার প্রয়োগ করা উচিত নহে। পৃথিবীতে সকল প্রকারের লোকই আছে। একদিকে চিকিৎসা শাস্ত্রে অগাধ পণ্ডিত, কিন্তু, অন্যদিকে কিছুমাত্র হাতযশঃ নাই, চিকিৎসা করিতে গেলেই বিভ্রাট করিয়া বসেন। "They are healthy and strong and yet always too timorous." Landor. অর্থাৎ তাহারা দেখিতে বেশ স্বাস্থ্যসম্পন্ন এবং শক্তিশালী বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু তাহারা সর্ব্বদাই ভীরুর একশেষ। আর তুমি যেই কেন হওনা, তোমার কার্য্যদ্বারা তোমার পরিচয় হইবে। ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায় প্রকৃত কথাই বলিয়াছেন, যে, "পৃথিবীতে মূর্খ সকলেই। যিনি আইন ব্যবসা করেন, তিনি পাচকের কার্য্যে মূর্খ। যিনি জজিয়তি করেন, তিনি কৃষিকার্য্যে মূর্খ। যিনি যে কাজে আছেন, সেই কার্য্য যদি তিনি সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে করিতে পারেন, তবেই তাঁহাকে সেই বিষয়ে পণ্ডিত বলা যায়। তবে বিদ্যাতে ও কাজেতে, উভয় দিকে, পণ্ডিত হইলে ত ভালই। বরং কার্য্যক্ষেত্রে বিদ্যার পণ্ডিত হইতে কাজের পণ্ডিত খুব ভাল। এদিকে এম্, ডি, পাশ করিয়াছেন, কিন্তু, কার্য্যক্ষেত্রে সামান্য রোগের চিকিৎসায় অন্ধকার দেখেন, তাহাতে লোকের উপকার কি ?" তাই তুমি কাজের পণ্ডিত হইবার চেষ্টা করিবে। চরকমুনি বলেন,—

"তদেবযুক্তং ভৈষজ্যং যদারোগ্যায় কল্পতে।
সচৈব ভিষজাং শ্রেষ্ঠো রোগেভ্যো যঃ প্রমোচয়েৎ॥"

অর্থাৎ সেই ঔষধই উপযুক্ত (ভাল ঔষধ), যাহাতে রোগ আরোগ্য হয় এবং তিনিই ভিষক-শ্রেষ্ঠ, যিনি রোগীকে রোগমুক্ত করিতে পারেন। যাহাহউক,তোমাকে একদিকে বিনয়ী ও অন্যদিকে সাহসী হইতে হইবে। * একদিকে শিক্ষক ও অন্যদিকে ছাত্র হইতে হইবে। অন্যান্য বিভাগে নিজে যাহা জানি তাহা করিলাম বলিলে তবুও এড়াইতে পারা যায়, কিন্তু, চিকিৎসা বিভাগে ঐরূপ করিলে চলিবে না। সর্ব্বদা পাঠ করিবে, সর্ব্বদা অনুসন্ধান করিবে ও সর্ব্বদা বেশী জানিবার জন্য চেষ্টা করিবে। ইহা এরূপ হইল, কেন এরূপ হইল, অমুকের ভাল হইয়াছে, আমার কিরূপে সেইরূপ হইতে পারে, কি দোষে আমার সেইরূপ হইতেছে না, কি করিলে আমার দোষের সংশোধন হইতে পারে ইত্যাদি-রূপে যিনি সর্ব্বদা অনুসন্ধান, পরিশ্রম ও অবিচলিত অধ্যবসায় সহকারে, তদনুযায়ী কার্য্য করেন, তিনিই কার্য্যে সফলতা লাভ করিতে পারেন।

"ক ঈপ্সিতার্থস্থির নিশ্চয়ং মনঃ।
পয়শ্চ নিম্নাভিমুখং প্রতীপয়েৎ॥"

---

* এম্, বি, কি এম্, ডি, নাম শুনিয়াই তোমার ভয় পাইবার কোন কারণ নাই। তুমি যাহা ভাল বুঝিয়াছ বলিয়া তোমার নিশ্চিত ধারণা হইয়াছে, তাহা অকপটে প্রকাশ করিবে। বিনীত হওয়া ভাল, কিন্তু নিতান্ত গোবেচারী গোছের মৃদুতা অবলম্বন করা সময় সময় ভাল নয়। ফলতঃ "অধৃষ্যশ্চাভিগম্যশ্চ" ভাব অবলম্বন করিবে। লোকে কথায় বলে যে,—

"অতি বাড়্ বে'ড়োনা বাতাসে ভেঙ্গে যাবে।
অতি ছোট হ'য়না ছাগলে চেটে খাবে॥"

কবি বলিয়াছেন,—

"বনানি দহতোবহ্নেঃ সখা ভবতি মারুতঃ।
স এব দীপনাশায় ক্ষীণে কস্যাস্তি সৌহৃদম্॥"

অর্থাৎ অগ্নি যখন প্রবল মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বন দগ্ধ করিতে থাকে, তখন বায়ু তাহার সহায়কারী বন্ধু হয়; আবার দেখ, সেই অগ্নিই যখন ক্ষীণভাবে প্রদীপের মধ্যে মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতে থাকে, তখন অগ্নির সেই বন্ধু পবনই দীপের প্রাণ সংহার করিয়া থাকে।

অর্থাৎ অভিলষিত বিষয়ে স্থির-সংকল্প ব্যক্তির ও সাগরাভিমুখিনী স্রোতস্বিনীর গতিই বা কে রোধ করিতে পারে ?

সর্ব্বদা সর্ব্বক্ষণের জন্য মনে রাখিবে যে—

"The heights of great men reached and kept
Were not attained by sudden flight.
But they, while their companions slept,
Were toiling upwards in the night."

জলবসন্তের চিকিৎসা।

——*০*——

রসগতা মসূরিকাকেই পানিবসন্ত বা জলবসন্ত বলে। ইহার বিশেষ কোন চিকিৎসা করিতে হয় না। পানিবসন্তের জ্বরের, কি প্রথম কি চরম, কোন অবস্থাতেই আশঙ্কার কারণ নাই। শারীরিক তাপ কোন কোন স্থলে কিছু বাড়ে বটে, এমন কি ১০৪° ডিগ্রি কি ততোঽধিক হয়, কিন্তু, তাহার পরেই আবার উত্তাপ কমিয়া সহজ তাপে পরিণত হয়। জলবসন্তের কোন অবস্থাতেই প্রায় ঔষধের প্রয়োজন হয় না। তবে, যখন যে উপসর্গ উপস্থিত হইবে,তাহার সাধারণ চিকিৎসা করিবার দরকার হয় ত করিবে। সর্দ্দি কাশি হইলে উহাদের সাধারণ ঔষধ দিতে হয়। হাম ও পানিবসন্তের জ্বর, দাহ ও তৃষ্ণা প্রভৃতি প্রায় সকল অবস্থাতেই খদিরাষ্টক পাচন দেওয়া যায়। পাচন ২ তোলা, জল ⁄॥০ আধসের, শেষ আধপোয়া। ইহা সারাদিনে, ৩।৪ বারে খাওয়াইতে হয়। একবারে খাওয়াইলে বমন হইয়া যাইতে পারে। রোগের পরিণামে, আধপোয়া পাচনে ১ তোলা ঘৃত মিশ্রিত করিয়া লইবে। শিশুদের পক্ষে মাত্রা দুই-ভাগের এক ভাগ বা চারিভাগের এক ভাগ। গর্ভিণীকে এই পাচন দিতে হইলে, পাচনের দ্রব্য হইতে হরিতকী বাদ দিয়া বাকী দ্রব্যগুলি

সমান ভাগে লইয়া, মোট ২ তোলা লইয়া পাচন তৈয়ার করিবে। কজ্জলী বা মকরধ্বজ সর্ব্বপ্রকার বসন্তেরই উৎকৃষ্ট ঔষধ। পানের রস বা আদার রস ও মিছরি সহ অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিবে। কি শিশু, কি গর্ভিণী, সকলকেই মকরধ্বজ দেওয়া যায়। মকরধ্বজ ২ রতি এবং কজ্জলী দিতে হইলে ৪।৫ রতি দিতে হয়। কজ্জলী তৈয়ার করিবার সময়, পারা ১ ভাগ ও গন্ধক দুইভাগ লইয়া কজ্জলী তৈয়ার করিবে।

অতিসার বা উদরাময় উপস্থিত হইলে, খদিরাষ্টক পাচনের পরিবর্ত্তে, বিল্বাদি পাচন দিবে। কোন স্থানের ক্ষত শুষ্ক হইতে বিলম্ব হইলে, পঞ্চতিক্ত ঘৃত ক্ষতে লাগাইবে। আর উহাই পান করিবে। অথবা নিমপাতার রস /০ এক ছটাক অথবা দূর্ব্বার রস /০ এক ছটাক ও গাওয়া ঘৃত /০ এক ছটাক একত্র আগুণে জ্বাল দিয়া, জল মরিয়া গেলে ঐ ঘৃত নামাইবে। এই ঘৃত ব্যবহার করিবে। পানিবসন্ত পাকিয়া উঠিলে গালিয়া দেওয়ার আবশ্যক করে না। শুধু শ্বেতচন্দন ঘষিয়া বসন্তের উপর লাগাইয়া দিলেই যন্ত্রণা নিবারণ হয় ও ঘা শীঘ্র শীঘ্র শুকায়।

পথ্য—আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসায় পথ্যকে অতি উচ্চ আসন দেওয়া হইয়াছে। শাস্ত্রে আছে—

"বিনাপি ভেষজৈর্ব্যাধি পথ্যাদেব নিবর্ত্ততে।
নতু পথ্যবিহীনানাং ভেষজানাং শতৈরপি॥"

ঔষধ সেবন ব্যতীতও কেবল পথ্যের উপর নির্ভর করিয়া রোগী আরোগ্য লাভ করিতে পারে। আর, পথ্যবিহীন হইলে হাজার হাজার ঔষধ সেবনেও কোন ফল হয় না। কাজেই, সুপথ্য নির্ব্বাচন করা চিকিৎসকের প্রথম ও প্রধান কার্য্য। সকল রোগেই রোগী যদি সুপথ্যাশী হয়, তবে, "একদিন করে মজা, ছ'মাস ধ'রে অড়র ডা'ল আর পটোল ভাজা" খাইয়া কষ্ট পাইতে হয় না। চলিত মতে, ভাত ও কলায়ের দাল খাওয়াইয়া রোগীকে রসস্থ করিতে হয়। এইরূপে রসস্থ

করিলে শ্লেষ্মার বৃদ্ধি পাইয়া, রোগ হঠাৎ উৎকট ভাব অবলম্বন করিতে পারে এবং অতিসারও হইতে পারে। প্রথম ২ দিন পর্য্যন্ত ভাত দিবে না, অথবা অতিশয় ক্ষুধা না হওয়া পর্য্যন্ত ভাত দিবে না। কাঁচা মুগ ও মসূরের যূষ দিবে। কোষ্ঠবদ্ধের ভাব থাকিলে কাঁচা মুগের যূষ, আর, পাতলা বাহ্য থাকিলে মসূরের যূষ দিতে হয়। এই যূষ প্রত্যহ ৩।৪ বারও দেওয়া যাইতে পারে। গর্ভিণীর দুগ্ধ বন্ধ করিবে না। গর্ভিণীর জ্বরাদি কোন অবস্থাতেই দুগ্ধ বন্ধ করিতে নাই। পাতলা দাস্ত থাকিলে দুগ্ধের পরিমাণ কমাইবে ও দুগ্ধ সহ দুগ্ধের ৩ ভাগের ১ ভাগ পরিষ্কার চূণের জল মিশাইয়া সেবন করিতে দিবে। ঘা শুষ্ক না হওয়া পর্য্যন্ত স্নান করিবে না।

বসন্তরোগীর শুশ্রূষা।

—:*:—

রোগীর শুশ্রূষা চিকিৎসার একটী অঙ্গ। * বিশেষতঃ বসন্তরোগীর শুশ্রূষা ও পথ্য বসন্ত চিকিৎসার প্রধান অঙ্গ। বসন্ত অতিশয় সংক্রামক ও স্পর্শাক্রামক রোগ। সুতরাং প্রত্যেক চিকিৎসকেরই কর্ত্তব্য যে, বসন্তরোগী দেখিবার পর বস্ত্রাদির পরিবর্ত্তন করিয়া ধুইয়া ফেলেন ও স্নান করেন। যাঁহাদের টিকা হয় নাই এমন লোককে বসন্তরোগীর ঘরে প্রবেশ করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। রোগীকে বেশ পরিষ্কার, পরিচ্ছন্নও

---

* "ভিষগ্ দ্রব্যাণ্যুপস্থাতা রোগী পাদ চতুষ্টয়ম।
গুণবৎ কারণং জ্ঞেয়ং বিকারস্তোপশান্তয়ে॥"

অর্থাৎ চিকিৎসক, দ্রব্য (ঔষধ), শুশ্রূষাকারক (রোগীর পরিচারক) এবং রোগী এই চারিটী চিকিৎসার অঙ্গ। এই অঙ্গ চতুষ্টয় উপযুক্ত গুণ-সম্পন্ন হইলে, রোগ প্রশমনে সমর্থ হইয়া থাকে।

পবিত্রভাবে রাখিয়া দিবে। রোগীকে শুষ্ক ঘরে রাখিবে। ঐ ঘর এমন হওয়া চাই যেন, তাহাতে বিশুদ্ধ বায়ু বেশ চলাচল করিতে পারে। কিন্তু, বসন্তের জ্বরভোগের সময়, রোগীকে নির্ব্বাত গৃহে রাখাই কর্ত্তব্য। বসন্তরোগী যাহাতে অতিরিক্ত জলপান না করে, সেইদিকে দৃষ্টি রাখিবে, অথচ তৃষ্ণার সময় অল্প অল্প করিয়া জলও দিতে হইবে। কোনও প্রকারের মদ, তৈল ও আমিষ ব্যবহার ও দিবানিদ্রা, রোগীর পক্ষে সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। প্রতিদিন রোগীর শয্যাধৌত করতঃ শুষ্ক করিয়া পুনরায় শয্যা-রচনা করিয়া দিবে। রোগীর মল, মূত্র ও বমনাদি তৎক্ষণাৎ লোকের চলাচলশূন্য ও দূরবর্ত্তী স্থানে লইয়া গিয়া পুতিয়া ফেলিবে। মাছি ও মশা প্রভৃতি রোগীর গায়ে বসিতে না পারে, এই জন্য সর্ব্বদা রোগীকে পরিষ্কার মশারির ভিতরে রাখিয়া দিবে। রোগীর ব্যবহৃত বস্ত্রাদি যে জলে ধৌত করিবে, ঐ জলও দূরবর্ত্তী স্থানে পুতিয়া ফেলিবে। পীড়ার সূত্র-পাতে শারীরিক বা মানসিক কোনও প্রকারের পরিশ্রম, কোনও প্রকারের তৈল ব্যবহার, দুষ্পাচ্য জিনিষ আহার, দিবানিদ্রা ও স্ত্রীসহবাস প্রভৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। * সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিবে যেন রোগীর কোনও প্রকারে ঘর্ম্ম বাহির না হয়। ঘর্ম্ম বাহির হইলে তৎক্ষণাৎ শঠীরপালো ঐ স্থানে মালিস করিবে। রোগীর সহিত এরূপ ব্যবহার করিবে যেন, সে কিছুতেই উদ্বিগ্ন বা ভীত না হয় এবং সর্ব্বদা সন্তুষ্ট থাকে। রোগীর ঘর শুষ্ক হওয়া দরকার বটে, কিন্তু বোগীর ঘরে বা রোগীর গায়ে যেন কোন প্রকারে রৌদ্রের তেজ লাগিতে না পারে, তাহার বন্দোবস্ত করিবে। রোগীর নিজের শোবার ঘরে ত কথাই নাই, রোগীর বাড়ীর প্রত্যেক ঘরেই প্রতিদিন ধূপ ও ধুনা জ্বালাইবে এবং ঘরগুলি পরিষ্কার রাখিবে।

---

* "রতিং স্বেদং শ্রমং তৈলং গুর্ব্বন্নং ক্রোধমাতপম্।
দুষ্টাম্বু দুষ্টপবনং বিরুদ্ধান্যশনানিচ ॥
নিষ্পাব মালুকং শাকং লবণং বিষমাশনম্।
কটুম্লবেগ রোধঞ্চ মসূরীগদ বাংস্তজেৎ ॥"

কুকুর, বিড়ালাদি কোন জন্তু রোগীর উচ্ছিষ্টাদি যাহাতে খাইতে না পারে, সেই বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবে। কোন পুরুষ বা স্ত্রীলোক অশুচি থাকিলে, তাহাকে রোগীর ঘরে প্রবেশ করিতে দিবে না। শুশ্রূষাকারী, রোগীর সহিত এক শয্যায় শয়ন করিবে না। তবে, শিশুদের বসন্ত হইলে শুশ্রূষাকারী খুব সতর্কতা অবলম্বন করিয়া রোগীর সহিত শয়ন করিবে। বসন্ত আরাম হইয়া গেলেও রোগী যে ঘরে বাস করিত,তাহা বিশেষরূপে পরিষ্কার না করিয়া, সে ঘরে অন্য কাহারও যাওয়া উচিত নহে। বসন্ত রোগী আরাম হইলেও কতকদিন তাহাকে স্পর্শ করা উচিত নহে। অনেকে নাপিতের দ্বারা ক্ষৌরী হইয়াও বসন্ত রোগাক্রান্ত হইয়াছে।

হাম।

—§*§—

হামকে সংস্কৃত ভাষায় রোমান্তী বা রোমান্তিকা বলে। ইহার চলিত নাম হাম, লুন্তী, ফেরা বা ফেয়ারা। ডাক্তারি নাম মিজেলস্ (Measles) রুবিওলা বা মরবিলাই। শীতের দরুণ শরীর রোমাঞ্চিত হইলে (গা কাঁটা দিলে) রোমকূপ সমূহ যতটুকু উন্নত হয়, এই রোগের গুটিকাসকল,ততটুকু উন্নত হয় বলিয়া, ইহাকে রোমান্তী বলে।* ইহাও বসন্ত রোগের অন্তর্গত ও ছোঁয়াচে রোগ। এই রোগের বীজ, রোগীর প্রশ্বাস পরিত্যক্ত বায়ুতে ও মলমূত্র প্রভৃতিতে থাকে। কোন বাড়ীতে একটী ছেলের হাম হইলে, প্রায় সকলেরই হাম হইয়া থাকে। ইহা একবারের বেশী হয় না,

---

* "রোমকূপোন্নতি সমা রাগিণ্যঃ কফপিত্তজাঃ।
কাসারোচক সংযুক্তা রোমান্ত্যো জ্বরপূর্ব্বিকাঃ॥"

অর্থাৎ আগে জ্বর হয়, পরে সমুদায় গাত্রে রোমকূপ সদৃশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লাল বর্ণের পিড়কা উৎপন্ন হয়। এই পিড়কার নাম রোমান্তি। ইহাতে রোগীর কাস ও অরুচি হয়। ইহা মসূরিকা রোগের প্রকার ভেদ মাত্র এবং পিত্তশ্লৈষ্মিক রোগ।

কথনও ২।৩ বার হয়। যুবা বয়সেও ইহা হইতে পারে। তবে, ইহা শিশুদেরই রোগ বটে। এই রোগের প্রচ্ছন্নাবস্থা ৭।৮ দিন অর্থাৎ রোগের বীজ দেহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াও ৭।৮ দিন পর্য্যন্ত রোগ প্রকাশ না করিয়া, গুপ্তভাবে থাকিতে পারে। কখন কখন ১৪ দিনও প্রচ্ছন্ন থাকে। ৬ হইতে ১৪ দিন পর্য্যন্ত রোগবীজ দেহে গুপ্তভাবে থাকিয়া, পরে রোগের লক্ষণ প্রকাশ করে অর্থাৎ হামের জ্বর হয়।

হামের দুইটী অবস্থা। (১) জ্বরের অবস্থা। (২) হাম বাহির হইয়া যাইবার অবস্থা। প্রথমে কম্প দিয়া জ্বর আসে। শিশুদের আক্ষেপ (তড়কা) ও হইতে পারে। তাপ বৃদ্ধি পাইয়া খুব বেশী জ্বরও হইতে পারে। কম্প প্রায় একবারের বেশী হয় না। হাম-জ্বরের বিশেষ লক্ষণ হচ্ছে সর্দ্দি অর্থাৎ হাম-জ্বরে সর্দ্দি থাকিবেই। প্রথমে জ্বর হয়। জ্বর প্রায় লাগাই থাকে। হাম বাহির না হওয়া পর্য্যন্ত, জ্বরের বেগ ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে। জ্বরের ৪র্থ হইতে ৮ম দিনের মধ্যে হাম বাহির হয়। ইহাও পানিবসন্তের ন্যায় পিত্তশ্লৈষ্মিক রোগ। ইহা প্রথমে মুখমণ্ডলে, বিশেষতঃ ললাটে, কখন কখন হাতে পায়ে প্রকাশ পাইয়া, পরে সর্ব্বাঙ্গে ব্যাপ্ত হয়। হাম যেমন সর্ব্বপ্রথমে মুখমণ্ডলে প্রকাশ পায়, সেইরূপ আবার মুখমণ্ডলের হামই সর্ব্বাগ্রে মিলাইয়া যায়। শরীরে মশার কামড়ের মত ছোট ছোট দাগ পড়ে ও হামের গুটি উঠে। টিপিলে গুটিকা অদৃশ্য হয়, কিন্তু সেই সময়েই আবার জাগিয়া উঠে। রোগীর চক্ষু ও মুখ টস্ টস্ করে, মধ্যে মধ্যে শরীর হইতে যেন আগুণের ভাপ উঠে। চক্ষু দিয়া জলস্রাব হয়, চক্ষুর ভিতর লাল দেখায় ও চক্ষু অল্প ফোলে। রোগী আলোক অথবা প্রদীপের দিকে চাহিতে পারে না। বারে বারে হাঁচি হয় ও নাক দিয়া জল ঝড়ে। গলায় ব্যথা হয়, খুক্ খুক্ ক'রে শুষ্ক কাশি হয়, স্বরভঙ্গ হইতে পারে, সর্ব্বশরীর চিট্ মিট্ করে অর্থাৎ সর্ব্বশরীরে চুলকণার ন্যায় একপ্রকার যন্ত্রণা হয়। জ্বরের উত্তাপ ১০১° হইতে ১০৪°

ডিগ্রি হইতে পারে। জ্বরের সঙ্গে প্রলাপ, অস্থিরতা প্রভৃতি থাকিতে পারে। কখন কখন সর্দ্দির সহিত বমন বা উদরাময় উপস্থিত হয়। হাম সম্পূর্ণ বাহির হইয়া গেলে, এই সকল উপদ্রব কমে ও জ্বর মগ্ন হয়। ছোট ছোট ছেলেদের জ্বরের সঙ্গে শুষ্ক কাশি থাকিলে অর্থাৎ খুক্ খুক্ করিয়া কাশিলে ও চক্ষু লাল হইলে, আর, সেই সময়ে দেশে হাম ও বসন্ত হইতে থাকিলে, ছেলের হাম হইবে বলিয়া অনুমান করা যায়।

কিন্তু পীড়া গুরুতর হইলে এ ভাবটী হয় না। রোগী দাহে অস্থির হয়, হয়ত দুরন্ত অতিসার হইতে পারে, আর, হয়ত সেই অতিসারেই রোগীর মৃত্যু হইতে পারে। জ্বর, বিকারেও পরিণত হইতে পারে। তখন রোগী দুর্ব্বল হয়। নাড়ী ক্ষীণ ও গোলমেলে গোছের হয়, হাত, পা ঠাণ্ডা হয়, জিহ্বা খড়্ খড়ে ও শুষ্ক হয়, দাঁতের গোড়ায় কাল ছাঁতা পড়ে। রোগী বিছানা খোটে, প্রলাপ বকে, আক্ষেপ হয়, মূর্চ্ছাও হইতে পারে। এই হাম হয়ত ভাল হইয়া নির্গত হয় না, অথবা লাট খাইয়া যায়। একস্থানে লাট খাইয়া অন্য স্থানে নির্গত হইতে পারে। হামের চাপগুলি কাল বর্ণের দেখায়। সঙ্গে সঙ্গে নিমোনিয়া, ব্রংকাইটিস্ প্রভৃতি হইতে পারে। নাক মুখ দিয়া রক্তস্রাবও হইতে পারে।

হামের জ্বর মোট ৯ হইতে ১১ দিন পর্য্যন্ত থাকে। গুটিকা মিলাইয়া যাইবার পর জ্বর গেলেও, কাশি ও উদরাময় কিছুদিন থাকিতে পারে। হামে বিশেষ ভয় নাই। তবে, হামের পর যে, কাশি ও উদরাময় হয়, তাহা হইতে আশঙ্কা আছে। উদরাময় ও কাশি ভিন্ন, হামের জন্য, সহসা কোন ঔষধ দেওয়া ভাল নয়। হাম উঠিলে বাতাতপ বর্জ্জন করিবে অর্থাৎ রৌদ্র ও ঠাণ্ডা বাতাস গায়ে লাগাইবে না। হামের পরিণামে ২।৩ দিন, কুড় ও বাবুইতুলসীবীজ সমভাগে মোট ২ তোলা লইয়া ⁄॥৹ আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ২।৩ বারে সেবন করিলে হাম শীঘ্র শীঘ্র মিলিত হয়।

লোকে হামকে "বসন্তের বড় দাদা" বলিয়া থাকে। কারণ, ইহার ক্রিয়া ও যন্ত্রণা অতিশয় উৎকট হইতে পারে। হামরোগে, কোন কোন স্থলে এত দাহ ও গায়ের জ্বালা হয় যে, রোগী মনেকরে যেন সে আগুণের মধ্যে বসিয়া আছে। গলার বীচি সকল ফুলিয়া উঠে ও টাটায়। উদরে সাঙ্ঘাতিক বেদনা হয় ও প্রস্রাবের গুরুতর পীড়া হইতে পারে।

হাম পিত্তশ্লৈষ্মিক রোগ। কাজেই, ইহাতে উষ্ণ বা শীতল চিকিৎসা দুইই খারাপ। অতিশয় কর্ষণ (শুষ্ক) ক্রিয়া করিলে হাম হঠাৎ মিলিয়া গিয়া বিকারাদি আনয়ন করিতে পারে। প্রবল জ্বরেও নিতান্ত রুক্ষক্রিয়া করিবে না। নিতান্ত ঠাণ্ডা ক্রিয়া করিলেও সর্দ্দি এবং বাতশ্লেষ্মার বৃদ্ধি পাইয়া নিমোনিয়া ও ব্রংকাইটিস্ প্রভৃতি কঠিন কঠিন উপসর্গ সকল আনয়ন করিতে পারে। অনতিবৃংহণ ও অনতিকর্ষণ ক্রিয়াই হামে উপকারক। হাম ও বসন্তের প্রথমে বিরেচন দিবে না, উহাতে গুটিকা নির্গমের ব্যাঘাত হয়। সুতরাং বিশেষ দরকার না হইলে দিবে না।

হামের হঠাৎ মিলাইয়া যাওয়াকে "হামের লাট খাওয়া" বলে। রোগী অতিরিক্ত শুষ্ক হইলেই হাম লাট খাইয়া যায়। লোকে এই ভয়েই রোগীকে লঙ্ঘন (উপবাস) দিয়া শুষ্ক করিতে চাহে না।

সাধারণতঃ খদিরাষ্টক পাচন সেবন করিলে ও মুগ এবং মসূরের যূষ পথ্য করিলে রোগ প্রশমিত হয়। রোগী কিঞ্চিৎ শুষ্ক হইয়া আসিলে দালের যূষ ঘৃতে (১ তোলা গাওয়া ঘৃতে) সাঁতলাইয়া দিবে এবং খদিরাষ্টক পাচনেও ১ তোলা গাওয়া ঘৃত মিশাইয়া ২।৩ বারে সেবন করাইবে। অতিসার থাকিলে পথ্য ও পাচনে ঘৃত দিবে না। কারণ, অতিসার থাকিলে রোগীকে শুষ্ক বলা যায় না। আর, অতিসার উপস্থিত হইলে খদিরাষ্টক পাচনের পরিবর্ত্তে বিল্বাদি পাচন দিবে। বিল্বাদি পাচন ধারক। সামান্য উদরাময় হইলে ধারক ঔষধ দিবে না। কেবল মুগের যূষের পরিবর্ত্তে মসূরের যূষ দিবে।

বিকারাদি হইলে বিকারের চিকিৎসা করিতে হয়। দশমূল পাচন বিকারের শ্রেষ্ঠ ঔষধ। বিকারের সঙ্গে পাতলা দাস্ত থাকিলে, দশমূল পাচন সহ শুঁঠের গুড়া মিশাইয়া সেবন করিতে দিতে হয়। বসন্তরোগে যেমন পাচন দুইবেলা তৈয়ার করিয়া দিতে হয়, এখানেও সেইরূপ দিবে। শুঁঠের গুড়া প্রতিবারে ৵০ আনা কি।০ শিকিভরি দিতে হয়। দিনে ২ বারের বেশী শুঁঠ চূর্ণ দেওয়ার দরকার হয় না। বিকারে স্বল্পলক্ষ্মী-বিলাস ও মকরধ্বজ একত্র ব্যবহার করা যায়। ফলতঃ বিকারে রোগীর অবস্থা শীঘ্র শীঘ্র এত পরিবর্ত্তিত হয় যে, বিকারের চিকিৎসা শিক্ষিত কবি-রাজ ভিন্ন, সাধারণ লোকে করিতে পারে না। সুতরাং ঐ বিষয়ে বেশী বলা বাহুল্য মাত্র। হামের দাহাদির নিবৃত্তির জন্য, বসন্তের দাহাদির জন্য যে যে ঔষধ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহাই সেইরূপে ব্যবহার করিবে। তবে সর্ব্বদা মনে রাখিবে যে, ইহা পিত্তশ্লৈষ্মিক রোগ, সুতরাং বেশী শৈত্য বা রুক্ষক্রিয়া করা না হয়।

উপদ্রবাদি শূন্য হইয়া ও জ্বর ত্যাগ পাইয়া হাম মিলাইয়া গেলে, ঘোলের সহিত ভাত আহার করিবে। "উঠ্তি ঝোল, বস্তি ঘোল" এই চলিত কথাতেই পথ্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

হামের পর রক্তামাশয় হইলে, কাঁচাবেল পোড়ার শাঁস, ঘোল ও অল্প চিনি বা সৈন্ধব সহ সেবন করিবে। সর্দ্দি ও কাশি থাকিলে যষ্টিমধুর কাথ (পাচন) সহ মকরধ্বজ বা লক্ষ্মীবিলাস কিছুকাল সেবন করিবে। কাশি বসিয়া গেলে কাশি তুলিয়া ফেলিবার মত ঔষধ দিবে। এই অবস্থায় শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, * বাকসছাল, যষ্টিমধু, তেজপাতা, প্রত্যেক আধ-তোলা, তালের মিছরি ২ তোলা, জল ⁄৷৷০ আধসের, শেষ আধপোয়া, ৪।৫ বারে, গরম জল সহ মিশাইয়া সেবন করিতে দিবে।

হাম মিলিয়া যাওয়ার পর জ্বর বা শ্লেষ্মার প্রকোপ যাহা থাকে তাহার চিকিৎসা করিবে।

---

* মরিচ অর্থে গোল মরিচ বুঝিবে। কোন কোন [illegible]

মন্তব্য—প্রচলিত মতে হামে খদিরাষ্টক পাচন প্রভৃতি কোন পাচনই দেওয়া হয় না এবং দেওয়ার দরকারও হয় না। শুধু পথ্যাদি পালন করাইয়া সাবধানে রাখিতে হয়। তবে উদরাময়, আমাশয় বা কাশি হইলে তাহাদের চিকিৎসা করিতে হয়। ইহাতেই রোগী আরাম হইয়া থাকে।

বসন্তরোগে টিকা দেওয়া।

কৃত্রিম উপায়ে কোন রোগের বীজ শরীরে প্রবেশ করাইয়া দিলে, সেই শরীরে উক্ত রোগ মৃদুভাবে উৎপন্ন হইয়া ভবিষ্যতে উক্ত রোগের আক্রমণ হইতে শরীর রক্ষা পাইবে, এই উদ্দেশ্য করিয়া বসন্ত, প্লেগ, কলেরা (ওলাউঠা) প্রভৃতি কতকগুলি রোগে টিকা দেওয়ার প্রথা চলিয়া আসিয়াছে। কিন্তু, একমাত্র বসন্তরোগ ভিন্ন প্লেগাদি অন্য কোন রোগে টিকা ফলোপধায়ক হয় নাই।

বসন্তরোগের স্বভাব এই যে, ইহা কোন শরীরে একবার হইলে, আর পুনর্ব্বার সেই শরীর আক্রমণ করে না। বসন্তের প্রকৃতির এই পরিচয় পাইয়া টিকা দিয়া কৃত্রিম বসন্ত উৎপাদন করিলে, ভবিষ্যতে আর বসন্ত হইবে না, এই উদ্দেশ্যে টিকা দেওয়া হইয়া থাকে। টিকা দুই প্রকার——(১) মনুষ্যবসন্তবীজটিকা ও (২) গোবসন্তবীজটিকা। বাঙ্গলা টিকা মনুষ্যবসন্তবীজ হইতে দেওয়া হইত এবং ইংরেজী টিকা গোবসন্ত বীজ হইতে দেওয়া হয়। বাঙ্গলা টিকার নাম ইনকুলেশন বা নৃমসূর্য্যাধান এবং ইংরেজী টিকার নাম ভ্যাক্সিনেশন বা গোমসূর্য্যাধান। বাঙ্গলা টিকা দেওয়ার সময় বেশী কষ্ট হয় এবং কোন কোন স্থলে গুরুতর উপসর্গ উপস্থিত হইয়া অনিষ্ট করিতে পারে। অতি পূর্ব্বকাল হইতেই মনুষ্যবসন্তবীজ দ্বারা বাঙ্গলা টিকা দেওয়া হইত। ভারতবর্ষেই টিকা

দিবার প্রথা প্রথমে সৃষ্টি হয়। * "পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে স্বাভাবিক ভাবে উৎপন্ন বসন্ত রোগের সহিত কৃত্রিম ভাবে উৎপন্ন বসন্তরোগের অনেক পার্থক্য আছে। এই সকল পার্থক্যের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি প্রধান। (১) কৃত্রিম বসন্তে অর্থাৎ টিকার বসন্তে উৎপন্ন কণ্ডূ ও স্ফোটক অল্পসংখ্যক হয় এবং প্রায়ই চর্ম্ম ব্যতীত অন্যত্র নির্গত হয় না। (২) কৃত্রিম বসন্তে জ্বরাদি সাধারণ লক্ষণ কম হয়। (৩) ইহাতে মৃত্যু প্রায়ই হয় না। প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষে ও চীনে জানা ছিল যে, কৃত্রিম উপায়ে বসন্তরোগ উৎপন্ন করাইলে সে ব্যক্তির আজীবন আর প্রায় বসন্ত হইবার ভয় থাকে না। এই উদ্দেশ্যে বসন্তরোগীর গাত্রের স্ফোটক হইতে গৃহীত মাম্‌ড়ি বালকদিগের ত্বকের নিম্নে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হইত। এই প্রথাকে দেশী টিকা বা বাঙ্গলা টিকা বলে। এইক্ষণ উড়িষ্যার স্থানে স্থানে, যেখানে ইংরেজী সভ্যতার প্রচলন হয় নাই,তথায় এই প্রথার প্রচলন দেখা যায়। চীনদেশে বসন্ত স্ফোটকের শুষ্ক মাম্‌ড়ি গুড়া করিয়া নস্য রূপে নাসিকার ভিতরে প্রবিষ্ট করাইয়া দেওয়া হয়। এইরূপে দেশী-টিকায় শতকরা ২।৩ জনের মৃত্যু হয়।" (লেখক শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র দে এম্, এ, এম্, বি। ভিষক্-দর্পণ, ১১শ খণ্ড, জানুয়ারী ১৯০১ সাল দেখ)।

যাহাহউক, বাঙ্গলা টিকা আদত বসন্তের ন্যায় সময় সময় সংক্রামক ও সাঙ্ঘাতিক হয় বলিয়া এদেশে দণ্ডবিধি আইন দ্বারা বাঙ্গলা টিকা রহিত করা হইয়াছে। প্রায় ৩০।৩৫ বৎসর হইল বাঙ্গলা টিকা উঠিয়া গিয়াছে। এখন যদি কেহ বাঙ্গালা মতে টিকা দেয়, তবে তাহাকে আইন অনুসারে দণ্ডনীয় হইতে হয়। পূর্ব্বে যখন বাঙ্গলা টিকা দিত,তখন আগে ৺শীতলাদেবীর ঘট স্থাপন করিয়া ও তাঁহার পূজা দিয়া টিকাদারেরা বাঙ্গালা টিকা

* এই অধ্যায় শুধু ডাক্তারদিগের মত হইতেই লেখা হইল। গোবসন্ত বীজ টিকা সম্বন্ধে আমাদের সমালোচনা পরে দেখ।

দিত। Dr. Chapman says "at a very remote period, in Hindustan, a tribe of Brahmins, resorted to it as a religious ceremony. A small incision was made and cotton soaked in the virus applied to the wound. Offerings were devoted to the goddess of spots, to invoke her aid ; this divinity having hinted at inoculation—the thought being much above the reach of human wisdom and foresight,"

যাহাহউক, সংক্রামক হইবার ভয়ে, গ্রামের সমস্ত বালক বালিকাকে একসময়েই টিকা দেওয়া হইত। বাঙ্গলা টিকা লইবার পর মৎস্য ও মাংস বাটীতে আনা কিছুদিন পর্য্যন্ত বন্ধ থাকিত। টিকা লওয়া হইলে বালক বালিকারা কিছুদিন পর্য্যন্ত বাটীর বাহিরে যাইতে পারিত না। কেহ কেহ বলেন, খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দীতে ভারতবর্ষ ও চীনে উহার প্রচলন হয় এবং তৎপরে উহা দূরতর দেশে ক্রমশঃ প্রচলিত হয়। আর, উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ঐ প্রথা রহিত করা হইয়াছে। বাঙ্গলা টিকা ঠিক্ কোন্ সময় হইতে ভারতে প্রচলিত হয়, তাহা বলা যায় না। * এরূপ প্রবাদ আছে যে, ইউরোপে ১৭০০ খৃঃ অঃ কনষ্টান্‌টিনোপল নগরে প্রথমে ইহা প্রচারিত হয়। ১৭১৭ খৃষ্টাব্দে ঐ নগরে লেডি মণ্টেগুর পুত্রের প্রথমে মনুষ্যবসন্ত-বীজ টিকা দেওয়া হয়। কনষ্টান্‌টিনোপল ইউরোপীয় তুরস্কের রাজধানী। লর্ড মণ্টেগু তুরস্কে ইংলণ্ডীয় রাজদূত ছিলেন। ১৭২০ খৃষ্টাব্দে, লেডি-মণ্টেগু তাহার স্বদেশ ইংলণ্ডে আসিয়া ইহা প্রথমে প্রচারিত করেন। তখন পরিপক্ক বসন্তের গুটিকা হইতে বীজ অর্থাৎ পূয়ঃ লইয়া টিকা দেওয়া হইত। এই সময় হইতে প্রায় ৭৫ বৎসর কাল পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের স্থানে স্থানে

* এইরূপে টিকা দেওয়ার প্রথা আর্য্য ভারতভূমেই প্রথমে প্রচারিত হয় (২২৫ পৃষ্ঠা, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাবিজ্ঞান দেখ)।

দেশী টিকার প্রচলন ছিল। ইংরেজী টিকার অর্থাৎ গোবসন্তবীজ টিকার উপদ্রবাদি মৃদুভাবে উপস্থিত হয় ও বিশেষ কোন অনিষ্ট হয় না বলিয়া ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট এদেশে ইহার প্রচলন করিয়াছেন (পুনঃ প্রচলন করিয়াছেন, না কি ?) ‡ কেহ কেহ বলেন যে, ইহা দ্বারা যেমন অনিষ্ট হয় না, ইষ্টও তেমন হয় না, অর্থাৎ ইহা উভয় দিকেই মৃদুক্রিয়া প্রকাশ করে। অনেকের বিশ্বাস [এবং এই বিশ্বাস বোধ হয় ভ্রমাত্মক নহে] বাঙ্গলা টিকা হইলে বসন্ত না হওয়া যত নিশ্চিত, ইংরেজী টিকার ফল তত নিশ্চিত নহে।

জেনার নামক একজন ইংলণ্ড দেশীয় ডাক্তার প্রথমে গোবসন্তবীজ-টিকার আবিষ্কার করেন। * তিনি যে পল্লীতে বাস করিতেন, তাহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের গোয়ালাদের মধ্যে দেখিতেন যে, তাহাদের মধ্যে যাহারা বসন্তরোগাক্রান্ত গরুর দুগ্ধ দোহন করিত, তাহাদের হাতের আঙ্গুলে গো-বসন্ত বাহির হইত এবং তাহাদের আর মনুষ্য বসন্ত বাহির হইত না। মনুষ্যবসন্ত অপেক্ষা গোবসন্ত মৃদু, ইহা দেখিয়া তাঁহার মনে গো-বসন্ত বীজ দ্বারা টিকা দিবার কথা প্রথমে উদিত হইল। গরুর বসন্ত হইলে, উহার পালানের উপর বেশ পরিষ্কাররূপে বসন্ত দেখা যায়।

ইংরেজী টিকা খুব ছোট বয়সেও দেওয়া যায়। উহাতে কোন প্রকার অনিষ্টের আশঙ্কা নাই। বরং খুব ছোট বয়সেই টিকা দেওয়া উচিত। শিশুর বয়স ২।৩ মাস হইলেই টিকা দেওয়া যাইতে পারে। তবে, টিকা দেওয়ার সময় শিশুর শরীর বেশ সুস্থ ও সবল থাকা চাই। সামান্য একটুকু আধটুকু অসুখ ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে। নিম্নলিখিত স্থলে টিকা দিবে না। যথা—শিশুর দেহ দুর্ব্বল থাকিলে উহা বলাধান না হওয়া পর্য্যন্ত, উদরে চর্ম্মরোগ, উদরাময়, আমাশয় অথবা গুরুতর

‡ আমাদের "টিকার সমালোচনা" পরে দেখ।

* ৺ পুলীন চন্দ্র সান্ন্যাল এম্, বি, কৃত "চিকিৎসা-কল্পতরু" ৪র্থ খণ্ড দেখ। এই সম্বন্ধে আমাদের সমালোচনা পরে দেখ।

রকমের কাশি থাকিলে—এই সকল সম্পূর্ণ আরাম না হওয়া পর্য্যন্ত টিকা দিবে না। কিন্তু, নানাস্থানে বসন্ত হইতে থাকিলে এবং বিশেষ প্রতিবন্ধক না থাকিলে, টিকা দিবে। শিশুদের টিকা যেমন শীঘ্র উঠে ও শীঘ্র পাকে, যুবকদের টিকা সেরূপ হয় না। ভারতবর্ষ প্রভৃতি উষ্ণ প্রধান দেশে শীতকালেই টিকা দেওয়ার প্রশস্ত সময়।

টিকা দেওয়ার দ্বিতীয় কি তৃতীয় দিনে, টিকা দেওয়ার স্থানে এক একটা করিয়া ফুস্কুড়ি উঠে। উহারা ক্রমে বড় হয় ও উহাদের চারিধারের চর্ম্মের প্রদাহ হয় অর্থাৎ চারিধারের চর্ম্ম ঈষৎ লাল ও বেদনাযুক্ত হইয়া উঠে। ৭ম কি ৮ম দিনে উহারা পাকে। ঐ পাকা গুটিকার ভিতরের পূঁজের নাম লিম্ফ। এই লিম্ফের ভিতরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবাণু থাকে। অনুবীক্ষণ সাহায্যে উহাদিগকে দেখা যাইতে পারে। ১০ম, ১১শ দিনে উহারা শুষ্ক হইতে আরম্ভ হয় ও ১৪।১৫ দিনের মধ্যে উহাদের উপর মামড়ি বা চুম্‌টী পড়ে। ২৪।২৫ দিনে চুম্‌টী উঠিয়া যায় ও ঐ স্থানে একটা করিয়া দাগ থাকে। টিকা দেওয়ার সময় ঐ স্থানে ২।৩ যায়গায় ক্ষত করিলে অথবা বিশেষ কোন কারণ ব্যতীতও টিকার স্থানে এক একটা করিয়া ফুস্কুড়ি না উঠিয়া অনেকগুলি ফুস্কুড়ি উঠিতে পারে।

একবারে গোবসন্ত হইতে বীজ লইয়া টিকা দিলে, টিকা উঠিতে কিছু গৌণ হয়। টিকা উঠিলে পর, টিকা দেওয়ার স্থান বেদনা করে ও চুলকায়। কখন কখন গুটিকার চারিদিকের চর্ম্মের খুব গুরুতর রকমের প্রদাহ হয়। ফোস্কা পড়িয়া গিয়া ক্ষতও হইতে পারে। কখন কখন টিকা দেওয়ার পর এরিসিপেলাস্ নামক চর্ম্মরোগ হয় ও সমস্ত বাহুতে বেদনা করে। টিকা দেওয়ার সময় জ্বর হয় না, কিন্তু টিকার গুটিকা পাকিবার সময়, টিকার শঙ্কায় (সন্তাপে) জ্বর হয়। এই জ্বরের উত্তাপ ১০৪° ডিগ্রি পর্য্যন্ত হইতে পারে। কোন কোন স্থলে টিকা দেওয়ার পর

[illegible] ঘটিতে পারে যথা—বমী পাতলা বাহ্য হইতে পারে

টিকাদেওয়ার যায়গায় বেশী প্রদাহ হইতে পারে এবং এই প্রদাহ বিস্তৃত হইয়া অনেকদূর ব্যাপিয়া এরিসিপেলাস্ নামক চর্ম্মরোগ (বিসর্প) হইতে পারে। (এরিসিপেলাস্‌গ্রস্ত স্থানে হিরাকস ২ রতি, /০ একছটাক জলে গুলিয়া, সেই জল লেপন করিলেই সত্বর উপকার হয়)। কখন কখন সর্ব্বাঙ্গে এক প্রকার লাল লাল ফুস্কুড়ি বা ফোস্কার ন্যায় চর্ম্মরোগ বাহির হয়।

কোন কোন ডাক্তারের মত এই যে প্রথম বারে টিকা উঠিলেও যৌবনের প্রারম্ভে আর একবার টিকা লওয়া উচিত। আবার, কোন কোন ডাক্তার বলেন যে প্রথম বারের টিকা ভাল না উঠিলে, আর এক-বার টিকা লওয়া উচিত। কাহারও কাহারও মত এই যে, প্রত্যেক পঞ্চম বা ৭ম বৎসরে একবার করিয়া টিকা লওয়া উচিত। দ্বিতীয় বারের টিকায় কাহারও বা বসন্ত বাহির হয় না, কাহারও বা বাহির হয়। ছোট ছেলেদের দ্বিতীয় বারের টিকায় বসন্ত প্রায়ই বাহির হয় না। যদি বসন্ত বাহির হইবার হয়, তবে দ্বিতীয় বারে শীঘ্র শীঘ্র বাহির হয় ও পাকে। দ্বিতীয় বারে বিসর্প হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশী। কেন বলা যায় না, দ্বিতীয় বারের টিকায় কাহারও কাহারও বা মূর্চ্ছা হয়। জ্বর, বেদনাদি উপসর্গ দ্বিতীয় বারের টিকায় বেশী হয়।

খুব সুস্থকায় বালকের দেহ হইতে টিকার বীজ লওয়া উচিত। এই বালকের গরমির পীড়া, চর্ম্মরোগাদি থাকিলে, টিকার বীজের সঙ্গে সঙ্গে, উহা অন্য শরীরে সংক্রান্ত হইতে পারে।

টিকা দেওয়ার পর কোনও প্রকারের চিকিৎসা করিতে হয় না। কেবল টিকা দেওয়ার স্থান ঠাণ্ডা জলে ভিজাইয়া রাখিতে হয়। ইহাতে ২।৩ দিন মধ্যেই টিকার গুটিকা পরিপুষ্ট হইয়া উঠে। পরিপুষ্ট হইলে টিকার গুটিকার উপর একটু মাখম বা দুগ্ধের সর লাগাইয়া-রাখিলেই বেদনা ও যন্ত্রণা নিবারণ হয়। উদরাময় বা বিসর্পাদি হইলে, তাহাদের

চিকিৎসা করা দরকার। টিকার জ্বরে, জ্বর থাকা পর্য্যন্ত স্নান করিতে নাই। টিকার গুটিকা চুল্‌কাইবে না। টিকা দেওয়ার দ্বিতীয় হইতে পঞ্চম দিন পর্য্যন্ত প্রত্যহ শীতল জল দ্বারা টিকা ভিজাইয়া রাখিবে। টিকার রস বা পুয়ঃ শরীরের অন্য স্থানে লাগিলে তৎক্ষণাৎ শীতল জল দ্বারা ধৌত করিবে। টিকার জ্বরের কোন চিকিৎসা করিতে হয় না। বেশী জ্বর হইলে এবং জ্বরের সঙ্গে রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে উচ্ছে বা করল্লা পাতার রস ২ তোলা ও হরিদ্রা চূর্ণ ৵০ দুই আনা একত্র পান করাইয়া দিবে। ইহাতে কোষ্ঠ পরিষ্কার হইয়া জ্বরত্যাগ হইবে। উচ্ছে পাতার রস নির্দ্দোষ জোলাপ। টিকার চারিদিকের চর্ম্মের অত্যন্ত প্রদাহ হইলে ঈষ-দুষ্ণ জলে নেকড়া ভিজাইয়া পট্টীর মত করিয়া দিবে। উনুনের পোড়া মাটি গুড়া করিয়া ছাঁকিয়া প্রদাহ স্থানে ছড়াইয়া দিলেও ফল হয়।

গোবসন্তের বীজ নানাপ্রকারে সংগ্রহ করে। প্রথমে গোবসন্ত হইতে বীজ লইয়া টিকা দিয়া মনুষ্যের গায়ে বসন্ত উৎপন্ন হইলে সেই মানুষের টিকার বীজ হইতে টিকা দেওয়া যাইতে পারে। (২) প্রথমে মানুষের বসন্তের বীজ হইতে গরুকে টিকা দিতে হয়, পরে গরুর বসন্ত উঠিলে, গরুর টিকার বীজ হইতে মনুষ্যকে টিকা দিতে হয়। পরে এই শেষোক্ত মানুষের টিকার বীজ হইতে অসংখ্য লোককে টিকা দেওয়া যাইতে পারে। পুনঃ পুনঃ টিকা দিলেও বীজের গুণ নষ্ট হয় না। পূর্ব্বে একটী লোককে বাড়ী বাড়ী লইয়া গিয়া বহু লোককে টিকা দেওয়া হইত। ইহাতে অসু-বিধা আছে বলিয়া টিকাদারেরা বীজ লইয়া কাঁচের গ্লাসে পুরিয়া রাখে ও তাহা হইতে টিকা দেয়। টিকার বীজ খুব সুস্থকায় বালকের দেহ হইতে গ্রহণ করা উচিত। কেহ কেহ বলেন যে ৮ম দিবসে গুটিকা পাকিলে বেশ ভাল পরিপক্ক গুটিকা হইতে বীজ লওয়া উচিত। বীজের সঙ্গে রক্ত মিশিলে বীজ খারাপ হয়। সুতরাং বীজ বাহির করার সময় আঙ্গু-লের টিপ্‌ (টিপি) দেওয়া ভাল নয়। সুঁচ দিয়া গালিয়া কেবল পুঁজ-

টুকুই নিতে হয়। কেহ কেহ বলেন, বসন্ত উঠিবার ৫।৬ দিবস পরে এবং যখন বসন্তের গুটিকার চারিদিক তখনও লাল হয় নাই এবং বসন্তটী দেখিতে মুক্তার ন্যায় টল্ টল্ করে, তখন ঐ বসন্ত হইতে বীজ লইলে উৎকৃষ্ট ফলপ্রদ হয়। পূয়ঃযুক্ত বসন্ত হইতে টিকা দেওয়া ভাল নয়।

টিকার বীজ লইয়া শুষ্ক করিয়া রাখিবারও বিধি আছে। টিকা দেওয়ার সময় ঐ শুষ্ক বীজ জলসহ গুলিয়া লইতে হয়।

বঙ্গদেশে, বাঙ্গলার সেনিটারি কমিশনার সাহেবই (Sanitary Commissioner) টিকা বিভাগের উপরিতন কর্ম্মচারী। তিনজন উচ্চ কর্ম্মচারী ইহার অধীনে আছেন। ইহাদিগকে ডেপুটী সেনিটারি কমিশনার (Deputy Sanitary Commissioner) বলে। প্রত্যেক জেলার সিভিল সার্জ্জনেরা টিকা বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। ইহারা ডেপুটী সেনিটারি কমিশনারদিগের নিম্নস্থ কর্ম্মচারী। ইংরেজী টিকা দেওয়ার জন্য লিম্ফের (বসন্ত গুটিকার ভিতর হইতে যে রস লইয়া টিকা দেওয়া হয় তাহাকে লিম্ফ বলে) দরকার হইলে, টিকা বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সিভিল সার্জ্জন ডাক্তার মহাশয়ের নিকট দরখাস্ত করিলেই উহা পাওয়া যায়। প্রত্যেক সিভিল সার্জ্জনের অধীনে ১ বা ২ জন বা ততোঽধিক করিয়া টিকার পরিদর্শক (Vaccinating Inspector) থাকেন। প্রত্যেক ইন্স্পেক্টরের অধীনে ভিন্ন ভিন্ন মহকুমায় কয়েকজন করিয়া সব্ইন্স্পেক্টর থাকেন। ইহারাই ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে যাইয়া টিকা-প্রদান-প্রণালী পরিদর্শন করেন। টিকাদার দুই প্রকার (১) সনন্দ প্রাপ্ত (Licenciate) ও মাহিয়ানা প্রাপ্ত (paid). শেষোক্ত টিকাদারেরা সকল সময়েই টিকা দেয় এবং সনন্দপ্রাপ্ত টিকাদারেরা কেবল শীতকালে নিযুক্ত হয়। ইহারা (সনন্দপ্রাপ্ত টিকাদারেরা) টিকা দিয়া যে ফিঃ পায় তাহার কিয়দংশ বেতন স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। ইহাদের স্বতন্ত্র বেতন নাই। প্রতিজনের টিকা দিবার জন্য ৵০ দুই আনা ফিঃ নির্দ্ধারিত আছে। বিলাতে কেবল

পরীক্ষোত্তীর্ণ চিকিৎসকেরা টিকা দিতে পারেন। কিন্তু, এদেশে অল্প শিক্ষিত বা অশিক্ষিত নিম্নশ্রেণীস্থ লোকদিগের হস্তেই টিকা দিবার ভার। পরিদর্শকেরাও প্রায় শিক্ষিত নহেন। ইহার জন্য লোকেরা যে সময় সময় টিকা দিবার প্রণালীর উপর বিরক্ত হয়, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

ইংরেজী টিকা
বা
গোবসন্তবীজ টিকার সমালোচনা।
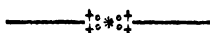
টিকা দেওয়া ব্যাপারটা কি এবং টিকা কি উদ্দেশ্যে দেওয়া হইয়া থাকে, তাহা আমরা পূর্ব্ব অধ্যায়েই বিবৃত করিয়াছি। বাঙ্গলা টিকা বা মনুষ্যবীজ টিকা * (নৃমসূর্য্যাধান) ও ইংরেজী টিকা বা গোবসন্তবীজ টিকা (গোমসূর্য্যাধান)। এই উভয় টিকার সমালোচনা করিতে হইলে, নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয়ে আমাদিগকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে, যথা— (১) বাঙ্গলা টিকার কি কি দোষ ও কি কি গুণ ছিল? (২) টিকা যে উদ্দেশ্যে দেওয়া হইয়া থাকে, বাঙ্গলা টিকাদ্বারা সেই উদ্দেশ্য সম্পন্ন হইত কি না? (৩) ডাক্তারগণ যে যে যুক্তি প্রদর্শন করতঃ বাঙ্গলা টিকার যে যে দোষের বিষয় উল্লেখ করেন এবং যে যে দোষের দরুণ উহার প্রচলন উঠিয়া গিয়াছে, বাঙ্গলা টিকার বিরুদ্ধে সেই সকল যুক্তি অকাট্য কি না? (৪) ইংরেজী টিকার কি কি গুণ আছে বলিয়া ডাক্তারগণ বলেন? (৫) ডাক্তারগণ ইংরেজী টিকার যে যে গুণের উল্লেখ করেন, ঐ সমস্ত গুণ বাস্তবিক উক্ত টিকার আছে কি না? এবং সমাজে সেই সেই গুণের প্রভাব এযাবৎ কতদূর পরিলক্ষিত হইয়াছে বা হইতেছে? (৬) ইংরেজী টিকার কি কি দোষ আছে? (৭) ইংরেজী টিকা ও বাঙ্গলা টিকার দোষ গুণাদি পর্য্যালোচনা করিলে, মোটের উপর কাহার গুণাধিক্য হয় এবং মোটের উপর সেই গুণ সমাজের পক্ষে মঙ্গলদায়ক কি

---

* বারে বারে "মনুষ্যবসন্তবীজ টিকা" ও "গোবসন্তবীজ টিকা"র উল্লেখ না করিয়া আমরা "বাঙ্গলা টিকা" ও "ইংরেজী টিকা" বলিয়া উল্লেখ করিব। পাঠক, বাঙ্গলা টিকা অর্থে মনুষ্যবসন্তবীজ টিকা ও ইংরেজী টিকা অর্থে গোবসন্তবীজ টিকা বুঝিবেন।

না? (৮) জেনার নামক ইংলণ্ডের একটী ডাক্তার ইংরেজী টিকার আবিষ্কার করিয়াছেন বলিয়া সর্ব্বত্র প্রচারিত আছে। উহা কি বাস্তবিক তিনিই আবিষ্কার করিয়াছেন, না, বহু পূর্ব্বকালেও এদেশে উহা প্রচলিত ছিল? (৯) বাঙ্গলা টিকার পূর্ব্বে এবং জেনার সাহেবের আবিষ্কারের বহু পূর্ব্বে, ইংরেজী টিকা এদেশে প্রচলিত ছিল বলিয়া যদি কোন প্রমাণ পাওয়া যায়, তবে এদেশ হইতে উহা (ইংরেজী টিকা) উঠিয়া যাওয়ার কারণ কি? অবশ্য, উভয় প্রকারের টিকার মধ্যে কোন্‌টী ভাল, তাহার বিচার করিতে হইলে কোন্ প্রকারের টিকা কার্য্যক্ষেত্রে কিরূপ ফল প্রদান করে, তাহা হাতে কলমে দেখাইয়া দিতে পারিলেই ভাল হয়। কিন্তু, সেইরূপ করিতে হইলে উভয় টিকার ফলাফল বহুকাল পরীক্ষা না করিলে উহা নিশ্চিতরূপে অবধারণ করা যাইতে পারে না। আবার, বহুকাল পরীক্ষা করিলে, অনর্থক অনেক লোকের প্রাণহানিরও সম্ভাবনা আছে। কোন একটী বিষয় প্রথমতঃ যুক্তিদ্বারা নির্দ্ধারিত করিতে হয় এবং তৎপরে কার্য্যক্ষেত্রে তাহার পরীক্ষা করিতে হয়। তবে, যে সমস্ত যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে নামিতে হইবে, সেই সমস্ত যুক্তির মূল্য কিরূপ অর্থাৎ ঐ সমস্ত যুক্তির উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা যাইতে পারে কি না, তাহাই সর্ব্বাগ্রে দেখা কর্ত্তব্য। (১০) পূর্ব্বে গোবসন্তবীজ টিকা (ইংরেজী টিকা) এদেশে প্রচলিত ছিল এবং পরে উহা রহিত করিয়া আয়ুর্ব্বেদকারগণ বাঙ্গলা টিকার প্রাধান্য সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন, যদি এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায়, তবে সেই প্রমাণ অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ আছে কি না? (১১) যদি অবিশ্বাসের কোন কারণ না থাকে, তবে, আয়ুর্ব্বেদে উল্লিখিত টিকাপদ্ধতির হঠাৎ পরিবর্ত্তন করার দরুণ ভবিষ্যতে কোন দোষ ঘটিতে পারে কি না? (১২) আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য ঋষিগণের অর্জ্জিত জ্ঞান ও আজ কালের ডাক্তারগণের অর্জ্জিত জ্ঞানের কোন পার্থক্য আছে কি না? অথবা (১৩) যেস্থলে বহুদিবস পরীক্ষা

না করিলে কোন যুক্তির সারবত্তা বুঝা যাইতে পারে না, অথচ পরীক্ষা-কাল পর্য্যন্ত যুক্তিমূলক উপদেশের উপরই নির্ভর করিতে হইবে, সে স্থলে আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য মুনি ঋষিগণের আদেশের উপরই নির্ভর করা লোকের পক্ষে বেশী মঙ্গলদায়ক, না, আজ কালের বিদ্বান্ ও জ্ঞানী ডাক্তার মহাশয়দের উপদেশের উপর নির্ভর করাই লোকের পক্ষে অধিকতর শ্রেয়স্কর ? (১৪) যদি বাঙ্গলা টিকা লোকের পক্ষে ইংরেজী টিকা হইতে অধিকতর উপকারী বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তবে গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য কি ? আমরা এই সকল বিষয়ই পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিতে প্রয়াস পাইব।

পূর্ব্ব অধ্যায়েই বলা হইয়াছে যে টিকা দুই প্রকার। (১) মনুষ্যবসন্তবীজ টিকা বা বাঙ্গলা টিকা। ইহা ৩০।৩৫ বৎসর যাবৎ ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষ হইতে উঠাইয়া দিয়াছেন। তবে, ডাক্তারী রিপোর্টে পাওয়া যায় যে, উড়িষ্যার কোন কোন অঞ্চলে—যেখানে ইংরেজী সভ্যতা বিস্তৃত হয় নাই, তথায় ইহা এখনও প্রচলিত আছে। ইউরোপেও পূর্ব্বে বাঙ্গলা টিকা প্রচলিত ছিল। পূর্ব্ব অধ্যায় পাঠে আমরা বুঝিতে পারি যে, ১৭২০ খৃঃ অঃ বাঙ্গলা টিকা ইংলণ্ডে প্রথম প্রচারিত হয় এবং ৭৫ বৎসর কাল যাবৎ তথায় ও ইউরোপের অন্যান্য দেশে উক্ত টিকা প্রচলিত থাকে। সুতরাং ১৭৯৫ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত ইউরোপে বাঙ্গলা টিকা দেওয়ার প্রথা বেশ চলে। ভিষক্‌দর্পণাদি পাঠে জানা যায় যে, ১৮৫৪ খৃঃ অঃ বিলাতের লোকদিগকে আইন অনুসারে, গোবসন্তবীজ টিকা গ্রহণ করিতে বাধ্য করা হয় এবং ১৮৮০ খৃঃ অঃ বঙ্গদেশেও উহা আইনের আমলে আসে। (ভিষক্‌দর্পণ ১১শ সংখ্যা, ১৯০১ সাল দেখ)। এদেশে আইন দ্বারা বাঙ্গলা টিকা রহিত করা হইয়াছে অর্থাৎ যদি কেহ বাঙ্গলা টিকা নেয়, তবে, টিকাদাতা ও টিকাগ্রহীতা উভয়কেই আইন অনুসারে দণ্ডনীয় হইতে হয়। * তবে মফস্বলে এই বিষয়ে কড়াকড় নিয়ম নাই। মফস্বলে

* শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য কৃত "গোবীজ টীকা" নামক পুস্তকের ১০২ পৃষ্ঠা হইতে ১৫৬ পৃষ্ঠা দেখ।

ও কলিকাতা প্রভৃতি সহরে টিকা লওয়ার কি পার্থক্য আছে, তাহা আমরা অন্য স্থানে সবিস্তারে উল্লেখ করিয়াছি। (২) গোবসন্তবীজ টিকা বা ইংরেজী টিকা—ইহা জেনার নামক একজন ইংলণ্ডের ডাক্তার প্রথমে আবিষ্কার করেন বলিয়া সর্ব্বত্র প্রচারিত আছে। এই গোবসন্তবীজ টিকাই আজ কাল রাজাজ্ঞায়, ইউরোপে ও ভারতবর্ষে প্রচলিত আছে। আমরা প্রথমতঃ ডাক্তারি বই হইতে বাঙ্গলা টিকার বিরুদ্ধে ও ইংরেজী টিকার সাপক্ষে যে যে যুক্তি প্রদর্শন করা হইয়াছে তাহার উল্লেখ করিব ও পরে উভয়ের সমালোচনা করিব।

৺ পুলিন চন্দ্র সান্ন্যাল এম্, বি, তাঁহার প্রণীত "চিকিৎসা-কল্পতরু" নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন—

"ইংলণ্ডের গ্লসেষ্টার প্রদেশের ডাক্তার জেনার সাহেব গোবসন্তের টিকার আবিষ্কার করেন। জেনার সাহেব দেখিলেন যে, (১) গোয়ালাদের মধ্যে যাহাদের গোবসন্ত বাহির হইত, তাহাদের আর মনুষ্যবসন্ত বাহির হইতে পারিত না। তিনি আরও দেখিলেন যে (২) গোবসন্ত মনুষ্যবসন্ত অপেক্ষা অনেক মৃদু। ইহা দেখিয়া তাঁহার মনে গোবসন্তবীজ দ্বারা টিকা দেওয়ার প্রথা প্রথমে উদয় হয়।" * * *

* * * * * *

"(১) যদি প্রথম বারের টিকা দেওয়ায় বসন্ত ভাল হইয়া না উঠে, তবে, দ্বিতীয় বার টিকা দেওয়ার দরকার হয়। (২) প্রথমে টিকা ভাল হইলেও, যৌবনে আর একবার টিকা লওয়া উচিত। (৩) কেহ কেহ বলেন প্রত্যেক ৫ম বা ৭ম বৎসরে একবার করিয়া টিকা লওয়া উচিত।"

* * * * * *

"(১) দ্বিতীয় বারের টিকায় এরিসিপেলাস্ (বিসর্প বা বসন্ত-জাতীয় একপ্রকার উগ্রধারাণের চর্ম্মরোগ) হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশী থাকে। (২) দ্বিতীয় বারের টিকায় ২।১ জন রোগীর মূর্চ্ছাও হয়। কেন হয় বলা

যায় না। (৩) দ্বিতীয় বারের টিকায়, প্রথম বারের অপেক্ষা বেদনা ও জ্বর প্রভৃতি বেশী হয়।”

মন্তব্য—উপরোক্ত কথাগুলি সমস্তই যে ইংরেজী টিকার সম্বন্ধে হইতেছে, ইহা বলা বাহুল্য মাত্র।

ভিষক্‌দর্পণে এইরূপ আছে—(লেখক শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র দে এম্, এ, এম্, বি। ভিষক্‌দর্পণ, ১১শ সংখ্যা, জানুয়ারী ১৯০১ সাল দেখ)।

“দেশীয় টিকায় (বাঙ্গলা টিকায়) যদিও স্বাভাবিক বসন্তের ন্যায় অধিক মৃত্যু বা কুফল দেখা যাইত না, তথাপি ইহার কয়েকটী দোষ আছে। (১) কোন কোন স্থলে রোগীর শরীরের অবস্থা এরূপ থাকে যে, দেশীয় টিকা লইলেও স্বাভাবিক বসন্তরোগের ন্যায় সমস্ত লক্ষণ দেখা দেয় এবং কোন কোন সময়ে মৃত্যুও হইতে পারে। (২) দেশীয় টিকায় মুখে চিরকাল দাগ থাকে এবং চক্ষুও অন্ধ হইয়া যাইতে পারে। * (৩) দেশীটিকা লইলে সে বাটীর ও নিকটবর্ত্তী স্থানের লোকদের মধ্যে বসন্তরোগ বিস্তৃত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা থাকে, এই শেষোক্ত কারণে, এখন দেশীটিকা (বাঙ্গলা টিকা) আইন অনুসারে নিষিদ্ধ ও দণ্ডনীয় হইয়াছে। ‡ (৪) বাঙ্গলা টিকায় শতকরা ২।৩ জনের মৃত্যু হয়।”

* * * * * *

“জেনার সাহেব প্রথমে প্রাণিগণের উপর গোবসন্তবীজ টিকার সত্যোঃ

---

* বোধ হয় লেখক মহাশয়ের উদ্দেশ্য এই যে, বাঙ্গলা টিকা লইলে, টিকার স্থান ব্যতীতও যে ৪।৫টা বসন্ত শরীরে বাহির হয়, তাহার কোন কোনটা মুখে হইলে চিরকাল মুখে দাগ থাকে; আর কোন কোনটা চক্ষুতে হইলে চক্ষু অন্ধও হইতে পারে।

‡ কোন কোন ডাক্তার বলেন যে, সংক্রামক হওয়ার ভয়ে, গ্রাম শুদ্ধ লোককে একসময়ে বাঙ্গলা টিকা দিত। (শ্রীযুক্ত চন্দ্র শেখর কালী কৃত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-বিধান দেখ)। গ্রামশুদ্ধ লোককে একত্র বাঙ্গলা টিকা দেওয়ার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি, তাহা আমরা যথাস্থানে পরে বিবৃত করিয়াছি।

পরীক্ষা করেন ও পরে মানুষের উপর পরীক্ষা করেন। (১) তিনি দেখিলেন যে, টিকা দেওয়ার স্থান ব্যতীত অন্য কোন স্থানে কোন প্রকার কণ্ডু নির্গত হয় না। * (২) পরন্তু সেই সকল লোককেই পরে বসন্ত রোগের বিষদ্বারা টিকা দিলে ইহাদের বসন্তরোগও হয় না।”

* * * * * *

“গোবীজ টিকার সুবিধা এই যে, (১) ইহাতে বসন্ত হইতে সম্পূর্ণ মুক্তি পাওয়া যায় অর্থাৎ স্বাভাবিক ও কৃত্রিম উপায়ে বসন্ত হইলে (বঙ্গালা টিকা লইলে) আর যেমন বসন্ত হইবার ভয় থাকে না, গোবীজ টিকা দিলেও সেইরূপ এবং ততদিন বসন্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে না। (২) মৃদুভাবে রোগ হয় বলিয়া মুক্তির পরিমাণ বা সময় কম হয় না। (৩) নিকটবর্ত্তী ব্যক্তিদিগের মধ্যে, বসন্তরোগ বিস্তারের কোনও অশঙ্কা থাকে না। (৪) ইহাতে মৃত্যুর আশঙ্কা নাই (অর্থাৎ ইংরেজী টিকা লইবার দরুণ কাহারও মৃত্যু হয় না)।”

অবশ্য উপরোক্ত দেশীয় ডাক্তার মহাশয়দিগের বর্ণিত বিবরণ, আমরা, পাশ্চাত্য সাহেব ডাক্তার মহাশয়দিগের মতেরই প্রতিধ্বনি বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। কারণ, দেশীয় ডাক্তার মহাশয়েরা তাঁহাদের মুখে শুনিয়া অথবা তাঁহাদিগের লিখিত বই দেখিয়াই নিজেদের প্রবন্ধ লিখিয়াছেন সন্দেহ নাই।

যাহাহউক, আমরা ডাক্তার জেনার সাহেবকৃত গোবসন্তবীজ টিকা আবিষ্কারের বিষয় হইতেই আমাদের সমালোচনা আরম্ভ করিব।

১। ডাক্তার জেনার সাহেবের গোবসন্তবীজ টিকা আবিষ্কার।

ইংরেজী টিকা জেনার নামক একজন ইংলণ্ডবাসী ডাক্তার প্রথমে

---

* বাঙ্গলা টিকা লইলে, টিকার স্থান ব্যতীতও ৪।৫টা কি ২।৪টা বসন্ত শরীরের নানাস্থানে বাহির হয়। ঐরূপ যে হওয়াই উচিত, তাহা আমরা যথাস্থানে পরে প্রদর্শন করিয়াছি।

আবিষ্কার করেন বলিয়া ইউরোপে এবং আজকাল ভারতবর্ষেও প্রচারিত আছে। ফলতঃ ইউরোপে, ডাক্তার জেনারই প্রথমে ইহা আবিষ্কার করেন সন্দেহ নাই। কিন্তু এদেশে পূর্ব্বেও যে উহা প্রচলিত ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

মধ্যযুগে নানা সময়ে, রাজনৈতিক ও অন্যান্য নানা প্রকারের গোলমাল হওয়ার দরুণ, ভারতের সাহিত্য বিজ্ঞান প্রভৃতির অবস্থা এরূপ তমসাবৃত হয় যে, কোথায় কি ছিল বা আছে, তাহা খুজিয়া বাহির করা বড়ই কঠিন। * অল্প দিন হইল ইংলণ্ডের ফ্রেজার নামক একটী বিখ্যাত

---

* চরক, সুশ্রুত প্রভৃতি গ্রন্থে উল্লিখিত আয়ুর্ব্বেদীয় অনেক গ্রন্থ এখন আর পাওয়া যায় না। যে কেমিষ্ট্রি বিদ্যার আলোকে আজ কাল পাশ্চাত্য জগৎ উদ্‌ভাসিত, সেই কেমিষ্ট্রি বিদ্যা ত এদেশে ছিলই, অধিকন্তু, মহাভারতাদি পাঠে ইহাও জানা যায় যে, কেমিষ্ট্রি বিদ্যার তুল্য অন্য কোন বিদ্যাও পূর্ব্বকালীন ঋষিরা অবগত ছিলেন। যথা—

"বয়ং কিরাতৈঃ সহিতা গচ্ছামো গিরিমুত্তরম্।
ব্রাহ্মণৈর্দেব কল্পৈশ্চ বিদ্যা-চন্দ্রক-বার্ত্তিকৈঃ॥
কুঞ্জভূতং গিরিং সর্ব্বমভিতো গন্ধমাদনম্।
দীপ্যমানৌষধিগণং সিদ্ধগন্ধর্ব্বসেবিতম্॥
তত্রাপশ্যাম বৈ সর্ব্বে মধুপীতকমাক্ষিকম্।
মরুপ্রপাতে বিষমে নিবিষ্টং কুম্ভসম্মিতম্॥
আশীবিষৈরক্ষ্যমাণং কুবেরদয়িতং ভৃশম্।
যৎপ্রাপ্য পুরুষো মর্ত্ত্যোঽপ্যমরত্বং নিযচ্ছতি॥
অচক্ষুর্লভতে চক্ষুর্বৃদ্ধোভবতি বৈ যুবা।
ইতি তে কথয়ন্তিস্ম ব্রাহ্মণা চন্দ্রসাধকাঃ॥
ততঃ কিরাতা তদ্দৃষ্ট্বা প্রার্থয়ন্তো মহীপতে।
বিনেশুর্বিষমে তস্মিন্ সসর্পে গিরি-গহ্বরে॥"

(মহাভারত, উদ্যোগ পর্ব্ব, ৬৪ অধ্যায়)

বিদুর বলিতেছেন হে মহারাজ! আমরা একবার চন্দ্রবিদ্যাপ্রিয় দেবসদৃশ ব্রাহ্মণ-

ডাক্তার, না কি, আবিষ্কার করিয়াছেন যে সর্প-বিষেব সহিত পিত্তের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে—জান্তব পিত্ত সর্প বিষের প্রধান প্রতিষেধক অর্থাৎ সর্প বিষের ক্রিয়া পিত্তদ্বারা নিবারিত হইয়া থাকে। এইটী তিনি আবিষ্কার করিয়া কয়েকটী প্রাণীর শোণিতে সর্পবিষ দিয়া, পরে জন্তুর পিত্ত পিচ্‌কারী করিয়া তাহাদেরই শোণিতে সংযুক্ত করিয়া দেখিয়াছেন যে, সেই জন্তু কয়টী মৃত্যু মুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছে অর্থাৎ সর্পবিষের প্রাণনাশক শক্তি ব্যর্থ হইয়াছে। (স্বাস্থ্য পত্রিকা, ৩য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা দেখ)। আয়ুর্ব্বেদ সমালোচনা করিলে বুঝা যায় যে, বহু পূর্ব্বকালেও সর্পবিষের সহিত পিত্তের, বিশেষতঃ বিশেষ বিশেষ জন্তুর পিত্তের সম্বন্ধ ভারতে নির্ণীত হইয়া ছিল এবং নির্ণীত হইবার পর, আয়ুর্ব্বেদের ঔষধ কাণ্ডের উজ্জ্বলতম রত্ন সূচিকাভরণাদি ঔষধ প্রস্তুত হইয়া এ যাবৎ যে কত মুমূর্ষু রোগীর জীবন দান করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। আয়ুর্ব্বেদের তান্ত্রিক ঔষধাদির মধ্যে বটিকাদি তৈয়ার করিতে হইলে

দিগের সমভিব্যাহারে ও কিরাতদিগের সঙ্গে উত্তর পর্ব্বতে গিয়াছিলাম। সেই গন্ধমাদন পর্ব্বত লতাকুঞ্জে আবৃত ও তাহার সর্ব্বত্রই দীপ্যমান্ ঔষধি সমূহে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। তাহার একস্থানে কুম্ভপ্রমাণ ও মধুর স্তায় পিঙ্গলবর্ণবিশিষ্ট পীতমাক্ষিক দেখিতে পাইলাম। সেই স্থানটী নিতান্ত দুর্গম। কুবেরের প্রিয় সেই বস্তুরাশি আশীবিষ সর্পকর্ত্তৃক রক্ষিত হইতেছে। চন্দ্রসাধক ব্রাহ্মণেরা সেই দ্রব্য দেখিয়া বলিলেন যে, মানুষ এই দ্রব্য পাইলে অমর হইতে পারে, অন্ধের চক্ষু হইতে পারে এবং বৃদ্ধ যুবা হইতে পারে। ইহা শুনিয়া কিরাতগণ সেই বস্তু লইবার ইচ্ছা করিয়া, সেই সসর্প গিরিগহ্বরে প্রবেশ করতঃ সর্পকর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়া ছিল।

বিদুরের এই উক্তিতে যে "চন্দ্রবার্ত্তিক" ও "চন্দ্রসাধক" এই দুইটী শব্দ আছে, টীকাকার নীলকণ্ঠ উহার এইরূপ অর্থ করেন—"বিদ্যা যন্ত্রমন্ত্রাদি রূপা। চন্দ্রকা ঔষধ সাধনানি। তদ্বার্ত্তাপ্রিয়া ব্রাহ্মণাঃ তৈঃ।" মিশ্র প্রভৃতি টীকাকারগণ এইরূপ ব্যাখ্যা করেন, যথা —"চন্দ্রকঃ ঔষধিবিদ্যাবিশেষঃ। তৎসাধকাস্তচ্চিন্তকা ব্রাহ্মণাঃ।" ইহাতে বোধ হয় চন্দ্রকবিদ্যা কেমিষ্ট্রি বা তদনুরূপ অন্য কোন বিদ্যা। (আয়ুর্ব্বেদ সঞ্জীবনী দেখ)।

প্রায়ই কতকগুলি ধাতু ও গাছগাছড়া দ্রব্যের দরকার হয়। ঐ সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া অমুক অমুক দ্রব্যের রসের দ্বারা ভাবনা দিয়া * অথবা অমুক দ্রব্যের রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া বড়ী তৈয়ার করা হইয়া থাকে। যেমন, "মৃত্যুঞ্জয় রস" নামক জ্বরের ঔষধে হিঙ্গুল, মিঠাবিষ প্রভৃতি কয়েকটী পদার্থ যথা মাত্রায় ওজন করিয়া লইয়া আদার রস দ্বারা মর্দ্দন করিয়া, বড়ী প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। একটু বিশেষ লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, বটিকাদির মধ্যে যে যে ঔষধে অন্যান্য দ্রব্যের সঙ্গে সর্পবিষ মিশ্রিত করিবার বিধি আছে, সেই সেই ঔষধেই, জান্তব পিত্তের ব্যবহারেরও বিধি আছে। যথা,—"সূচিকাভরণ রস" নামক ঔষধে, আদার রস প্রভৃতি সাধারণ দ্রব্যের রসের দ্বারা ভাবনা না

---

* ভাবনা—"দ্রবেন যাবতা সম্যক্ চূর্ণং সর্ব্বং প্লুতং ভবেৎ।
ভাবনায়াঃ প্রমাণন্তু চূর্ণেপ্রোক্তং ভিষগ্‌বরৈঃ॥
ভাব্যদ্রব্যসমং ক্বাথ্যং ক্বাথাদষ্টগুণং জলম্।
অষ্টাংশশোষিতঃ ক্বাথো ভাব্যানাং তেন ভাবনা॥
দিবা দিবাতপে শুষ্কং রাত্রৌ রাত্রৌ নিবাসয়েৎ।
শুষ্কং চূর্ণীকৃতং দ্রব্যং সপ্তাহং ভাবনাবিধিঃ॥"

আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞানম্।

অর্থাৎ ঔষধীয় দ্রব্যগুলি কোন দ্রব্যের রসের বা ক্বাথের (পাচনের, যেমন—আদার রস বা শুঁঠের পাচনের) সহিত এরূপভাবে মিশাইবে যেন দ্রব্যগুলি সবে মাত্র ভিজা ভিজা হয় (Just soak করে) অর্থাৎ রস যেন বেশী না হয়। এইরূপে রস মিশাইয়া, উহা দিবাভাগে রৌদ্রে শুষ্ক ও রাত্রে শিশিরে সিক্ত করার নাম ভাবনা দেওয়া। ঔষধীয় দ্রব্যগুলি কোন রসের সহিত ৩ দিন, ৭ দিন, ১৪ দিন, ২১দিন ইত্যাদি ক্রমে ভাবনা দিতে হয়। যেমন মৃত্তিকা চাষ করিয়া, একবার রৌদ্রে শুষ্ক ও অন্যবার বৃষ্টিতে ভিজাইলে, উহার উর্ব্বরতাশক্তির বৃদ্ধি পায়, সেইরূপ ঔষধীয় দ্রব্য ভাবনাদ্বারা, বিশেষরূপে বীর্য্যবান্ হইয়া থাকে এবং ক্ষেত্রে বপন করা মাত্র ফল উৎপাদন করিয়া থাকে। অবশ্য ভাবনা দেওয়ার অন্যান্য উদ্দেশ্যও আছে, কিন্তু এখানে উহাদের উল্লেখ করা বাহুল্য মাত্র।

দিয়া তৎপরিবর্ত্তে পঞ্চপিত্তের ভাবনা দেওয়ার বিধি আছে। ময়ূর, বরাহ, রুইমৎস্য, ছাগল ও মহিষ এই পঞ্চ জন্তুর পিত্তের নাম পঞ্চপিত্ত। পঞ্চ-পিত্তের ভাবনাতে সর্পবিষের প্রাণনাশক-শক্তি নষ্ট হইয়া মৃত সঞ্জীবন শক্তির বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এতদ্বারা পাঠক বুঝিতে পারিলেন যে, সর্প-বিষের সহিত পিত্তের সম্বন্ধ ফ্রেজার সাহেবই আবিষ্কার করিয়াছেন, কি, হাজার হাজার বৎসর পূর্ব্বে ঐ সম্বন্ধ ভারতে নির্ণীত হইয়াছিল। * অবশ্য পাশ্চাত্য দেশে,ফ্রেজার সাহেবই প্রথমে উক্ত সম্বন্ধ আবিষ্কার করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। ডাক্তার জেনার সাহেব যে গোবসন্তবীজ দ্বারা টিকা দেওয়ার প্রথা প্রথমে আবিষ্কার করেন বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন, তাহাও বহু পূর্ব্বকালে এদেশে প্রচলিত ছিল। যথা—

"ধেনুস্তন্য মস্থরী বা নরাণাঞ্চ মস্থরিকা।
শস্ত্রেণোৎকৃত্য তৎপূয়ং বাহুমূলে বিচারয়েৎ।
তৎপূয়ং রক্তমিলিতং স্ফোটজ্বরকরং ভবেৎ॥"
(ধন্বন্তরীকৃত শাক্তেয় গ্রন্থ।)

অর্থাৎ গরুর স্তনে উৎপন্ন বসন্ত অথবা মনুষ্যশরীরে উৎপন্ন বসন্ত হইতে অস্ত্রদ্বারা বীজ লইয়া, মানুষের বাহুমূলে প্রবেশ করাইতে হইবে।

---

* ভাগলপুর ডিভিসনের ভূতপূর্ব্ব কমিশনার শ্রীযুক্ত স্থাইন সাহেব বলেন—

"It is wonderful to note the comparatively advanced views held by the sages of your country and how completely they had anticipated discoveries which we moderns flatter ourselves as due to the enlightenment of this age."

"ইহা অতি আশ্চর্য্যের বিষয় যে, আপনাদের ঋষিগণ বহুশতাব্দী পূর্ব্বে যে সকল বিষয় জ্ঞাত হইয়াছিলেন, পাশ্চাত্য দেশবাসী ও সভ্যতাভিমানী আমরা সেই সকল বিষয়ের আবিষ্কারক বলিয়া এখন গর্ব্ব করি।" (৺কবিরাজ অবিনাশ চন্দ্র কবিরত্নের ঔষধালয়ের মূল্যনিরূপণ পত্রিকা দেখ)।

এই পুঁজ (বীজ) টিকাগ্রহীতার রক্তের সহিত মিলিত হইলেই সস্ফোটক-জ্বর উৎপন্ন হয়। ইউরোপে টিকার জন্য আজকাল পুঁজ ব্যবহার না করিয়া জলবৎ বীজদ্বারা টিকা দেওয়ার প্রথা চলিত হইয়াছে। এই প্রথাও এদেশে পূর্ব্বকালে প্রচলিত ছিল। যথা,—

"ধেনুস্তন্য মসূরী বা নরাণাঞ্চ মসূরিকা।
তজ্জলং বাহুমূলাচ্চ শস্ত্রান্তেন গৃহীতবান্॥
বাহুমূলেচ শস্ত্রেণ রক্তোৎপত্তিকরেণ চ।
তজ্জলং রক্তমিলিতং স্ফোটকজ্বরসম্ভবম্॥"

(মহেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য কৃত "গোবীজ টিকা" নামক পুস্তক, ৺ বিনোদ লাল সেন কৃত আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞান, ৪র্থ খণ্ড, ১৭৮ পৃষ্ঠা)।

অর্থাৎ মানুষের বাহুমূলে ও ধেনুর স্তনোপরি যে বসন্ত হয়, অস্ত্রদ্বারা ক্ষত করিয়া তন্মধ্যহইতে জলবৎ বীজ গ্রহণ করিবে। অস্ত্রদ্বারা টিকা-গ্রহীতার বাহুমূলের রক্ত বাহির করিয়া, তাহার সহিত উক্ত বীজ মিলিত করিয়া দিলে, সস্ফোটকজ্বর উৎপন্ন হয়।

যদিও চরক, সুশ্রুত, ও ভাবপ্রকাশাদি কোন প্রচলিত আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থে টিকার উল্লেখ নাই সত্য, তথাপি ধন্বন্তরীকৃত শাক্তেয় গ্রন্থে উক্ত দুই শ্লোকের উল্লেখ থাকাই উহাদের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রমাণ এবং উহা অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ দেখা যায় না। এই দুই শ্লোকে মানুষের বসন্ত ও গোবসন্ত উভয় প্রকার বসন্ত হইতেই বীজ সংগ্রহ করিবার বিধান আছে। বাঙ্গলা টিকা যে অতি প্রাচীন কালে ভারতে প্রচলিত ছিল, তাহা আমরা এই বই'র "বসন্তরোগে টিকা দেওয়া"র অধ্যায়ে বিবৃত করিয়াছি। যখন আমরা দেখি যে বাঙ্গলা টিকা মাত্র ৩০।৩৫ বৎসর হইল এই দেশ হইতে উঠিয়া গিয়াছে এবং ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট উহা উঠাইয়া দিবার সময় গোবসন্তবীজ টিকার প্রচলন এদেশে ছিল না, প্রত্যুত এদেশেও গোবসন্তবীজ টিকা ডাক্তার জেনারের আবিষ্কার বলিয়াই

গৃহীত হইয়াছে, তখন সহজেই ইহা বুঝা যায় যে, বাঙ্গলা টিকাও এদেশে বহুকাল, বহুযুগ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতে ছিল। আর, গোবীজ টিকা বাঙ্গলা টিকারও অনেক পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল ও বহুকাল যাবত রহিতও হইয়াছিল বলিয়া এদেশীয়েরা গোবীজ টিকার সম্বন্ধে কোন খবর রাখিত না।

যাহাহউক, অতি পূর্ব্বকালে পূর্ব্বোক্তরূপে গোবীজ দ্বারা টিকা দেওয়ার পদ্ধতি প্রচলিত থাকিলেও, বহুদিনের পরীক্ষার ফলাফল দেখিয়া, উহার অনুপকারিতা বা অনুপযোগিতা উপলব্ধি করিয়া, বর্ত্তমান কালের অনেক পূর্ব্বেই, শাস্ত্রকারগণ, গোবসন্তবীজদ্বারা টিকা দেওয়ার প্রথা রহিত করিয়া, বাঙ্গলা টিকার প্রাধান্য সংস্থাপন করিয়া গিয়াছিলেন, এরূপ অনুমান করা বোধ হয় অসঙ্গত নহে। দেখা যায় যে, বহুদিন যাবত যে ব্যবস্থা সমাজে প্রচলিত থাকে, তাহার একটা না একটা উপকারিতা আছেই। যে নিয়মে বহু লোকের অনিষ্ট হয় বা যে নিয়মে সমাজের কোন উপকার হয় না, সেই নিয়মই কালে লোপ পাইয়া ভাল নিয়মটী বিধিবদ্ধ হয়। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, পূর্ব্বে গোবীজ টিকা এদেশে প্রচলিত ছিল ইহা স্বীকার করিলাম এবং উহার অনুপযোগিতা দেখিয়া, উহা রহিত করা হইয়া ছিল, অধিকন্তু বাঙ্গলা টিকা প্রবর্ত্তিত করা হইয়া ছিল, ইহাও স্বীকার করিলাম। কিন্তু, গোবীজ টিকার অনুপযোগিতা দেখিয়া যেমন উহা উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল কার্য্যক্ষেত্রে বাঙ্গলা টিকার ফলাফল পূর্ব্বের টিকার অনুপযোগিতা হইতেও অধিকতর অনিষ্টকর বলিয়া প্রমাণিত হওয়ায়, এখন বাঙ্গলা টিকা রহিত করিয়া, পূর্ব্বে অনুপযোগী বলিয়া স্থিরীকৃত গোবীজ টিকাই প্রচলন করা অধিকতর মঙ্গলকর বিবেচিত হওয়ায়, উহার প্রচলন করা হইয়াছে। বাস্তবিক তাহা কিন্তু আমাদের মনে হয় না। ইউরোপে ইংরেজী টিকার অস্তিত্বই ছিল না। জেনার সাহেব যেই উহার আবিষ্কার করিলেন, অমনিই নূতন ও আপাতরম্য বলিয়া উহা সর্ব্বত্র গৃহীত হইয়াছে। আপাততঃ উক্ত টিকা লইতে কোনই

কষ্ট নাই। কোন নিয়ম পালন করিতে হয় না। জ্বরজারি জ্বালা যন্ত্রণাদি বিশেষ কিছুই ভোগ করিতে হয় না। ইংরেজী টিকার এই সকল সুবিধা থাকিলেও, যখন আমরা ইংরেজী টিকার সুবিধা অসুবিধার ও বাঙ্গলা টিকার ইষ্টানিষ্টের বিষয় ভাবি, তখন সর্ব্বদাই কালিদাসের সেই "অল্পস্য হেতোর্বহু হাতুমিচ্ছন্" শ্লোকাংশটী আমাদের মনে পড়ে। যাহাহউক, এখন আবার অনেক ডাক্তার ইংরেজী টিকার অনুপযোগিতার বিষয় উপলব্ধি করিয়া প্রত্যেক ৫ম বা ৭ম বৎসরে, আজীবন ইংরেজী টিকা গ্রহণ করিবার উপদেশ দিতেছেন।

২। ইংরেজী টিকার সুবিধা।

ডাক্তারগণ বলেন যে ,'ইংরেজী টিকা লইলে বসন্ত হইতে সম্পূর্ণ মুক্তি পাওয়া যায় অর্থাৎ স্বাভাবিক বসন্ত হইলে বা কৃত্রিম উপায়ে বসন্ত হইলে (বাঙ্গলাটিকা লইলে) যেমন আর বসন্ত হইবার ভয় থাকে না, গোবীজ টিকা দিলেও সেইরূপ এবং ততদিন বসন্ত রোগ হইবার সম্ভাবনা থাকে না। মৃদুভাবে রোগ হয় বলিয়া (টিকা উঠে বলিয়া) মুক্তির পরিমাণ বা সময় কম হয় না"। ইহার উত্তর দিতে বোধ হয় আমাদিগকে বেশী প্রয়াস পাইতে হইবে না। কারণ, গোবীজটিকা যদিও বাঙ্গলা টিকার মত উগ্র নয় এবং কাজেই উহা লইতে টিকা-গ্রহীতার কষ্ট কম হয়, তথাপি বাঙ্গলাটিকা লইলে বসন্তরোগে আক্রান্ত না হওয়া যত নিশ্চিত (এমন কি সম্পূর্ণ নিশ্চিত বলিলেও দোষ হয় না), ইংরেজীটিকার ফল তত নিশ্চিত নহে। প্রতিবারে বসন্তরোগের প্রকোপের সময়েই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। বিশেষতঃ এবারে কলিকাতায় বসন্তের মহামারীই তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছে। * পূর্ব্বে যাঁহাদের ইংরেজী টিকা হইয়াছে, তাঁহাদেরও

* কেহ কেহ এরূপও মত প্রকাশ করেন যে, ইংরেজী টিকা লওয়ার দরুণই আজ কাল বসন্তের প্রকোপ এত বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং লোকে এত শীঘ্র শীঘ্র বসন্তদ্বারা পুনঃ

অনেকে বসন্তদ্বারা আক্রান্ত হইয়াছেন এবং অনেকে মারাও গিয়াছেন। আর, মহামারীর সময় ইংরেজী টিকা লইবার পর ১০।১২ দিনের মধ্যে বসন্ত উঠিয়া মারা পড়িয়াছে এরূপ কয়েকটা ঘটনা আমাদের জ্ঞাতসারেও ঘটিয়াছে। কেহ কেহ বলিবেন যে উহাদিগকে টিকা না দিলেও উহাদের বসন্ত হইত এবং বসন্তের প্রচ্ছন্নাবস্থার সময়ে টিকা লইয়াছে বলিয়া টিকার বদ্‌নাম হইয়াছে। বাঙ্গলাটিকা লওয়ার সময় শতকরা ২।৩ জন মরে বলিয়া যে আমরা ডাক্তারি রিপোর্টে পাই, তাহাও কি তদ্বিধ কারণে হইতে পারে না? আমরা অনেক বৃদ্ধলোককে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছি যে, বাঙ্গলাটিকা লওয়ার সময় বসন্ত হইয়া মারা গিয়াছে বলিয়া তাঁহারা শুনেন নাই। তবে হাজারের মধ্যে ২।১ জন মরিলেও মরিতে পারে।

ইংরেজী টিকা লওযার সুবিধার বিষয়ে ডাক্তারগণ আরও বলেন যে "ইংরেজী টিকা লওয়ার দরুণ কাহারও মৃত্যু হয় না। কিন্তু বাঙ্গলা টিকা লইলে কোন কোন স্থলে মৃত্যুও হইতে পারে, কেহ কেহ অন্ধও হইতে পারে।" ইহার উত্তর এই যে, বাঙ্গলাটিকা লইলে যেমন কোন কোন স্থলে বসন্ত হইয়া মৃত্যু হয়, ইংরেজী টিকা লইলেও ত কোন কোন স্থলে বসন্ত হইয়া মৃত্যু হইতে দেখা যায়। এই বিষয় আমরা ইতি পূর্ব্বেই একবার উল্লেখ করিয়াছি। তবে, মৃদুবীর্য্য বলিয়া ইংরেজী টিকা লইলে বসন্ত হইয়া মৃত্যু হওয়ার আশঙ্কা কম হইতে পারে। কিন্তু, ইংরেজী টিকা লইলে শতকরা ১০০ জনেরই পুনরায় বসন্ত দ্বারা আক্রান্ত ও বিপন্ন হইবার যে ভয় আছে উহা ডাক্তারগণের কথা দ্বারাই প্রতিপন্ন হয়। কারণ, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে জীবনে ২ বার টিকা লইতে হইবে, আবার, কেহ কেহ বলেন যে প্রত্যেক ৫ম বা ৭ম বৎসর অন্তর

পুনঃ আক্রান্ত হইতেছে। তাঁহারা বলেন যে, ইংরেজী টিকা বসন্তের আক্রমণের ত বাধা দিতে পারেই না, অধিকন্ত উপকারের পরিবর্ত্তে স্বীয় অস্বাভাবিক উত্তেজনা দ্বারা দেহকে আরও বসন্তরোগ-প্রবণ করিয়া তুলে।

আজীবন টিকা লইতে হইবে,—অর্থাৎ কোন কথারই যেন নিশ্চয়তা নাই। তবে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত নিশ্চয় করিয়া কিছু ঠিক্ না হইতেছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ইংরেজী টিকাই ভাল, আর বাঙ্গলা টিকাই অপকারক, ইহা কি প্রকারে বলিতে পারি? ১০০ জনের মধ্যে সকলেরই যদি বসন্ত হইবার আশঙ্কা থাকে বা তাহাদের মধ্যে কতক লোক ইংরেজী টিকা লওয়া সত্বেও বসন্তরোগে মারা পড়ে, তবে "ইংরেজী টিকা লওয়ার দরুণ কাহারও মৃত্যু হয় না" ইহা কি উক্ত টিকার গুণ বলিতে হইবে? উক্ত মৃদু টিকা লইলে যেমন মৃত্যু হয় না, টিকা না লইলেও ত কেহ ব্যারাম না হওয়া পর্য্যন্ত মরে না। এদেশের সর্ব্বসাধারণেরই বিশ্বাস যে বাঙ্গলাটিকা লইলে, আর এজীবনে কাহারও বসন্ত হয় না। তবে কদাচিৎ দুই একজনের হইতেও পারে। এখানে একটী আপত্তি এই হইতে পারে যে, বাঙ্গলা টিকা লইলে হাজার করা ২।১ জনেরও যদি বসন্ত হইয়া মৃত্যু হয়, তবে লোকে উক্ত টিকা লইবে কেন? ইহার উত্তর এই যে যখন ইংরেজী টিকা বাস্তবিক বসন্তের প্রতিষেধক কি না এবং প্রতিষেধক হইলেও গ্রীষ্মপ্রধান দেশে—যেখানে শীতপ্রধান দেশ অপেক্ষা বসন্তের প্রাদুর্ভাব বেশী, তথায় ঐরূপ মৃদুবীর্য্যটিকা কার্য্যকরী কি না তাহা এখনও নিঃশেষে স্থিরীকৃত হয় নাই, তখন আমাদের মনে হয় যে টিকা লওয়ার বিষয়ে যাহার যেরূপ টিকা লওয়ার ইচ্ছা, সেই বিষয়ে তাহাদিগকে স্বাধীনতা দেওয়া মন্দ নহে।

ইংরেজী টিকার সাপক্ষে আর একটি যুক্তি এই আছে যে উহা লওয়ার পর ভবিষ্যতে বসন্ত হইতে পারে বটে, কিন্তু সেই বসন্ত মারাত্মক হয় না। এ কথার বাস্তবিক কোন সারবত্তা আছে কি না, তাহার প্রমাণ আমরা এ পর্য্যন্ত পাই নাই। আর, এবারে কলিকাতার মহামারীই ঐ যুক্তির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়াছে।

৩। বাঙ্গলা টিকা লওয়ার অসুবিধা।

ডাক্তারগণ বলেন যে, "কোন কোন স্থলে রোগীর শরীরের অবস্থা এরূপ থাকে যে, দেশী টিকা লইলেও স্বাভাবিক বসন্তের ন্যায় সমস্ত লক্ষণ দেখা দেয় এবং কোন কোন সময়ে মৃত্যুও হইতে পারে।" ইহার উত্তর আমরা ইতিপূর্ব্বেই একপ্রকার দিয়াছি। অর্থাৎ এরূপ ঘটনা উভয় প্রকারের টিকাতেই ঘটিতে পারে। বাঙ্গলাটিকায় টিকা দেওয়ার স্থান ব্যতীতও শরীরে ২।৪।১০টা বসন্ত বাহির হয় সত্য, কিন্তু উহারা মৃদুপ্রকৃতির। টিকা দেওয়ার উদ্দেশ্যই হইল, শরীরে ঐ মৃদুপ্রকৃতির কৃত্রিম বসন্ত উৎপাদন করা। বসন্ত একবার হইলে জীবনে আর প্রায় দ্বিতীয়বার হয় না, বসন্তের প্রকৃতির এই পরিচয় পাইয়াই টিকা দেওয়ার প্রথা চলিত হইয়াছে। বাঙ্গলাটিকায় আদত বসন্ত উঠে অথচ আদত বসন্ত হইতে উহা মৃদুপ্রকৃতির হয় এবং এই কারণেই বাঙ্গলাটিকা দেয়। যে উদ্দেশ্যে টিকা দেওয়া হইয়া থাকে যদি তাহাই সিদ্ধ না হয়, তবে ইংরেজী টিকা দিয়া অনর্থক সুস্থ শরীরকে ব্যস্ত করার দরকারই বা কি, আর লাভই বা কি?

৪। বাঙ্গলাটিকাতে রোগীর কষ্ট বেশী হয়।

ইংরেজী টিকার সহিত তুলনা করিলে বাঙ্গলা টিকায় রোগীর কষ্ট বেশী হয় বলিয়া ডাক্তারগণ বলেন। "কষ্ট বেশী হয়" অর্থে পাঠক সিংহ ব্যাঘ্রাদির মূর্ত্তি মনে মনে অঙ্কিত করিবেন না। মৎস্য ও মাংসাদি আহার ত্যাগ করা ও কয়েক দিন বাটীতে আবদ্ধ হইয়া থাকা ভিন্ন আর বেশী কিছু কষ্ট হয় না। তবে কোন কোন স্থলে জ্বরাদির ভোগ কিছু বেশী হইতে পারে। আর যদিই বা জ্বরাদির ভোগ কিছু বেশী হয়, তাই বলিয়া আদত বসন্তের যন্ত্রণার মত কোন প্রকারের যন্ত্রণাই হয় না। ডাক্তার-মহাশয়দিগের সুতীক্ষ্ণ ও সুতীব্র অস্ত্রাঘাত সহ্য করিয়াও যদি দুরন্ত ও

দুশ্চিকিৎস্য নালি ঘা হইতে চিরজীবনের জন্য অব্যাহতি পাওয়া যায়, তবে মন্দই বা কি? কোন অঙ্গ সম্পূর্ণ ছেদ করিয়াও যদি ভাবী নিশ্চিত মৃত্যু হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়, তবে উহার অল্লাধিক যন্ত্রণা একবারের জন্য সহ্য করা বা ঐরূপ অঙ্গছেদের ক্ষতি স্বীকার করাও বরং ভাল, তথাপি সম্পূর্ণ অঙ্গছেদের কষ্টের বা ক্ষতির ভয়ে, ভাবী অনিষ্টকর মৃদু ও নামমাত্র অস্ত্রোপচার বোধ হয় প্রার্থনীয় নহে। বসন্তরোগ যেমন ব'নোওল, বাঙ্গলা টিকাও তেমনি বাঘা তেঁতুল, তবে একটু বেশী টক্ বোধ হয় এই মাত্র। আর একটু বেশী টক্ বোধ হয় বলিয়াই উহা, বন্যওল কর্ত্তৃক ভয়ানক গলাধরার যন্ত্রণার সহজে প্রতীকার করিতে সমর্থ হয়। রোগ আরাম করিতে হইলে যেমন যথামাত্রায় ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয় অর্থাৎ ঔষধের মাত্রা কম বা বেশী হইলে ঔষধ যেমন রোগ দমনে সমর্থ হয় না, প্রত্যুত সময় সময় অনিষ্টও করিতে পারে, টিকা সম্বন্ধেও সেইরূপ বুঝিতে হইবে। শাস্ত্রে আছে—

"নাল্পং হন্ত্যৌষধং ব্যাধিং যথাল্পাম্বু মহানলম্।
দোষবচ্চাতিমাত্রং স্যাৎ শস্যমত্যুদকং যথা॥"

অর্থাৎ যেমন অত্যন্ত প্রজ্জ্বলিত অগ্নির উপর, কয়েক ছিটা জল দিলে অগ্নি নির্ব্বাপিত হয় না, তদ্রূপ মহৎ রোগে অল্পমাত্রায় ঔষধ প্রয়োগ করিলেও ফল হয় না এবং ক্ষেত্রে অধিক জল হইলে যেমন শস্যের ব্যাঘাত জন্মে, তদ্রূপ সামান্য রোগে অধিক মাত্রায় ঔষধ প্রয়োগ করিলেও রোগী বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে।

Shakespear says—"Diseases desperate grown,
By desperate appliances are relieved.
Or none at all."

উৎকট ব্যারামে যেমন তীব্র ঔষধ প্রয়োগ করার দরকার, প্রতিষেধক ঔষধ সম্বন্ধেও তেমনি নিশ্চিত-ফলদায়ক ব্যবস্থা করা দরকার।

৫। বাঙ্গলাটিকায় সংক্রামক হইবার ভয় আছে।

ডাক্তারগণ বলেন যে পূর্ব্বে যখন বাঙ্গলা টিকা দিত, ঐ সময়ে সংক্রামক হওয়ার ভয়ে, গ্রামের সমস্ত লোককে একবারে টিকা দেওয়া হইত। আমরা বহুলোকের নিকট বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছি যে, সংক্রামক হওয়ার ভয়েই যে গ্রামশুদ্ধ লোককে একসঙ্গে বাঙ্গলাটিকা দিত তাহা ঠিক নহে। টিকার বীজ সংগ্রহ করার অভাব বশতঃ ঐরূপ করিত। কারণ, কাহারও আদত বসন্ত না হইলে বাঙ্গলা টিকার জন্য বীজ লওয়া যায় না। আর, বীজ দিতে গেলে, রোগী একটু দুর্ব্বল হয় এবং বিরক্তও হয়। এইজন্য সকল বসন্তরোগী বীজ দিতে স্বীকারও করিত না। বাঙ্গলাটিকার জন্য আদত বসন্তরোগও হওয়া চাই এবং রোগীর বীজ দিতে সম্মতিও চাই। কাজেই ঐরূপ করা হইত। তবে, আদত বসন্ত-রোগ যেমন সংক্রামক, বাঙ্গলা টিকা তদ্রূপ না হইলেও কতকটা এবং কোন কোন স্থলে যে সংক্রামক ক্রিয়া প্রকাশ করিত না, এমত আমরা বলিতেছিনা। বাঙ্গলাটিকা লইলে যে সংক্রামক হওয়ার ভয় আছে, উহা কি অন্য কোন রূপে নিবারিত হইতে পারে না? আর যদিই বা, উহা নিবারিত হইবার কোন উপায় হইবেনা বলিয়া আপাততঃ বোধ হয়, তথাপি উৎকৃষ্টতর উপায় আবিষ্কৃত না হওয়া পর্য্যন্ত বোধ হয় বাঙ্গলা-টিকা লওয়া লোকের ইচ্ছাধীন করিলে মন্দ হয় না। প্রাণরক্ষার্থ অঙ্গচ্ছেদ করিলে, হয়ত অঙ্গচ্ছেদের দরুণ ধনুষ্টংকার হইয়া রোগী মরিয়াও থাকে, তথাপি রোগীর যাহা ইচ্ছা সে তাহাই করিয়া থাকে, ঐ বিষয়ে কাহাকেও বাধ্য করা হয় না। তবে, বাঙ্গলা টিকা লইলে বাস্তবিকই যদি উহা স্থল বিশেষে সংক্রামক হইয়া পার্শ্বের বাটীর লোকের ক্ষতি করে তবে তাহার কি হইবে? এই আপত্তির উত্তর এই যে, টিকা না লইলেও যদি বসন্ত হয়, তবে রোগীর বাটীতে রোগী যেমন আবদ্ধ থাকে এবং পার্শ্ব

বর্ত্তী লোকে যেমন উহা সহ্য করে, বাঙ্গলাটিকার বিষয়েও সেইরূপ করিতে হইবে। বরং এরূপ নিয়ম করা বোধ হয় কর্ত্তব্য যে আদত বসন্ত হইলে বা বাঙ্গলাটিকা লইলে, সুস্থ না হওয়া পর্য্যন্ত কেহ যেন বাটীর বাহির না হয়। আর, এই নিয়ম বিধিবদ্ধ করিবার কোন দরকারও নাই। কারণ, পূর্ব্বে যখন বাঙ্গলাটিকা দেওয়া হইত, তখন এই সমস্ত নিয়মও প্রতিপালিত হইত।

৬। সকল দেশের পক্ষে একপ্রকার ব্যবস্থা মঙ্গলপ্রদ কি?

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে ইউরোপে পূর্ব্বে অনেক লোক মারা যাইত, কিন্তু ইংরেজীটিকার প্রচলন হওয়া অবধি বসন্তরোগীর মৃত্যুসংখ্যা অনেক হ্রাস হইয়াছে। বাঙ্গলাটিকা দিলেও কি বসন্ত রোগীর মৃত্যু-সংখ্যা সেইরূপ নিবারিত হইত না? বসন্তের দরুণ ইউরোপে অনেক লোক মরিত সত্য বটে, কিন্তু বাঙ্গলাটিকা লওয়ার দরুণ মরিত কি? *

---

* হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাবিজ্ঞান নামক পুস্তকে আছে --

Lady Montague (wife of Lord Montague, British Ambassador at the Court of Constantinople in Turkey) in 1717 wrote this letter from Constantinople "Every year thousands undergo this operation (*i.e.* inoculation) and the French Ambassador says pleasantly that they like the small-pox here by way of diversion, as they take the water in other countries. There is no example of anyone that has died in it and you may believe, I am very well satisfied of the safety of the experiment, since, I intended to try it on my dear little son." (The Letters and Works of Lady Mary Montague).

অর্থাৎ প্রত্যেক বৎসরই সহস্র সহস্র লোকের এইরূপ টিকা হইয়া থাকে। ফরাসী রাজদূত বলেন যে এখানকার লোকে আমোদ করিয়া টিকা লইয়া থাকে। টিকা

আর, সকল দেশের পক্ষেই একপ্রকার ব্যবস্থা মঙ্গলপ্রদ নহে। শীত-প্রধান দেশ অপেক্ষা গ্রীষ্মপ্রধান দেশেই বসন্তের প্রকোপ বেশী দেখা যায়। শীতপ্রধান দেশের ধাতের পক্ষে যাহা উপকারক, গ্রীষ্মপ্রধান দেশের ধাতের পক্ষেও কি সকল অবস্থাতেই তাহা উপকারক হইবে? শীতপ্রধান দেশবাসিদের (যেমন, কাবুল ও ইংলণ্ডবাসিদের) রক্ত-প্রধান ধাত। রক্তের গতিকেই শরীর গরম থাকে। রক্ত বেশী না থাকিলে এবং কাজেই শরীর গরম না থাকিলে, উহারা অত শীত সহ্য করিতে পারিবে না বলিয়াই যেন পরমেশ্বর উহাদিগকে ঐরূপ ধাতের করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। অত্যন্ত গ্রীষ্মপ্রধান দেশবাসিদের (যেমন, আবিসিনিয়া দেশবাসিদের) বায়ুপ্রধান ধাত অর্থাৎ শরীর শীতল। কারণ, বায়ু নিজে শীতল। শরীর শীতল না হইলে উহারা অত গরম সহ্য করিতে পারিত না। আমাদিগের ধাত বাতশ্লৈষ্মিক। কোন কোন বিষয়ে শীত-প্রধান দেশে যাহা যে কারণে উপকারক, আমাদের দেশে তাহা ঠিক সেই কারণেই অপকারক হয়। শীতপ্রধান দেশে মদ, মাংস প্রভৃতি ব্যবহার করা অত্যাবশ্যকীয় কর্ম্ম,কারণ, উক্ত খাদ্যাদি পিত্তবর্দ্ধক হওয়াতে শরীর গরম রাখে, কাজেই বাতব্যাধি প্রভৃতি কঠিন রোগাদি আক্রমণ করিতে পারে না। এদেশে ঐ সমস্ত জিনিষ ব্যবহার করিলে প্রায়ই পিত্তের বিকৃতি (লিভারের দোষ) সংঘটিত হয়। মৃদুবীর্য্য গোবীজ-টিকা শীতপ্রধান দেশে,—যেখানে পিত্তকর জিনিষ সর্ব্বদা ব্যবহার করা-তেও পিত্তের বা রক্তের বৈগুণ্য কম হয় এবং কাজেই বসন্তের প্রকোপও কম দেখা যায়,—তথায় উপকারী হইতে পারে, কিন্তু গ্রীষ্মপ্রধান দেশে,—যেখানে গ্রীষ্মাতিশয্য প্রযুক্ত পিত্তকর জিনিষ প্রায়শঃ ব্যবহার না

দেওয়া বশতঃ কখন কাহারও মৃত্যু হইতে শুনা যায় নাই। এইরূপ টিকা দেওয়ায় যে কোন প্রকারের আশঙ্কার কারণ নাই আমি তাহা নিশ্চয় করিয়া জানিয়াছি এবং আমার পুত্রের টিকা দিব স্থির করিয়াছি।

করিলেও পিত্ত বা রক্ত সহজেই বৈগুণ্য প্রাপ্ত হয় এবং বসন্তের মহামারী ব্যাপার হয়, সেখানে মৃদুবীর্য্য ইংরেজী টিকা হইতে উগ্রবীর্য্য বাঙ্গলাটিকা-রই বেশী দরকার হওয়া সঙ্গত বলিয়া মনে হয়, এবং ঐ কারণেই সম্ভবতঃ পূর্ব্বে গোবীজটিকা এদেশে প্রচলিত থাকিলেও উহার অনুপযোগিতা উপলব্ধি করিয়া শাস্ত্রকারগণ বাঙ্গলাটিকার প্রাধান্য সংস্থাপন করিয়া গিয়াছিলেন।

৭। "যে স্থলে বহুদিবস পরীক্ষা না করিলে কোন যুক্তির সারবত্তা বুঝা যাইতে পারে না, অথচ পরীক্ষাকাল পর্য্যন্ত যুক্তি-মূলক উপদেশের উপরই নির্ভর করিতে হইবে, আবার, বহুকাল পরীক্ষা করিলে অনর্থক অনেক লোকের প্রাণহানিরও সম্ভাবনা আছে,সে স্থলে আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য ঋষিগণের আদেশের উপরই নির্ভর করা উচিত, কি আজ কালের বিদ্বান্ ও জ্ঞানী ডাক্তার মহাশয়-দের উপদেশের উপরই নির্ভর করা লোকের পক্ষে অধিকতর শ্রেয়স্কর ? আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য ঋষিগণের অর্জ্জিত জ্ঞান এবং আজ কালের ডাক্তারগণের অর্জ্জিত জ্ঞানের কোন পার্থক্য আছে কি না ? যদি থাকে, তবে কি কারণে, কাহাদের উপদেশের উপর নির্ভর করা লোকের পক্ষে অধিকতর মঙ্গলজনক হইবে ?"

এই সকল বিষয়ে আমাদের মন্তব্য ও বড় বড় ডাক্তারগণের মতামত আমরা নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

আজ কাল আমরা অনেকেই মুখে যাহা ভাল লাগে তাহাই খাই বা যেটী আমাদের সহজজ্ঞানে ভাল বলিয়া বোধ করি, তাহাই সমাজে প্রচার করিয়া থাকি। ২।৪টী বা ১০।২০ বিশ স্থলে পরীক্ষা করিয়াই কোন একটী স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হই এবং উহাই অভ্রান্ত সত্য বলিয়া

সমাজে প্রচলন করিতে ইচ্ছা করি। এরূপ অনেকগুলি সত্য আছে (যেমন, ঔষধাদির পরীক্ষাবিষয়ক সত্য) তাহা বাস্তবিক সত্য কি না, বহুকাল পরীক্ষা না করিলে উহাদের সত্যাসত্য, গুণ দোষ বুঝা যায় না। লোকের স্বভাবই এই যে, কেহ কোন এক বিষয়ে বিদ্বান্ হইলে, সকল বিষয়ই তিনি ভাল বুঝেন ভাবিয়া লোকে তাহার পরামর্শ গ্রহণ করিয়া থাকে। ইউরোপবাসিগণ কোন কোন বিষয়ের জ্ঞানগরিমায় আধুনিক জগতের শীর্ষস্থান অধিকার অরিলেও এবং সর্ব্বদা সত্যতত্ত্বান্বেষী, অনু-সন্ধিৎসু, অধ্যবসায়শীল ও জ্ঞানার্জ্জনোচিত উপকরণাদিসম্পন্ন হইলেও, প্রাচীন ঋষিদিগের নিকট আয়ুর্ব্বেদ, জ্যোতিষ ও আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানাদি অনেক বিষয়ে, অজাতশ্মশ্রু বালক বই আর কিছুই নহেন। লোকে কথায় বলে যে ৪০ পার না হইলে মানুষ, মানুষ হয় না। অতি অল্পদিন হইল ইউরোপে জ্ঞানালোক বিস্তৃত হইয়াছে। সহজজ্ঞানবাদী তাঁহাদের উপ-দিষ্ট জ্ঞানাদি বাস্তবিক জ্ঞান কি না, কে তাহার বিচার করিবে? *

---

* আমাদের এই উক্তি যে নিতান্ত অসার নহে তাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য আমরা রোগ-নির্ণয়, ঔষধ-প্রয়োগ ও ঔষধাদির পরীক্ষা (Experiment) বিষয়ে ইউরোপের অসংখ্য বড় বড় ডাক্তারগণের মধ্যে কয়েক জনের মতামত "কবিরাজ-ডাক্তার-সংবাদ" ও "চিকিৎসা-সম্মিলনী" হইতে উদ্ধৃত করিলাম,—

1. Dr. Baillie of London says—"I have no faith whatever in medicine."

2. Professor Evans, Fellow of the Royal College of London, says—"The medical practice of our day is at the best *a most uncertain and unsatisfactory system; it has neither philosophy nor commonsense to commend it to confidence.*"

3. Benjamin Rush. M. D., formerly Professor in the First Medical College in Philadelphia, says—"I am incessantly led to make an apology for the instability of the theories and practice of physic.

অবশ্য আমাদের বলিবার উদ্দেশ্য এরূপ নহে যে, তাঁহারা যাহা যাহা উপদেশ দিতেছেন, তাহার সমস্তই অন্তঃসারবিহীন। সকল জাতির বিজ্ঞানাদির মধ্যেই অল্লাধিক সত্য নিহিত আছে। তবে, আপাতদৃষ্টিতে সত্য বলিয়া প্রতীয়মান কোন মত প্রচারের জন্য, পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট ও বহুকাল

Those physicians become the most eminent, who have most thoroughly emancipated themselves from the tyranny of the schools of medicines. *Dissections daily convince us of our ignorance of disease and cause us to blush at our prescriptions.* What mischiefs have we not done under the belief of *false facts and false theories?* We have assisted in multiplying diseases ; we have done more ; *we have increased their fatality.*"

4. Professor Gregory of Edinburgh, Scotland, says—"Gentlemen, *ninetynine out of a hundred medical facts are medical lies, and medical doctrines are, for the most part, stark, staring non-sense.*"

5. Dr. Ramage, Fellow of the Royal College, London, says—"It can not be denied that ihe present system of medicine is a burning shame to its Professors, if indeed, *a series of vague and uncertain incongruities deserves to be entitled by that name.* How rarely do our medicines do good ! How often do they make our patients really worse ! *I fearlessly assert, that in most cases, the sufferer would be safer without a physician than with one.* I have seen enough of the malpractice of my professional brethren to warrant the strong language I use."

6. Dublin Medical Journal writes—"Assuredly the uncertain and the most unsatisfactory art that we call Medical science, is no science at all, but *a jumble of inconsistent opinions, of conclusions hastily and often incorrectly drawn, of facts misunderstood or per-*

হইতে সমাজে প্রচলিত মত উপেক্ষা করা বা উহা পরিত্যাগ করা কতদূর সমীচীন তাহা জ্ঞানী মাত্রেই বুঝিতে পারেন। "আপাতরম্যা বিষয়াঃ পর্য্যন্তপরিতাপিনঃ।" অর্থাৎ আপাতরম্য বিষয়সকল পরিণামে পরিতাপ

---

verted ; of comparisons without analogy ; of hypothesis without reason and *theories not only useless but dangerous* "

7. Sir John Forbes M. D. F. R. S. Physician to Qeen Victoria, says—"Some patients get well with the aid of medicine, more without it, and still more *inspite of it.*"

8. John Masson Good. M. D. F. R. S, says—"The science of medicine is a barbarous jargon and the effects of our medicines on the human system in the highest degree uncertain, except, indeed, that they have destroyed more lives than war, pestilence and famine combined."

9. James Johnson M. D. F. R. S, Editor of the Medical Chirurgical Review—"I declare as my conscientious conviction, founded on long experience and reflection, that if there was not a single physician, surgeon man-midwife, chemist, apothecary, druggist, nor, drug on the face of the earth, there would be less sickness and less mortality than now prevail."

10. ডাক্তার গিলমেন্—Professor C. A. Gilman M. D. of the New York College of Physicians and Surgeons—বলেন—"বয়স হইলে যে সকল রোগ হয়,তাহা শৈশব বা বাল্যকালে এ্যালোপ্যাথী ঔষধ ব্যবহারের ফল ভিন্ন আর কিছুই নহে।"

11. ডাক্তার পার্কার—Professor W. Parker M. D. of the same school—বলেন—"যত প্রকার বিজ্ঞান আছে তন্মধ্যে এই এ্যালোপ্যাথী চিকিৎসা-বিজ্ঞান, যেরূপ অনিশ্চিত, সেরূপ আর কোন বিজ্ঞান নহে।"

12. Dr. Frank, an eminent European Author and Practitioner says—"সহস্র সহস্র লোক বৎসর বৎসর নিভৃত চিকিৎসালয়ে-হত হইয়া

প্রদান করিয়া থাকে। মৃদুবীর্য্য বলিয়া ইংরেজী টিকা আপাততঃ কষ্টকর নহে বটে, কিন্তু উহা গ্রহণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে পরিণামে পরিতাপের কারণ হইতে পারে। "সূচিকাভরণরস" প্রাণনাশক তীব্র সর্পবিষাদি

থাকে। গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য, চিকিৎসকগণকে দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করুন এবং নিয়ম করুন যে তাহাদিগের ভ্রমপূর্ণ বিদ্যার আর কেহ চর্চ্চা করিতে পারিবেনা।"

&c. &c. &c. ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি।

মন্তব্য—উপরোক্ত মতগুলি পর্য্যালোচনা করিলে বুঝা যায় যে, কি ঔষধের উপকারিতার বিষয়ে, কি আভ্যন্তরীণ যন্ত্রাদির ক্রিয়াকৌশলপরিজ্ঞান বিষয়ে অথবা চিকিৎসা-বিষয়ক অন্য কোন পদ্ধতি বিষয়ে বড় বড় ডাক্তারগণ, অনেক বিষয়ে এ পর্য্যন্ত কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। কাজেই তাঁহাদিগের মতে—তা, বসন্তের টিকা লওয়ার বিষয়েই হউক, কি, চিকিৎসার অন্য কোন বিষয় সম্বন্ধেই হউক,—সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা যাইতে পারে না।

তবে, এখানে একটী আপত্তি এই হইতে পারে যে, ডাক্তার বেইলি ও ক্লার্ক প্রভৃতি সাহেবদের মতের ন্যায় তোমার চরকেও ত এরূপ সন্দেহযুক্ত মতাদির উল্লেখ দৃষ্ট হয়, যথা—"তস্মেবজং যুক্তিযুক্তমলমারোগ্যায়েতি ভগবান্ পুনর্ব্বসুরাত্রেয়ঃ। নেতি মৈত্রেয়ঃ। কিং কারণম্? দৃশ্যন্তে হ্যাতুরাঃ কেচিদুপকরণবন্তশ্চ পরিচারকসম্পন্নাশ্চাত্মবন্তশ্চ কুশলৈশ্চ ভিষগ্‌ভিরনুষ্ঠিতাঃ সমুত্তিষ্ঠমানাঃ। তথা যুক্তাশ্চাপরে ম্রিয়মাণাঃ তস্মাদ্ ভেষজম-কিঞ্চিৎকরং ভবতি।" ইত্যাদি। স্থূলতঃ ইহার অর্থ এই যে, অত্রিনন্দন ভগবান্ পুনর্ব্বসু বলিলেন যে, যদি চিকিৎসা সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়, তবে নিশ্চয়ই রোগের উপশম হইয়া থাকে। মৈত্রেয় ঋষি ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন যে, না, এই সিদ্ধান্ত সকল স্থলেই খাটিতে পারে না। যেহেতু অনেক স্থলে এরূপও দেখা যায় যে, উপকরণাদি-সম্পন্ন ও সুচিকিৎসক কর্ত্তৃক চিকিৎসিত অনেক রোগী যেমন আরোগ্য লাভ করে, আবার অনেক রোগী তেমনি যমালয়েও গমন করিয়া থাকে। এই সমস্ত প্রত্যক্ষ করিলে চিকিৎসা অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হয়। ইত্যাদি।

মুনি ঋষিদের এইরূপ তর্ক বিতর্ক ও মতভেদের বিষয়ে আমাদের মন্তব্য আমরা পরে সবিস্তারে উল্লেখ করিয়াছি। (যুক্ত ও যুঞ্জান যোগিদের জ্ঞানের পার্থক্যের বিষয়

যোগে প্রস্তুত হইলেও অন্তিমকালে বায়ু ও শ্লেষ্মার প্রবল আক্রমণ হইতে রোগীকে রক্ষা করিয়া থাকে। আদার রস মৃদুবীর্য্য বলিয়া, বাতশ্লেষ্মঘ্ন হইলেও অন্তিম সময়ে বায়ু ও শ্লেষ্মার প্রবল আক্রমণের বাধা দিতে পারে

পরে দেখ)। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে যুক্তি (argument) না থাকিলে যথার্থ সায়েন্স (Science) বা শাস্ত্র হয় না। আর, আয়ুর্ব্বেদের সর্ব্বাংশে যুক্তিও লক্ষিত হয় না। কিন্তু, সাধারণ মানববুদ্ধির অপূর্ণতা বশতঃ আজ যে বিষয়ের যুক্তি লক্ষিত হইতেছে না, ভবিষ্যতে চিন্তাদ্বারা বা অন্য কোন উপায়ে যে সেই বিষয়ের যুক্তি উদ্‌ভাবিত হইবে না বা হইতে পারে না, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। তবে,প্রত্যক্ষই সায়েন্‌স বা শাস্ত্রের মূলভিত্তি সন্দেহ নাই। চরক, আপ্তোপদেশ, প্রত্যক্ষ, অনুমান ও যুক্তি এই ৪ প্রকার প্রমাণ স্বীকার করেন। "আপ্তোপদেশঃ প্রত্যক্ষানুমানং যুক্তিশ্চেতি।" এই ৪ প্রকার প্রমাণের মধ্যে প্রত্যক্ষ ও যুক্তিই আমাদের মনে বেশ লাগে অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ও যুক্তিগত প্রমাণ দ্বারাই আমরা বিশেষরূপে সন্তুষ্ট হই। আবার, প্রত্যক্ষের ত কথাই নাই। কিন্তু, প্রত্যক্ষের বিষয়ে নিম্নলিখিতরূপ বাধা বা ভ্রান্তি জন্মিতে পারে ; যথা—(১) অতি নিকটের বস্তু (যেমন, লোচনস্থ কৃষ্ণভাগ বা কজ্জল) আমরা দেখিতে পাই না। (২) অত্যন্ত দূরের বস্তু (যেমন, সমুদ্রগর্ভস্থ জাহাজ) আমরা দেখিতে পাই না। (৩) কোন বস্তু আবরণে আবৃত থাকিলে আমরা দেখিতে পাই না। (৪) ইন্দ্রিয়ের দৌর্ব্বল্য হইলে বস্তুর স্বরূপ আমরা প্রত্যক্ষ করিতে পারি না (যেমন, কামলা রোগে সমস্ত বস্তুই হলুদে দেখায়)। (৫) মনঃসংযোগের অভাব বশতঃ নিকটের বস্তুও দেখা যায় না। (৬) অভিভব—এক পদার্থের দ্বারা অন্য পদার্থ অভিভূত হইলে (যেমন নক্ষত্রগুলি দিনেও বর্ত্তমান থাকে এবং রাত্রেও বর্ত্তমান থাকে, কিন্তু, সূর্য্যকিরণে নক্ষত্রের তেজ অভিভূত হয় বলিয়া মধ্যাহ্নে নক্ষত্রগুলি আমাদের দৃষ্টি পথে পড়ে না) তাহা দেখা যায় না। (৭) অতি সূক্ষ্ম বস্তু (যেমন, পরমাণু) চক্ষুর গোচর হয় না। ইত্যাদি। প্রত্যক্ষের এই সমস্ত দোষ ঘটিতে পারে। এখন দেখ, যুক্তির সারবত্তা কতদূর—কেবল যুক্তি দ্বারা চিকিৎসা করিলে কার্য্যক্ষেত্রে বিষম গোলযোগ উপস্থিত হইতে পারে। যুক্তির যেরূপ গুণ আছে, উহার দোষও তদ্রূপ কম নহে। যুক্তির মধ্যে সময় সময় এমন হেত্বাভাস (Fallacy or fallacious argument) উপস্থিত হইতে পারে যে, তাহার কুহকিনী শক্তিতে, মরুভূমে জলভ্রমের মত, যে সকল হেতু প্রকৃতপক্ষে হেতু নয়, তাহাও আপাত

না। আজ কালের লোকের প্রায় সকল বিষয়েই সাধারণ জ্ঞান আছে। কিন্তু, সকল বিষয়েই পল্লবগ্রাহিতার পরিচয় পাওয়া গেলেও কাহারও প্রায় কোন একটী বিষয়েও পূর্ব্বকালীন ঋষিদের মত গভীর ও নির্ম্মল জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় না। * আর, আজ কালের লোকের গভীর ও ভ্রমপ্রমাদশূন্য জ্ঞান থাকিবেই বা কিরূপে? রীতিমত শিক্ষা না করিলে সেই শক্তি, সেই জ্ঞান কোথা হইতে আসিবে? "If a man performs

---

বুদ্ধিতে হেতু বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে এবং মানুষ দিনকে রাত্রি ও রাত্রিকে দিন বলিয়া মনে করিতে পারে। এইজন্যই হিন্দু-শাস্ত্রকারগণ যুক্তির প্রতি বিশেষ অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, যথা—

"প্রত্যক্ষলক্ষণফলাঃ প্রসিদ্ধাশ্চ স্বভাবতঃ।
নৌষধির্হেতুভি র্বিদ্বান্ পরীক্ষেত কথঞ্চন॥
সহস্রেণাপি হেতুনাং নাম্বষ্ঠাদিবিরেচয়েৎ।
তস্মাত্তিষ্ঠেত্ত মতিমান্ আগমে নতু হেতুষু॥"

সুশ্রুত।

অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত ঔষধি সকল প্রত্যক্ষ-লক্ষণ ও প্রত্যক্ষ-ফল। উহারা স্বভাবতঃ প্রসিদ্ধ। ঐ সকল ঔষধি আগমবিরুদ্ধহেতুসমূহ সহকারে কখনই পরীক্ষা করিবেনা। সহস্র হেতু প্রদর্শন করিলেও অম্বষ্ঠাদি (আকনাদি প্রভৃতি) ঔষধ সমূহ কখনও বিরেচক হইবেনা। অতএব মতিমান্ ব্যক্তি শাস্ত্রের অনুসারী হইবেন, হেতু-সমূহে আস্থাবান্ হইবেন না।

* কেহ কেহ, বিশেষতঃ যাঁহারা হার্ব্বাট্‌স্পেন্‌সরী বিবর্ত্ত-বাদী (Evolution এর পক্ষপাতী), যাঁহারা মনে করেন যে পৃথিবী ক্রমশঃ উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে এবং সেইজন্য লোকের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মাদির ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে ও জগতের সভ্যতা ক্রমশঃ স্ফুটতর হইতেছে,—তাঁহারা মনে করিতে পারেন যে আমরা অযথা অতীতের প্রশংসাকারী, (We have an unreasonable admiration for the Past.) তাঁহাদের জন্য আমাদের বক্তব্য এই যে, তাঁহারা যেন ধীরতা সহকারে আমাদের এই প্রবন্ধের শেষ পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া, যাহা হয় কোন একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েন।

the duties of each mode of life in a regular order, he is sure to enjoy happiness in this world and eternal beatitude in the next. The proper discharge of the duties of each mode of life qualifies a man for the satisfactory performance of those attached to the next." (Vide Domestic Duty......Four Asramas.) প্রথমে ব্রহ্মচর্য্য, পরে গার্হস্থ্য, তৎপরে বানপ্রস্থ ও সর্ব্বশেষে ভিক্ষু আশ্রম গ্রহণ কর, দেখিবে পরিণামে তোমার সকল বিষয়েই প্রগাঢ় জ্ঞান জন্মিবে, শান্তি আসিবে ও সংসার সুখের বলিয়া বোধ করিবে। একটী সামান্য বোঁটাতে আধমণ ফলও গাছে ঝুলিয়া থাকে। ঐ বোঁটা প্রতিদিন একটু একটু করিয়া ভার বহিতে অভ্যস্ত হয় এবং কাজেই পরিণামে উহা অসম্ভবনীয় ভারও বহন করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু অন্য একটী বোঁটাতে ঐ ফলটী যুক্ত করিয়া দিলে দেখিবে যে, ঐ বোঁটা তৎক্ষণাৎ ছিন্ন হইয়া যাইবে। কারণ, ঐ বোঁটা উক্ত ভার বহন করিতে রীতিমত অভ্যস্ত হয় নাই। রীতিমত শিক্ষা ও অভ্যাসাদিদ্বারা দেহ ও মন গঠিত হইলে, কি দেহের, কি মনের, এত উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারে যে, সামান্য বুদ্ধি বিদ্যা সম্পন্ন, ক্ষুদ্রহৃদয় আজ কালের লোক আমাদের পক্ষে সেই উৎকর্ষের ধারণা করাই অসম্ভব হইয়া উঠে। আমরাও মানুষ এবং বেদব্যাসও মানুষ ছিলেন। আজ কালের লোকেও ত নানাপ্রকার কল কৌশলাদি আবিষ্কার করিয়া নানামতে আমাদিগকে চমৎকৃত করিতেছেন। কিন্তু, কই, আজ কালের একটীরও ত সেই বেদব্যাসের মত সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা দেখিতে পাই না। তাঁহার মত, মহাভারতাদি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বই লেখা ও তন্মধ্যে লৌকিক ও আধ্যাত্মিক জটিল বিষয়ের উৎকৃষ্ট সমালোচনা সন্নিবেশ করা দূরে থাকুক, আয়তনে অত বড় বড় বই, যা তা করিয়া লিখিতেও আজ কালের কয়জনে সমর্থ হয়? জড়বিজ্ঞানে বিশেষ

ব্যুৎপত্তিশালী এবং জড়বিজ্ঞানই একমাত্র আরাধ্য ও আলোচ্য বিষয় বলিয়া বিশ্বাসকারী ডাক্তারগণের মতাদি যেমন নলিনীদলগতজলবৎ নিয়ত অস্থির, যোগবলে বলীয়ান্, অতীন্দ্রিয়জ্ঞানসম্পন্ন ঋষিগণের মতাদি সেরূপ ছিল না। * "আয়ুর্ব্বেদ পূর্ব্বাপরই বলিয়া আসিতেছে যে,

---

* ঋষিদিগের শাস্ত্রাদি অনেক দিনের পুরাতন এবং উহাদের উপর দিয়া অনেক ঝঞ্ঝাবাত চলিয়া গিয়াছে, কাজেই মহাভারতাদি গ্রন্থের মত আয়ুর্ব্বেদেও খাটী মালের সঙ্গে অনেক ঝুটা মালও মিশ্রিত হইয়া থাকা অসম্ভব নহে। কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে,

"Errors like straws upon the surface flow,
He who would search for pearls, must dive below."

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, তোমার ঋষিদিগের মধ্যেও ত অনেক মতভেদ দেখা যায়, "নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং" ইত্যাদি। আর, মতভেদ হইলেই বুঝিতে হইবে যে, কাহারও কাহারও মত ভ্রমাত্মক। ঋষিগণ যদি ভ্রমপ্রমাদপরিশূন্যই হইবেন, তবে, তাঁহাদের মধ্যে আবার মতভেদ কেন? বিশেষতঃ তোমার চিকিৎসা-শাস্ত্র সুশ্রুতেই ত শরীরের অঙ্গোৎপত্তির পৌর্ব্বাপর্য্য সম্বন্ধে মুনিঋষিদিগের মধ্যে এইরূপ মতভেদ দেখা যায় যথা--"গর্ভস্য হি সম্ভবতঃ পূর্ব্বংশিরঃ সম্ভবতীত্যাহ শৌনকঃ, হৃদয়মিতি কৃতবীর্য্যঃ, নাভিরিতি পারাশর্য্যঃ, পাণিপাদমিতি মার্কণ্ডেয়ঃ, মধ্যশরীরমিতি সুভূতির্গৌতমঃ। তত্তু ন সম্যক্। সর্ব্বাঙ্গপ্রত্যঙ্গানি যুগপদ্ সম্ভবন্তীত্যাহ ধন্বন্তরিঃ। অর্থাৎ শৌনকের মতে ভ্রূণের মস্তক আগে জন্মে। কৃতবীর্য্যের মতে হৃদয়, পারাশর্য্যের মতে নাভি, মার্কণ্ডেয়ের মতে হস্ত ও পদ, সুভূতি গৌতমের মতে দেহের মধ্যভাগ আগে উৎপন্ন হয়। কিন্তু, ধন্বন্তরি এই সমস্ত মতের প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে, সমুদায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গই এককালে উৎপন্ন হয়।

ইহার উত্তর দুইটী। (১) ঋষিদিগের সকলেই সমান জ্ঞানী ছিলেন না। আর, একজনের মতের সঙ্গে অন্যের মতের অমিল হইলেই ঋষিত্বের ব্যাঘাত হয় না। ঋষিত্ব জাতিগত নহে, উহা গুণগত। যিনি যে পরিমাণে জ্ঞানী, তিনি সেই পরিমাণে ঋষি। (কবিরাজ-ডাক্তার সংবাদ দেখ)। (২) শাস্ত্রে দুইপ্রকার যোগীর উল্লেখ দেখা যায়। প্রথম, যুক্তযোগী এবং দ্বিতীয়, যুঞ্জানযোগী। যুক্তযোগীই আপ্ত বা ভ্রমপ্রমাদশূন্য ঋষি। উহাদের কোন বিষয় জানিতে হইলে অনুমান, যুক্তি প্রভৃতির সাহায্য গ্রহণের আবশ্যক

ক্ষয়রোগ অষ্টাদশ প্রকার। এ স্থলে কেহই আমাদিগকে সাহস করিয়া বলিতে পারেন না যে, ক্ষয়রোগ সপ্তদশ প্রকার বা ঊনবিংশ প্রকার। আবার, ঋষিবাক্যের সর্ব্বত্রই পরিসমাপ্তি আছে। অমুক অমুক রোগের অমুক অমুক লক্ষণ হইতেও পারে, আবার, নাও হইতে পারে, এরূপ অনিশ্চিত ভাষা নাই। ঋষি বলিতেছেন যে, যদি তোমার রাজ-যক্ষ্মা হইয়া থাকে, তবে এই তিনটী লক্ষণ অবশ্যই আছে। যথা,—স্কন্ধ ও পার্শ্বদেশে কখন কখন বেদনা হয়, হস্ত ও পদে দাহ থাকে এবং জ্বর অষ্টপ্রহর থাকে। যদি এই তিনটী লক্ষণের একটীরও অভাব হয়, তবে তোমার মুখ দিয়া রাশীকৃত কফ ও রক্তপূঁজ উঠিলেও তোমার রাজযক্ষ্মা হয় নাই। যদি তোমার যকৃতে বিদ্রধি (Liver Abscess) হইয়া থাকে, তবে তোমার শ্বাস হইতে থাকিবে; যদি তুমি মেদস্বী পুরুষ না হও, তবে তোমার প্রস্রাবে রাশীকৃত চিনি থাকিলেও তোমার মেহ মধুমেহ নহে। যদি তোমার জলোদর হইবার উপক্রম হইয়া থাকে, তবে জলপান পরি-ত্যাগ কর, তাহা হইলে ঐ রোগ জলোদররূপে পরিণত হইবে না। ইত্যাদি গূঢ় রহস্য ও নিশ্চয় সকল আয়ুর্ব্বেদ ভিন্ন কোথাও দেখিতে পাই না। এরূপ জ্ঞান ও যোগ বর্ত্তমান কালে সম্ভবেনা। দেখিলে শুনিলে আমাদের নব্যতাসুলভ অহঙ্কার তিরোহিত হয় এবং ঋষিপদে সবিনয়ে পরাজয় স্বীকার করিতে ইচ্ছা করে।" কেহ কেহ আবার, ঋষিরা কিরূপ জ্ঞানী ছিলেন, কি ভাবে সেই জ্ঞান উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন ইত্যাদি বিষয়ে কখনও ভাবেন না, বা তাঁহাদের ভাবিবার অবকাশও নাই,

---

হয় না। এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের অতীতানাগত বর্ত্তমান সমস্ত বিষয়ই ইহাদের মানস মুকুরে সর্ব্বদা সর্ব্বক্ষণের জন্য প্রতিবিম্বিত থাকিত। দ্বিতীয় প্রকারের যোগীরা নিজে-দের জ্ঞানদ্বারা প্রত্যক্ষ, অনুমান ও যুক্তি প্রভৃতির সাহায্যে বিষয়াদির স্বরূপনির্ণয় করি-তেন। এই জন্যই সময় সময় আমরা মতভেদের দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। ঋষিরা কিরূপে সত্য নির্ণয় করিতেন, সেই বিষয় পরে উল্লেখ করা হইয়াছে।

কিন্তু, পাশ্চাত্য আলোকের বাহ্য চাক্‌চিক্যে নয়ন ঝলসিত হওয়ায়, বাহিরের জিনিষ বেশ সুন্দর ও সুস্পষ্টভাবে দেখিতে পাইলেও ঘরের ভিতরে দৃষ্টিক্ষেপ করিলে অন্ধকার বই আর কিছুই দেখেন না। ফলতঃ "অজ্ঞতা নিজের পথ চিনে না; অন্ধকারের মধ্যে কেবল যে দিকে লোকের কোলাহল শুনে, তাহারই প্রতি আশাপন্ন হইয়া ছুটিতে থাকে, যে দিকে কোলাহল নাই, সে দিকে উত্তম পথ থাকিলেও যাইতে সন্দেহ করে।" ভীম অসাধারণ বলশালী ছিলেন, ইহা এক বৎসর পূর্ব্বেও আরব্যোপন্যাসের গল্পের মত অবিশ্বাস্য ছিল না কি? কিন্তু, আজকাল হাতী বুকে রাখিয়া এবং মটর কারের গতি সদর্পে, স্ববলে প্রতিরুদ্ধ করিয়া, রামমূর্ত্তি নাইডু কি আমাদের ক্ষুদ্রচিত্তের ক্ষুদ্র ধারণাশক্তির একটু বৃদ্ধি করিয়া দেন নাই? * কোন একস্থলে এক নাস্তিক বলিয়াছিলেন যে, ঈশ্বর ফীশ্বর কিছু বুঝা যায় না। তদুত্তরে নিকটস্থ কোনএকটী জ্ঞানী ও ভগবদ্‌ভক্ত মহাপুরুষ বলিলেন যে, যে পৃথিবীতে আমরা বাস করি, নদ নদী, পর্ব্বত কানন, দেশ মহাদেশ, সাগর মহাসাগর সমাবৃত এই পৃথিবীটা না জানি কত বড়। আবাব, বৈজ্ঞানিকের মুখে শুনিতে পাই, সূর্য্য নাকি, পৃথিবী হইতে ১৪ লক্ষ কত হাজার গুণ বড়। আবার, গ্রহ-নক্ষত্রাদি যাহা যাহা আমরা আকাশের গায়ে সামান্য দাগ মাত্র বলিয়া বিবেচনা করি, উহাদের মধ্যে না কি, এমন অনেক নক্ষত্র আছে যাহারা সূর্য্য হইতেও অনেকগুণ বড়। এখন দেখ, লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি নক্ষত্রাদি সমন্বিত, পৃথিবী, সূর্য্য, চন্দ্র ও অন্যান্য গ্রহাদি সমাবেষ্টিত এই যে

* রামমূর্ত্তি নাইডু নামক একজন মান্দ্রাজের পলোয়ান, এবার কলিকাতায় আসিয়া, তাঁহার অসাধারণ বলের পরীক্ষা দিয়া কলিকাতার সর্ব্বসাধারণকে চমৎকৃত করিয়াছেন। তিনি হাতী বুকে রাখিয়া ছিলেন ও মটর-কার নামক গাড়ীর গতি হস্তদ্বারা প্রতিরুদ্ধ করিয়া ছিলেন। ফলতঃ এরূপ পলোয়ান এ পর্য্যন্ত কলিকাতায় আসে নাই। তিনি নিরামিষভোজী মান্দ্রাজী ব্রাহ্মণ।

প্রকাণ্ড বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, ইহা না জানি আরও কত বড়! আবার, যাঁহার মনে এরূপ বিশাল ও এত বড় প্রকাণ্ড জিনিষ তৈয়ার করিবার ধারণা হইতে পারে, যিনি এতবড় প্রকাণ্ড বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তৈয়ার করিতে পারেন, যিনি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র এবং মহৎ হইতেও মহত্তর জিনিষাদির সৃষ্টি করিয়া, এরূপ সুশৃঙ্খলা সহকারে রাখিতে পরিয়াছেন—তিনি না জানি কতই বড়!! আবার, সেই অচিন্তনীয়, ব্যক্ত অথচ অব্যক্ত বিরাট পুরুষের বসিবার আসন হইতে পারে যে হৃদয়, সেই **হৃদয়** না জানি আরও কত বড়!!! সামান্য, অমার্জ্জিতবুদ্ধি, সহজজ্ঞানবাদী ও ক্ষুদ্রচিত্ত আজ কালের আমরা কি অত উচ্চ আদর্শ ক্ষুদ্রহৃদয়ে ধারণাকরিতে পারি? * তুমি মুনিঋষির

---

* কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, পাশ্চাত্য লোকেরাও ত নিয়ম মত আহার বিহারাদি করেন; শরীর ও মন গঠনের জন্য নিয়মমত নানাপ্রকার ব্যায়াম ও অন্যান্য ক্রিয়াদি করিয়া থাকেন; তবে, তাঁহাদের শরীর ও মন রীতিমত গঠিত হইবার বাধা কি? আর, তাঁহারা যে মুনিঋষির মত যোগ অবলম্বন করিতে পারিবেন না, বা তাঁহাদের যে সেই শক্তি হইতে পারে না, তাহার কি কোন উপযুক্ত কারণ আছে? আমরা বলি যে, তাহা নাই। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ঋষিত্ব ব্যক্তিগত বা জাতিগত নহে। উহা গুণগত। যিনি যে পরিমাণে জ্ঞানী, তিনি সেই পরিমাণে ঋষি। তবে, আপ্তঋষি হইতে হইলে—তাঁহাদের মত নির্ম্মল ও ভ্রমপ্রমাদশূন্য জ্ঞান সঞ্চয় করিতে হইলে, কতকগুলি নিয়মের বাধ্য হইতে হয়। সেই নিয়মগুলি আবার, কোন কোন দেশের বা ধাতের পক্ষে অসহ্যও হইতে পারে। আর, হয়ত উপযুক্ত শরীরে ও উপযুক্ত স্থানে সর্ব্বাংশে ঐ নিয়মাদির অনুসরণ করিলেও দুই এক পুরুষে হয়ত কাহারও সে শক্তি নাও জন্মিতে পারে। ঋষিরা নিরামিষভোজী ছিলেন বলিয়া তাঁহাদের শরীরে যে বলের অভাব ছিল বা তাঁহাদের স্বাস্থ্য যে অক্ষুণ্ণ ছিলনা এমন নহে, অধিকন্তু, নিরামিষভোজনে তাঁহাদের মধ্যে সহজেই সত্ত্বগুণের বিকাশ হইত। পাশ্চাত্যগণ মাংসাশী। উক্ত খাদ্যও বলকারক বটে, কিন্তু উহা রজঃ ও তমোগুণ বর্দ্ধক। উহাতে চাঞ্চল্য ও রাগদ্বেষাদি নিকৃষ্টবৃত্তিগুলিই বেশী উত্তেজিত করে। হাতী ঘাস খায়, উহারা অত্যন্ত বলবান্ অথচ ধীর, স্থির ও গম্ভীর। ব্যাঘ্র মাংসাশী। উহারা

মত যোগ অবলম্বন (ধ্যানস্থ হইয়া কোন বিষয়ের চিন্তা) করিতে পার; কিন্তু তোমার মন ও শরীর রীতিমত গঠিত হয় নাই। কতক্ষণ তুমি একবিষয়ে মনঃসংযোগ করিয়া থাকিবে? যদি বেশীক্ষণ থাক, তবে হয়ত তোমার মাথা ঘুরিয়া যাইবে, না হয়ত তুমি পাগল হইবে।

হাতীর ন্যায় বলশালী নহে, অপিচ চঞ্চল, ক্রোধী ও খিট্‌খিটে প্রকৃতির। শরীরের ও মনের উচ্চতম উৎকর্ষ সাধন করিতে হইলে, আহার বিহারাদির ব্যবস্থাও সেইরূপ করিতে হইবে। নতুবা কি মনের, কি শরীরের আদর্শ উন্নতি হইতে পারে না। ইংরেজীতেও আছে—"A man reaches perfection when he gets both inward and outward reformation; but, be sure that outward reformation paves the path of inward excellence." আহারাদির পার্থক্যে শরীরের ও মনের যে অবস্থান্তরপ্রাপ্তি ঘটে, এই বিষয়ে ইংরেজীতে এইরূপ আছে,—

"—If you would improve your thought
You must be fed as well as taught
Observe the various operations
Of food and drink in several nations
Was ever Tartar fierce or cruel
Upon the strength of water gruel?
But, who shall stand his rage and force
If first he rides, then eats his horse?"

আমরা এই বিষয়টী আরও একটু পরিষ্কার করিয়া বুঝাইতেছি। কোনও বিষয়ের যথার্থ বিচার করিতে হইলে,—বস্তুর স্বরূপতত্ত্ব নির্ণয় করিতে হইলে--পরিমার্জ্জিত বুদ্ধির দরকার। অপরিমার্জ্জিত বুদ্ধিদ্বারা বিচার করিলে সেই বিচার ঠিক হয় না। কামলা রোগগ্রস্ত ব্যক্তি যেমন পৃথিবীস্থ যাবতীয় পদার্থই হল্‌দে রংএর দেখে, নির্ম্মলবুদ্ধিরহিত ব্যক্তিও তদ্রূপ অসারবস্তুকেও সারবস্তু বলিয়া বোধ করিয়া থাকে। বুদ্ধি নির্ম্মল করিতে হইলেও কতকগুলি নিয়মের বাধ্য হইতে হয়। যদৃচ্ছাক্রমে উহা সাধন করিবার উপায় নাই। রসায়ন ঔষধ সেবন করিতে হইলে, পূর্ব্বে বমন ও বিরেচনাদিদ্বারা শরীর শোধনকরা দরকার হয়। নতুবা মলিন বস্ত্রে রং মাখাইলে যেমন উহা খোলে

"আজ কাল যত কিছু বড় বড় সত্য আবিষ্কৃত হইতেছে বা হইয়াছে, সে সব একজনের একদিনের চিন্তার ফল নহে। এক ব্যক্তি কোন এক বিষয়ে, দীর্ঘকালব্যাপিনী চিন্তাদ্বারা কোন একটী সিদ্ধান্ত কিয়ৎপরিমাণে স্থির করেন। উক্তব্যক্তি যখন লোকান্তরিত হন, অন্য ব্যক্তি তাঁহার

না, অশোধিতদেহে রসায়ন ঔষধ সেবনেও কোন ফল হয় না। তদ্রূপ, যথাযথ আহার বিহারাদি কতকগুলি নিয়মের অধীন হইয়া কার্য্য না করিলে দেহ ও মনের শোধন হয় না। আর, দেহ ও মনের শোধন না হইলেও বুদ্ধির পরিমার্জ্জন হয় না। এই বুদ্ধির শুদ্ধি করিতে হইলে প্রথমতঃ অন্নময়কোশের শোধনকরা দরকার হয়। অন্নময়কোশের শোধন করিতে হইলে, কাজেই আহারাদির বিচারকরা আবশ্যক হয়। কোন্‌প্রকার দ্রব্য আহার করিলে সহজেই সত্ত্বগুণের বিকাশ হয়, তাহার নির্ণয় করিতে হয়। দেহসর্ব্বস্ববাদিদের মত দেহের পুষ্টি ও বৃদ্ধিতেই মানুষের শারীরিক ও মানসিক সার্ব্বাঙ্গীন উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারে না। সাত্ত্বিক আহারাদিদ্বারা ক্রমে আমাদের রস, রক্ত, মাংসাদি সপ্তধাতু ও শিরা, স্নায়ু প্রভৃতি দেহের সমস্ত অংশই সাত্ত্বিকভাবাপন্ন হয়। ইহাকেই অন্নময়কোশের শোধন বলে। ইহাদ্বারা দেহ প্রকৃতরূপে কার্য্য করিবার উপযুক্ত হয়।

অন্নময়কোশের শোধন হইলে, প্রাণময়কোশের শোধনের দরকার হয়। গুরুর উপদেশ ভিন্ন প্রাণময়কোশের শোধন শিক্ষাকরা যায় না। প্রানবায়ু আয়ত্ত হইলে যেমন শুভফল প্রদান করে, প্রাণের শুদ্ধি বা সংযমের সময় ভ্রমক্রমে যদি প্রাণবায়ু স্বাভাবিক পথে চালাইতে না পারা যায়, তবে বিষম অনর্থ উৎপন্ন হয়। অন্নময় ও প্রাণময়কোশের শুদ্ধির পর মনোময়কোশের শোধন করিতে হয়। এই তিনটী কোশেরই পরস্পর অতি নিকটসম্বন্ধ আছে। একের ইষ্টানিষ্টের উপর অপরের ইষ্টা-নিষ্ট নির্ভর করে। মনের শুদ্ধি করিতে হইলে নিষ্পাপ হইবার দরকার হয়। নিষ্পাপ হইবার জন্য তপস্যা করিতে হয়। যদি কঠোর তপস্যাদ্বারা কোন সৌভাগ্য-বান্ ব্যক্তি নিষ্পাপ হইতে পারেন, তবেই তাহার মনোময়কোশের শোধন সম্পূর্ণ হয় এবং তিনি বিচার করিবার প্রকৃত অধিকারী হইতে পারেন। অন্নময়, প্রাণময় ও মনোময়কোশ বিশুদ্ধ হইলে, তখন বিবেকবুদ্ধিও পরিমার্জ্জিত হয়। আর, বিবেক

সেই আংশিক স্থিরীকৃত বিষয়টী পুনরায় অনুশীলন করিতে থাকেন এবং তাহার উপরে আরও কিছু প্রকর্ষ লাভ করিতে যত্নবান্ হন এবং হয় ত সেই যত্নের ফলভাগীও হইয়া থাকেন। এইরূপে বহুসংখ্যক জীবনের চেষ্টা ও পরীক্ষার ফল দ্বারা মানুষ একটী চরম সিদ্ধান্তে পহুঁছিয়া থাকে। তবে, ইহাতে একটু অসুবিধা এই হয় যে, প্রত্যেক ছেদ বা ক্রমভঙ্গ সময়ে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন যাহা যাহা মনে করিয়াছিলেন, পরবর্ত্তী মনুষ্যও যে ঠিক সেই সেইটীই ধারণা করিতে পারিবেন, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। এরূপ স্থলে বুঝা যায় যে, উক্ত ৪।৫ জনের জীবন পরস্পর যোগ দিয়া যত দীর্ঘ হয়, প্রথম ব্যক্তিরই আয়ু যদি তত দীর্ঘকালব্যাপী হইত, তাহা হইলে সেই চরমসত্য আবিষ্কারের পন্থা কত নির্ব্বিঘ্ন, অপ্রতিহত ও সুগম হইত। কিন্তু একটী কথা—মানুষের ইন্দ্রিয়শক্তিরও একটা সীমা আছে। সেই সীমার বাহিরে নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকার। সেথায় চর্ম্মচক্ষুর আধিপত্য নাই, পার্থিব কলকৌশলের প্রসর নাই। সেইখানে কেবল অন্তর্দৃষ্টি বা ধ্যানশক্তি দ্বারা কার্য্য হয়। পূর্ব্বকালীন ঋষি-গণের আয়ু, সেইরূপ পরস্পরসংযুক্ত জীবনের মত সুদীর্ঘ ছিল। সেই ধ্যানশক্তি বা যোগবল তাঁহাদেরই ছিল।" তাই, তাঁহারা অতিদীর্ঘ জীবন ব্যাপিয়া ধ্যানশক্তিবলে, যে সকল তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, আমাদের সহজজ্ঞানের আয়ত্ত নয় বলিয়া কি তাহা ফুৎকারে উড়াইয়া দেওয়া উচিত? অবশ্য, যে বিজ্ঞানের উপদেশের

বুদ্ধি মার্জ্জিত হইলে, সেই পরিমার্জ্জিত, পরিশুদ্ধ ও স্বচ্ছ মানসমুকুরে বিষয়াদির স্বরূপ পরিষ্কাররূপে প্রতিফলিত হয়। তখন আর ভ্রম হইবার সম্ভাবনা থাকে না।

(এই মনোময়কোশাদির শোধনাদির বিষয়ে সবিস্তারে জানিতে হইলে ১৩১৬ সালের ১২ই আষাঢ়ের বঙ্গবাসী ও "গীতায় ঈশ্বরবাদ" দেখ।)

উপর লোকের জীবন মরণ নির্ভর করে, তাহার বিষয়ে গোঁড়ামী করিয়া কোন মত পোষণের জন্য কাহাকেও অনুরোধ করা যাইতে পারে না। তুমি যেমন বিজ্ঞানে, যুক্তির বিরোধী কোন মতই গ্রহণ করিতে পার না, সেইরূপ কোনও বিষয়ের পরীক্ষাকালে এবং সেই বিষয়ের নির্ভুল-সিদ্ধান্তে পহুঁছিবার পূর্ব্বে এক সংস্কারকে অন্য সংস্কার দ্বারা দূরীভূত করিতেও পার না " you may not believe, but you can not disbelieve ; you may not accept, but you can not refuse." "ইহা ঠিক কি না, সেই বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে" এরূপ অবশ্য তুমি বলিতে পার, কিন্তু "ইহা ঠিক নহে" পরীক্ষাকালে এইরূপ নিশ্চয়াত্মক বাক্য (Decided tone) প্রয়োগ করিবার তোমার কি কোন অধিকার আছে? * আজ বাঙ্গলা টিকা রহিত হইয়া ইংরেজী

* চরকের ইংরেজী অনুবাদ মাত্র পাঠ করিয়া (যাহাতে আদত বই'র সমস্ত ভাবগুলি রাখা অসম্ভব) ফিলাডেলফিয়ার প্রসিদ্ধ ডাক্তার জর্জ্জ এইচ্, ক্লার্ক, এম্, এ, এম্, ডি, মহোদয় বলেন,—

Philadelphia
America

"As I go over each fasciculus of Charaka I always arrive at one conclusion and that is this—

If the physicians of the present day, would drop off from the Pharmacopia, all the modern drugs and chemicals and *treat their patients according to the methods of " Charak " there would be less work for the undertakers and fewer chronic invalids in the world.*"

- অর্থাৎ চরকের প্রত্যেক খণ্ড পাঠ করিয়া আমি একই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হই। সেই সিদ্ধান্ত এই—

যদি বর্ত্তমান কালের চিকিৎসকেরা, তাঁহাদিগের ঔষধের তালিকা হইতে, আধুনিক যাবতীয় ঔষধ ও রসায়নিক পাক প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া, রোগীকে চরকের মতানুসারে

টিকাব প্রচলন হইয়াছে, কে জানে, ৫০ বৎসর পরে যখন দেখিবে যে, ইংরেজী টিকা দেওয়া না দেওয়া সমান, তখন আবার পূর্ব্বকালের মত বাঙ্গলা টিকার পুনঃ প্রচলন হইবে না? মুনি ঋষিদের মত, ব্রহ্মচর্য্যাদির দ্বারা শরীর ও মন গঠনের পর, কঠোর তপস্যাদ্বারা, ভাবী ক্ষীণজীবী

চিকিৎসা করেন, তাহা হইলে শববাহকের কার্য্য অনেক হ্রাস হইয়া আসিবে এবং পৃথিবীতে চিররোগীর সংখ্যা অনেক কম হইবে।" (চিকিৎসা সম্মিলনী দেখ)।

চরকের ইংরেজী অনুবাদ মাত্র পাঠ করিয়া আর একজন প্রসিদ্ধ এম্, ডি, ডাক্তার কি বলিতেছেন শুনুন,—

Institute of Ayurveda,
1422 Post Street.
San Francisco, Cal,
U. S. A.

" The sacred memory of the ancient sages of India.—Agnivesa, Charaka, Susruta and others,—lives in their works. While some of those works were translated, centuries ago, into Arabic and again into Latin and a knowledge of Ayurveda passed to the Greeks and Arabs, and thence to Europe and America, the light of those teachings has been practically lost to the Western World for centuries, * * *

The innovation need not, and will not, sink to a common commercialism ; on the contrary, it will have no other effect than that of raising Ayurveda to the dignity that belongs to it, in a manner that can be said of none of the theories of other schools of medicine,—recognition by the world of science as a regular and advanced Medical Science, based upon the unerring laws of nature, and therefore, observant of the rational law of

লোক অমার্জ্জিত, অপূর্ণ ও ভ্রমাত্মক জ্ঞান লইয়া, কার্য্যক্ষেত্রে নিজেদের হিতাহিত নিশ্চয় করিতে পারিবে না বলিয়াই শাস্ত্রকার বলিয়াছেন—

" পুরাণং মানবোধর্ম্ম সাঙ্গোবেদ শ্চিকিৎসিতম্।
আজ্ঞাসিদ্ধানি চত্বারি ন হন্তব্যানি হেতুভিঃ॥ "

Vis medicatrix naturae in contradistinction to *Contraria Contrariis*, and *similis similibus Curantur*; the Science of Life that aims to aid and assist nature to regulate and control the functions of the organism to a physiological effect, a distinction that will be justly accorded to Ayurveda, through the publication of the theory and practice of the Science. * * *

* * * * * *

Sincerely and fraternally yours
Geo. W. Carpenders, M. D,
Resident Consulting Physician
to the Institute of Ayurveda.

" অগ্নিবেশ, চরক, সুশ্রুত এবং অপরাপর ভারতবর্ষীয় ঋষিগণের পবিত্র স্মৃতি আজও তাঁহাদের স্বস্ব গ্রন্থ সকল জাগরূক রাখিয়াছে। যদিও বহুশতাব্দী পূর্ব্বে এই সকল গ্রন্থ, আরবী, ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষায় অনুবাদিত হইয়া, ইউরোপ ও আমেরিকায় প্রচারিত হইয়াছিল, তথাপি অনেক শত বৎসর গত হইল, এই সকল শাস্ত্রের আলোক এদেশে একবারে নির্ব্বাপিত। * * * *

* * * * * *

এ্যালোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক মতের মূলসূত্র, যাহা আমি এতকাল আলোচনা করিয়া আসিয়াছি, তদপেক্ষাও আপনাদের আয়ুর্ব্বেদীয় মত যে সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ, তাহা আমি বিলক্ষণ প্রতীতি করিতেছি—আয়ুর্ব্বেদই যথার্থ স্বভাব ও জ্ঞানসঙ্গত চিকিৎসার অনুসরণ করিয়াছেন।

* * * * *

অর্থাৎ পুরাণ, স্মৃতি, সাঙ্গবেদ ও চিকিৎসা শাস্ত্রে যেরূপ উপদেশ আছে, তদনুরূপ কার্য্য করিবে। বুঝিতে না পারিয়া, হেতুবাদের দ্বারা ইহাদিগকে বিনষ্ট করা কিছুতেই কর্ত্তব্য নহে। "সংস্কৃতশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত (মোক্ষমূলার Maxmuller.) বলেন—"A nation that has gurus like Manu, Kapila, Gautama, Patanjali, Kanada, Vedavyasa, Jaimini, Narada, Marichi, Vasistha and others, need not go to the foreign teachers for an *imprimatur* of Culture……whose soul-science is but skin-deep." অর্থাৎ মনু, কপিল, গৌতম, পতঞ্জলি, বেদব্যাস, জৈমিনী, নারদ, মরীচি, বশিষ্ঠ ও অন্যান্য ঋষিগণ যে জাতির গুরু, সে জাতি জ্ঞানোন্নতির জন্য, বিদেশীয় শিক্ষকের নিকট কেন যাইবে? যেহেতু সেই শিক্ষকদের তত্ত্বশাস্ত্র, কেবল আচর্ম্মগভীর অর্থাৎ প্রণিধেয় তত্ত্বের অন্তস্তল পর্য্যন্ত প্রবেশ করিবার শক্তিহীন।"

মন্তব্য—মোক্ষমূলার নামক উক্ত পাশ্চাত্য পণ্ডিতমহাশয় ঋষিদিগের সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন অথবা ফিলাডেলফিয়ার এম্, এ, এম্, ডি ডাক্তার ক্লার্কসাহেব বা স্যানফ্রানসিস্কোর

আমি কি প্রকারে এই চিকিৎসার এতদূর পক্ষপাতী হইয়াছি এবং এই আমেরিকার ন্যায় দূরতর প্রদেশে কি প্রকারে আয়ুর্ব্বেদীয় বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহার ইতিবৃত্ত লিখিতেছি—শুনিলে অবাক্ হইবেন। বিবরণটী এই—এদেশের অনেক ডাক্তারমণ্ডলীর সমবেত চেষ্টায় এই আয়ুর্ব্বেদ ইনষ্টিটিউট্‌টী সংস্থাপিত হইয়াছে। আমি ইহার প্রেসিডেণ্ট।" * * *

* * * *

(কবিরাজ ৺ অবিনাশচন্দ্র কবিরত্নের ঔষধালয়ের, ঔষধের মূল্যনিরূপণ পত্রিকা দেখ।)

এম্, ডি, ডাক্তার কার্পেণ্টারস্ সাহেব 'চরক' সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন—উঁহাদের ন্যায় ইউরোপ এবং আমেরিকার অনেকানেক পণ্ডিতই আমাদের শাস্ত্রাদির সম্বন্ধে এইরূপ উচ্চ অভিমত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। বাহুল্যভয়ে সে সকল মতামত এখানে উদ্ধৃত হইল না। আর, উক্ত এম্, ডি, ডাক্তার মহোদয়দ্বয় বা উক্ত পণ্ডিতমহাশয় অথবা ইউরোপের অন্যান্য পণ্ডিতমণ্ডলী, আমাদিগের শাস্ত্রাদি বা মুনি ঋষির সম্বন্ধে ঐরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়াই কি, মুনি ঋষিরা যোগবলাদি অমানুষিক জ্ঞানে জ্ঞানী ছিলেন বলিয়া তোমাকে বিশ্বাস করিতে বলিতেছি? তাহা নহে। জ্যোতিষ শাস্ত্র বা সাংখ্যপাতঞ্জলাদি দর্শনশাস্ত্রের কথা ছাড়িয়া দেও, শুধু এক আয়ুর্ব্বেদের ভিতরই ভাল করিয়া খুঁজিয়া দেখ; উহার মধ্যে এত অসংখ্য অসংখ্য চিরদীপ্তিময় অমূল্যরত্ন পাইবে যে, তোমাকে তাহা দেখিয়া চমৎকৃত, বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইতে হইবে। তবে, বহুকালের অসংস্কাররূপ আবর্জ্জনাদিপরিপূর্ণ ও ইতস্ততঃ এলোমেলোভাবেবিক্ষিপ্ত রত্নাদির অপূর্ব্ব আলোক দেখিতে হইলে বা উহাদের মূল্য নিরূপণ করিতে হইলে, কোন ভাল জহুরীর সাহায্য গ্রহণ করার দরকার বটে। দুঃখের বিষয় এই যে, আজ কাল পাশ্চাত্যপ্রতিভামুগ্ধ ভারতবাসীর অনেকেই আয়ুর্ব্বেদনিহিত রত্নাদির সেই অপূর্ব্ব আলোক দেখিবার জন্য উৎসুক নহেন * এবং রত্ন চিনাইয়া দেয়

* "ভারতবাসীর অভিশাপ আছে যে, বিদেশী মনীষিগণ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ না করিলে, ভারতের শ্রেষ্ঠ সামগ্রীর প্রতি আমরা উদাসীন থাকি।" ইউরোপ ও আমেরিকার পণ্ডিতগণ চরক সুশ্রুতাদি গ্রন্থের গুণগান করিতেছেন অথচ ভারতের অধিকাংশ লোকে সেই চরকাদির সম্বন্ধে বিশেষ কোন খবরই রাখেন না জানিয়া "হোপ্" সম্পাদক মিঃ অমৃতলাল রায়, বড় দুঃখেই বলিয়াছেন যে, "It is curious that the treasures of ancient Hindu literature are generally appreciated in Europe far better and soon than by those who are their inheritors

সেরূপ জহুরীরও অভাব হইয়াছে অথবা যাঁহারা আছেন, তাঁহারাও উপযুক্ত উৎসাহ না পাইয়া নিশ্চেষ্টভাবে জীবন যাপন করিতেছেন বা বিফলপরিশ্রমে ক্লান্ত ও ভগ্নোদ্যম হইয়া বিরামদায়িনী নিদ্রার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। আর, হতাশ ব্যক্তির পক্ষে কর্ম্মবিবর্জ্জিত হইয়া নিদ্রাদেবীর ক্রোড়ে শায়িত থাকা স্বাভাবিকও বটে। "প্রকৃতি-নন্দন কবি শত দুঃখে পড়িয়া যখন কোথাও মনের মত সহানুভূতি না পান, তখন স্নেহময়ী মাতাকে স্মরণ করিয়া বলিতে থাকেন":—

"আয় মা, মরম ব্যথা আজি বলি তোরে।
ঘুম পাড়াও, জননি গো, ঘুম পাড়াও মোরে॥"

কাজেই, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র পূর্ণবিজ্ঞানময় হইয়াও অন্য জাতির নিকট অবৈজ্ঞানিক, হেয় ও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে। রাজা অথবা তৎসদৃশ ব্যক্তির সাহায্য ব্যতীত কোন বিষয়েরই প্রকৃত উন্নতি সাধিত হইতে পারে না। রাজা এদিকে দৃষ্টি করিলেত কথাই নাই, নতুবা রাজসাহায্য ব্যতিরেকেও লালিত, পালিত ও নিয়তবর্দ্ধিত হোমিওপ্যাথীর পৃষ্ঠপোষকদের মত, এদেশীয়েরাও যদি আয়ুর্ব্বেদের প্রতি সসম্ভ্রম ও সস্নেহ দৃষ্টিপাত করেন এবং আন্তরিক অনুরাগ সহকারে যত্নপূর্ব্বক মৃতপ্রায় আয়ুর্ব্বেদের উপযুক্ত ঔষধ ও পথ্যাদির ব্যবস্থা করেন, তবে অগৌণে দেখা যাইবে যে, অধুনা যে আয়ুর্ব্বেদের হৃদয়ের স্পন্দনমাত্র অনুভূত হইতেছে অথচ চৈতন্য নাই, অন্তর্লীন শক্তি অনুভূত হইতেছে অথচ তাদৃশী ক্রিয়া নাই, অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও যাহার স্ফূর্ত্তি নাই, সেই চৈতন্যহীন, ক্রিয়াহীন এবং জীবনহীনের ন্যায় প্রতীয়মান মূর্চ্ছাদশাপন্ন আয়ুর্ব্বেদই, আবার সচেতন

---

by birth right. They call him an unnatural son who does not know his own father."

ক্রিয়াশীল ও সজীব হইয়া লোকের ধর্ম্মার্থকামমোক্ষের একমাত্র মঙ্গলময় বিধাতা হইয়া দাঁড়াইবে। এখনও আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের মর্ম্মজ্ঞ অনেক কবিরাজ বর্ত্তমান আছেন, অধুনা পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞানে বিশেষরূপে ব্যুৎপন্ন অনেক ডাক্তার, এদেশীয়দের ধাতের পক্ষে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার উপকারিতা ও বিদেশীয় চিকিৎসার অনুপকারিতা বা অনুপযোগিতা উপলব্ধি করিয়া, তৃষিত ব্যক্তির জলপানের জন্য জাহ্নবীতীরে কূপখনন করা অনাবশ্যক বোধে, অথবা মলয়মারুতপ্রবাহিত দেশে তালবৃন্তের বিশেষ আবশ্যকতা নাই বুঝিয়া, ডাক্তারী ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া কবিরাজী ব্যবসায় অবলম্বন করিতেছেন, অধুনা দুর্ভিক্ষের চিরনিবাসস্থান বলিয়া বিখ্যাত ভারতভূমিতে এখনও কুবেরের বংশাবলীর সম্পূর্ণ লোপ হয় নাই। যদি ঐ সমস্ত ধনকুবেরগণ আন্তরিকতার সহিত, আয়ুর্ব্বেদের উদ্ধারসাধনে ব্রতী হন ও রীতিমত সাহায্যাদি করিয়া ধনের সদ্ব্যবহার করেন এবং শিক্ষিত কবিরাজবৃন্দও যদি কর্ত্তব্যবোধে এবং নিরলস হইয়া, অর্থগৃধ্নুতা পরিহারপূর্ব্বক আয়ুর্ব্বেদের উন্নতির জন্য বদ্ধপরিকর হন, তবে অচিরেই দেখিতে পাইবে যে, এই মহাত্মাগণের সমবেত চেষ্টার ফলে, অস্তমিতপ্রায় আয়ুর্ব্বেদসূর্য্য পুনরায় ভারত-গগনে উদিত হইয়া রোগক্লিষ্ট পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে স্বকীয় অমৃতময় রশ্মিজাল বিস্তার করিবেন; আর, সেই পীযূষগর্ভকিরণমালার সঞ্জীবনীশক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়া, উষ্মবিহীন ও মৃতপ্রায় রোগিগণ পুনর্জ্জীবিত হইয়া উঠিবে, আবার আয়ুর্ব্বেদের বিজয়দুন্দুভিনিনাদে বসুন্ধরা পরিপূর্ণ হইবে এবং আবার এই অধঃপতিত, হেয় ও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতিভাত আয়ুর্ব্বেদই চিকিৎসাজগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিবে। সুযোগ সকল সময়ে উপস্থিত হয় না। আর, উপস্থিত সুযোগ পরিত্যাগ করিলে পুনরায় উহা ফিরিয়া না আসিতেও পারে। যে কোন কারণেই হউক, আয়ুর্ব্বেদের প্রতি কি দেশী, কি

বিদেশী, সকলেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। এই সময়ে যদি কবিরাজমণ্ডলী আয়ুর্ব্বেদের উদ্ধার সাধনে চেষ্টিত না হয়েন, আর দেশীয় ধনকুবের-গণও যদি কবিরাজমণ্ডলীর উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ, যথোচিত সাহায্যাদি প্রদান করিতে উপেক্ষা প্রদর্শন করেন, তবে অভাবে স্বভাব নষ্ট হওয়া বশতঃ কবিরাজগণেরও পূর্ব্বদশাপ্রাপ্তি হইবে এবং আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাও আবার "যে তিমিরে সে তিমিরে" প্রবেশ করিবে। বিদ্যার জন্য যে বিদ্যার অনুশীলন করা কর্ত্তব্য—সে ভাব আর বর্ত্তমান ভারতে নাই। তবে, পুরস্কার ও তিরস্কার দ্বারা আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি হইবার সম্ভাবনা আছে। "কিমপৈতি রজোভিরৌর্ব্বরৈরবকীর্ণস্য মণে-র্মহার্ঘতা ?" ধূলি বালি দ্বারা পরিবেষ্টিত হইলেও মণি মুক্তাদির মূল্য কি কখনও লোপ পায় ? আয়ুর্ব্বেদনিহিত রত্নাদির লোপ হয় নাই। তবে, উহারা ধূলিরাশিদ্বারা আচ্ছাদিত হওয়ায় পরিষ্কাররূপে দর্শকের দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। যদি কোন মহাত্মা, ধূলিবালি বিদূরিত করিবার জন্য মুক্তহস্ত হয়েন অথবা সম্মার্জ্জনীর সাহায্যে উক্ত ধূলিবালির অপসারণ করেন, তবেই আবার সেই মণিমুক্তাদির শুভ্র ও বিমল-জ্যোতিঃ দর্শকের আনন্দ উৎপাদন করিতে সক্ষম হইবে। বীণা যন্ত্রের সুমধুর তানে, সুবোধই হউক আর অবোধই হউক—সকলকেই মুগ্ধ হইতে হয়। বাদ্যবোধনিপুণ ব্যক্তির হৃদয়তন্ত্রী যেমন বীণাযন্ত্রের সুমধুর তানে প্রকম্পিত (vibrated) হইলে, সে ব্যক্তি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই প্রতিলয়ে তাল দিতে থাকে, "সুমিষ্টস্বরমুগ্ধ অবোধ শিশুও তদ্রূপ স্বভাবের আকর্ষণেই, শিরঃকম্পন, অঙ্গুলিচালন, করতালি, নৃত্যাদি দ্বারা, প্রতি লয়ে সেইরূপ তাল দিতে বাধ্য হয়।" স্বদেশহিতৈষী ধন-কুবেরগণের সাহায্যে প্রোৎসাহিত হইয়া কবিরাজমণ্ডলী তন্ত্রসূত্রাদি-নির্ম্মিত আয়ুর্ব্বেদযন্ত্রের যে হৃদয়োন্মাদক বীণাঝঙ্কার উত্থাপিত করিবেন, তাহার বৈদ্যুতিক প্রবাহ, কি সুবোধ কি অবোধ—পৃথিবীস্থ

যাবতীয় লোকেরই কর্ণের ভিতর দিয়া প্রবেশ করিয়া মর্ম্মস্থল স্পর্শ করিবে এবং আয়ুর্ব্বেদযন্ত্রের সেই সুমধুর তানে মুগ্ধ ও আকুলিতপ্রাণ হইয়া তাহারা সকলেই প্রতিলয়ে তাল দিয়া নাচিয়া বেড়াইবে। এই ক্ষুদ্র পুস্তকে এই সকল বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা অসম্ভব। যাহাহউক, আমরা "ঋষি" নামক পত্রিকাতে, দ্রব্যগুণ সম্বন্ধে ঋষি-দিগের ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের, জ্ঞানের যে বিভিন্নতা প্রদর্শিত হই-য়াছে, সর্ব্বসাধারণের অবগতির জন্য এখানে তাহা উদ্ধৃত করিলাম।

"ধূলি-বালুকা-কাষ্ঠ-প্রস্তর-লতা-পত্র-ভূচর-খেচর প্রভৃতি যাহা যাহা ঋষিদিগের দৃষ্টিগোচরে আসিয়াছিল, ঋষিগণ তাহার একটীও পরিত্যাগ করেন নাই—প্রত্যেকেরই গুণ নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন। ঋষিকৃত দ্রব্যগুণবিচার এক অপূর্ব্বব্যাপার। পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্রে যে ভাবে দ্রব্যের শক্তি নির্ণীত হইয়াছে, ঋষিগণের তদ্বিষয়িণী গবেষণা তাহা অপেক্ষাও গভীরতর ও সূক্ষ্মতর।

পাশ্চাত্যবিজ্ঞান বলেন—কুইনাইন কর্ত্তৃক জ্বর বিনষ্ট হয়, যেহেতু উহাতে জ্বরঘ্নশক্তি নিহিত আছে। ব্রোমাইড্ পটাস নামক লবণে বায়ু দমন হয় (Pacifies the exaggeration of Nervous Functions), যেহেতু উহা কুপিত (উত্তেজিত) বায়ুর অবসাদজনক (Sedative) * এবং বোরাসিক লোসনে (অর্থাৎ সোহাগা-দ্রবে) 'ঘা' আরোগ্য হয়, কেননা উহা ক্ষতসংশোধক। ঋষিগণ ওরূপ স্থূলনির্ণয়ে

* কুপিত বায়ুর অর্থ বৃদ্ধি বা হ্রাস প্রাপ্ত বায়ু। আমরা বায়ু শব্দে যাহা বুঝি, ডাক্তারগণ Nervous System শব্দে তাহাই লক্ষ্য করেন। বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বায়ু (Exaggeration of Nervous Function) এবং হ্রাসপ্রাপ্ত বায়ু (Suspension or Abolition of Nervous Functions). কিন্তু বায়ু, পিত্ত ও কফ এরূপ ব্যাখ্যায় ভাল বুঝা যায় না। বায়ু, পিত্ত ও কফের বিস্তৃত বিবরণ আমাদের অন্য বইতে লেখা হইতেছে।

তৃপ্ত নহেন —তাঁহারা দেখাইয়াছেন প্রত্যেক বস্তুর নিজ নিজ শক্তি সেই বস্তুগত কোন্ অংশ হইতে নিঃসৃত হইতেছে; তাই আর্য্যচিকিৎসা শাস্ত্রের প্রধান ভিত্তি স্বরূপ এই সূত্রটী গাঁথিয়া গিয়াছেন—

"স্বাদ্বম্ললবণা বায়ুং কষায়স্বাদুতিক্তকাঃ।
জয়ন্তি পিত্তং, শ্লেষ্মাণং কষায়কটুতিক্তকাঃ॥"

অর্থাৎ মিষ্ট, অম্ল ও লবণরস বায়ুকে, কষায়, মিষ্ট ও তিক্তরস পিত্তকে এবং কষায়, কটু ও তিক্তরস শ্লেষ্মাকে দমন করে। (কষায়, কটু ও তিক্তরস বায়ুবর্দ্ধক; অম্ল, লবণ ও কটুরস পিত্তবর্দ্ধক এবং মধুর, অম্ল ও লবণরস শ্লেষ্মাবর্দ্ধক)।

এক্ষণে ঋষি-সূত্রদ্বারা বুঝা যায় যে, কুইনাইনের শক্তি প্রধানতঃ তাহার তিক্তত্বে, ব্রোমাইড পটাসের শক্তি তাহার লবণত্বে এবং বোরাসিক লোসনের শক্তি, তাহার কষায়ত্বে নির্ভর করিতেছে। আজকাল পাশ্চাত্য চিকিৎসকেরা জানিতে পারিয়া বড়ই আনন্দিত হইয়াছেন যে, কুইনাই-নের বাহ্যপ্রয়োগে ক্ষত আরোগ্য হয়। ঋষি-সূত্রদ্বারা বুঝিলে এই আবিষ্কার নূতন বা বিস্ময়কর বলিয়া বোধ হয় না। ঋষি বলিতেছেন, "ন পাকঃ পিত্তং বিনা"—পিত্ত ব্যতীত পাক (রক্তিমা বা উত্তাপযুক্ত স্ফীতি অর্থাৎ ইন্‌ফ্লেমেশন Inflammation) হয় না। ক্ষত বা ব্রণাদি মাত্রই পাকমূলক। তিক্তবস্তু পিত্তের প্রতিকূল, সুতরাং কুইনাইনই হউক, বা নিমপাতাই হউক, অথবা কুড়্‌চিসিদ্ধ জলই হউক, তাহারত ক্ষত-নাশক শক্তি থাকিবেই। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক বিশৃঙ্খলভাবে দ্রব্যের নিত্য নূতন শক্তি বুঝিতে পারিয়া নৃত্য করিতে পারেন, কিন্তু ঋষিসূত্রের বিচারাধীনে অধিকাংশ স্থলেই তাহা অচিন্তিত-পূর্ব্ব বা নূতন বলিয়া বোধ হইবে না। (দ্রব্য-শক্তি, দ্রব্যের 'রস', 'বিপাক', 'বীর্য্য' ও 'প্রভাবের' উপর নির্ভর করে। এ পর্য্যন্ত দ্রব্যের রসেরই কথা বলা হইল।)

রস ব্যতীত দ্রব্যশক্তি, দ্রব্যের বিপাক, বীর্য্য ও প্রভাবের উপরে নির্ভর করে। (দ্রব্যের রস ছয় প্রকার, যথা—মিষ্ট, অম্ল, লবণ, কষায়, কটু (ঝাল) ও তিক্ত)। পৃথিবীতে খাদ্য অখাদ্য যতবস্তু আছে, তাহাদের অভ্যন্তরে মিষ্ট, অম্ল, লবণ, কষায়, কটু (ঝাল) ও তিক্ত এই ছয়টী রস, এক একটী, দুটী দুটী, তিন চারিটী বা ততোঽধিক ভাবে সংমিশ্রিত হইয়া রহিয়াছে। ভোজনকালে যতক্ষণ পর্য্যন্ত খাদ্যবস্তুটী মুখমধ্যে বর্ত্তমান থাকে, ততক্ষণই মধুরাদি স্বাদ বুঝাযায়, তৎপরে পাকস্থলীতে গিয়া পরিপাকান্তে যখন উহা একটা পাতলা সাদা তরল বস্তুতে (কাইলে Chyle এ) পরিণত হয়, তখন সেই তরল বস্তুর কি আস্বাদ তাহা কে জানিয়াছে ?—কে দেখিয়াছে ? কিন্তু যোগবলে বলীয়ান্ সর্ব্বান্তর্দ্দর্শী ঋষি বলিতেছেন—

" কষায়কটুতিক্তানাং বিপাকঃ প্রায়শঃ কটুঃ।
অম্লোঽম্লং পচ্যতে, স্বাদু মধুরং লবণং তথা ॥ "

অর্থাৎ কষায়, কটু ও তিক্তরসের বিপাক অর্থাৎ পাচকাগ্নিযোগে পরিপাক পাইয়া পরিণামে যে রসে পরিবর্ত্তিত হয়, তাহা প্রায়শঃ কটু। অম্লরসের বিপাক বা সেই পরিণামজ-রস অম্ল এবং মধুর ও লবণরস, এই দুয়েরই বিপাক মধুর। বিপাকানুযায়ী দ্রব্যের শক্তি যথা—শুণ্ঠী (শুঁঠ) কটুরস (অর্থাৎ উহার আস্বাদ ঝাল) সুতরাং উহা পিত্তবর্দ্ধক হওয়াই সম্ভব বলিয়া মনে হয়, কিন্তু শুণ্ঠীর বিপাক মধুর অর্থাৎ পেটে গিয়া নিজ কটুত্ব হারাইয়া চরমে মিষ্ট হইয়া পড়ে, সুতরাং ইহা তৎকালীন মিষ্টত্বহেতু আর পিত্তবর্দ্ধক হইতে পারে না।

বীর্য্য—দ্রব্যের বীর্য্য দুই প্রকার—শীতবীর্য্য ও উষ্ণবীর্য। এইটীই দ্রব্যসমুদায়ের গুণগত সংক্ষিপ্ত বিভাগ; যেহেতু নিখিল জাগতিক পদার্থ হয় আগ্নেয়, না হয় সোমগুণাত্মক। শীতোষ্ণ ব্যতীত শাস্ত্রে আরও কটী বীর্য্য গণিত হইয়াছে। যথা,—পিচ্ছিল, গুরু, লঘু, স্নিগ্ধ, রুক্ষ

ও তীক্ষ্ণ। (ফলতঃ এগুলি পূর্ব্বোক্ত দুইটীরই অন্তর্ভূত।) ইহাদের বিস্তৃত বিবরণ এখানে দেওয়া অনাবশ্যক।

প্রভাব—প্রভাব, বস্তুনিহিত অহেতুকী শক্তি বিশেষ। আমরা কোনও বস্তুর রস, বিপাক বা বীর্য্য আলোচনা করিয়া ঐ বস্তুর যেরূপ শক্তি অনুমান করিতে পারি, তাহার পরিবর্ত্তে যদি উহার এক সম্পূর্ণ বিভিন্ন গুণ দেখিতে পাই, তবে সেই গুণটি ঐ বস্তুর প্রভাবজন্য বলিতে হইবে। যেমন, কষায়রস সংকোচক বা মলমূত্ররোধক হইয়া থাকে, যথা—জামবীজের গুড়া, আমের আঁঠীর রস, মাজুফল, ফিট্‌কারী প্রভৃতি। ইহাদের ন্যায় হরিতকীও কষায়রসযুক্ত ; কিন্তু পূর্ব্বোক্ত বস্তুগুলি সংকোচক, অথচ হরিতকীর কষায়ত্ব থাকাসত্ত্বেও উহা মলরেচক। হরিতকীর এই রেচক শক্তিই তাহার প্রভাব। এইরূপ কটুকীর (কট্‌কীর) মত ইন্দ্রযবও তিক্ত, কিন্তু কট্‌কীর ন্যায় মলভেদক নয়। দন্তীমূল কটুরস, চিতামূলও কটুরস। কিন্তু প্রথমটী রেচক (ভেদক) এবং দ্বিতীয়টী ধারক। তাই, চরক লিখিয়াছেন—"রসং বিপাকস্তৌ বীর্য্যং প্রভাবস্তান্ অপোহতি।" অর্থাৎ বিপাক রসকে বীর্য্য, রস ও বিপাককে এবং প্রভাব উক্ত তিনটীকেই উল্টাইয়া দিয়া নিজ শক্তি প্রকাশ করে। * * * * *

* * * * *

প্রসিদ্ধ বস্তুগুলির প্রভাব জানা থাকিলে, সাধারণ চিকিৎসাকালে রসতত্ত্বই প্রায়শঃ যথেষ্ট হয়। বস্তু সমুদায়ের আনুমানিক দশ আনা অংশ রসানুযায়ী, তিন আনা অংশ বিপাকানুযায়ী, দুই আনা অংশ বীর্য্যানুযায়ী এবং এক আনা অংশ প্রভাবানুযায়ী ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে। (বোধ হয় এই সর্ব্বনিম্ন এবং সর্ব্বপশ্চাদ্‌গণ্য প্রভাবই কিয়ৎ পরিমাণে পাশ্চাত্য চিকিৎসার ভিত্তি-স্বরূপ।

আর্য্যশাস্ত্র সমূহের মধ্যে কি ন্যায়, কি দর্শন, কি জ্যোতিষ, কি বৈদ্যক

এতৎ সমস্তেরই উপদেশ সূত্রে নিবদ্ধ। সূত্রগুলি অতি অল্প কথায় গ্রথিত; কিন্তু সূত্র ভাঙ্গিয়া বুঝিতে গেলে নিগূঢ়ভাবগর্ভ অনন্ত অর্থের ফোয়ারা খুলিয়া যায়। এক একটী সূত্রে যেন এক একখানি প্রকাণ্ড গ্রন্থ লূক্কায়িত আছে। তাই,কোন খ্যাতনামা পাশ্চাত্য পণ্ডিত আমাদিগের শাস্ত্রীয় সূত্রপাঠে বিমুগ্ধ হইয়া বলিয়াছেন—“Each sloka is a Museum of thaughts.”—“এক একটী শ্লোক যেন চিন্তার হাট।”

দ্রব্যগুণ নির্ণয়ের ন্যায় বস্তুর অন্যান্য তত্ত্ব-নির্ণয়বিষয়িণী গবেষণা সম্বন্ধেও ঋষিদের উত্থাপিত যুক্তি ও আজ কালের পণ্ডিতগণের যুক্তির অনেক পার্থক্য দেখা যায়। নব্য পণ্ডিতগণ বলেন যে, বৃক্ষের বীজ প্রথমে ঈশ্বর কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছিল। এই আদিম বীজ হইতেই বৃক্ষের সৃষ্টি; আবার, বৃক্ষ হইতে বীজের সৃষ্টি, ইত্যাদি রূপ অনন্ত সৃষ্টিপ্রবাহ চলিয়া আসিতেছে। তাঁহাদের মতে বীজের সহিত সংযোগ ব্যতীত মৃত্তিকা হইতে বৃক্ষের জন্ম হইতে পারে না। তবে, কোন জলাশয় শুষ্ক হইয়া গেলে, তন্মধ্যে যে আমরা ঘাসাদি জন্মিতে দেখি উহার কারণ এই যে, ঘাসাদির অসংখ্য সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বীজ বায়ুদ্বারা চালিত হইয়া তথায় নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল বলিয়াই ঘাসাদির জন্ম হইয়াছে, কিন্তু ঘাসাদি আপনাআপনি জন্মগ্রহণ করে নাই। পত্রাদির সূক্ষ্মতম অংশ, বল্কলাদির পরমাণু এবং ফলাদির মধ্যগত অণুও যখন বীজ মধ্যে গণ্য, তখন ঐরূপ হওয়ার বিষয়ে আশ্চর্য্য কিছুই নাই। চর্ম্মচক্ষুদ্বারা ঐ সকল বীজাণু দেখিতে পাই না বলিয়াই আমরা নির্ব্বীজ সৃষ্টির কল্পনা করি। মাইক্রস্‌কোপ্ (অণুবীক্ষণ) নামক যন্ত্রদ্বারা ঐ সকল সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বীজাণুও দেখিতে পাওয়া যায়। এইত গেল আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মত।

পূর্ব্ব কালের ঋষিরা বলেন যে, নির্ব্বীজসৃষ্টিও হয় অর্থাৎ বীজ ভিন্নও উদ্ভিজ্জাদির সৃষ্টি হইয়া থাকে। বৃক্ষাদির সৃষ্টি বীজ ভিন্ন প্রায়ই হয় না সত্য বটে, কিন্তু অগ্নি, বায়ু ও জলাদির সম্পর্কে ভূমির বিকার-সংঘটিত

হইলে, বীজের সাহায্য ভিন্নও উদ্ভিজ্জাদির নূতন উদ্ভব হইতে পারে। যথা,—

" তত্র সিক্তা জলৈর্ভূমি রন্তরুষ্ম বিপাচিতা।
বায়ুনা ব্যূহ্যমানাতু বীজত্বং প্রতিপদ্যতে॥
তথা ব্যক্তানি বীজানি সংসিক্তান্যম্ভসা পুনঃ।
উচ্ছূনত্বং মৃদুত্বঞ্চ মৃদুভাবং প্রয়াতিচ॥
তন্মূলাদঙ্কুরোৎপত্তিরঙ্কুরাৎ পর্ণসম্ভবঃ।
পর্ণাত্মকং ততঃ কাণ্ডং কাণ্ডাচ্চ প্রসবং পুনঃ॥"

রাঘবভট্ট।

অর্থাৎ জলসিক্ত ভূমি স্বীয় আভ্যন্তরীণ উষ্মাদ্বারা বিপাচিত (বিপাক প্রাপ্ত) হইলে ভূমির যে বিকার হয়, সেই বিকারবিশেষ বায়ুদ্বারা ব্যূহ্যমান অর্থাৎ সংঘাত (জমাট) ভাব প্রাপ্ত হইলেই উদ্ভিদাদির জন্মের বীজ বা উপাদান হইয়া দাঁড়ায়। এই অব্যক্ত বীজ হইতে যে প্ররোহ বা অঙ্কুরের উৎপত্তি হয়, সেই অঙ্কুর হইতেই ব্যক্তবীজের জন্ম হইয়া থাকে। এই ব্যক্তবীজ জলসংযোগে ক্লিন্ন হইলে প্রথমতঃ উচ্ছূন হয় (ফুলিয়া উঠে), কোমলত্ব প্রাপ্ত হয় এবং ক্রমে ভাবী অঙ্কুরের মূলরূপে পরিণত হয়। এই মূল হইতে অঙ্কুর জন্মে ; অঙ্কুর হইতে পত্রাবয়ব, তাহা হইতে কাণ্ড (শাখা) এবং শাখা হইতে প্রসব (পুষ্প ফলাদি) জন্মে।

নির্ব্বীজসৃষ্টি হয় না বলিয়া যে আধুনিক পণ্ডিতগণ বলেন তদুত্তরে আরও অনেক দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা যাইতে পারে যথা—(১) হংস হইতে বীজ গ্রহণ না করিয়াও হংসী ' বাওয়া ডিম ' পাড়ে। (২) আমাদের দেশে স্বর্ণবর্ণের এক প্রকার লতা আছে, তাহাদিগকে আলোকলতা বলে। উহারা অন্য বৃক্ষের উপর সম্পূর্ণ আলগা ভাবে জন্মিয়া থাকে। উহারা যে কি ভাবে উৎপন্ন হয় তাহা বুঝা যায় না। (৩) বায়ু জলাদিযোগে যখন গোবর পচিয়া থাকে, তখন তাহা হইতে অসংখ্য

বিছার উৎপত্তি হয়, ইহা বোধ হয সকলেই জানেন। বায়ু যে পচা গোবরের উপর বিছার বীজ ছড়াইয়া দেয় এরূপ অনুমান করা বাতুলতা মাত্র। পচা গোবর হইতে যদি বিছা জন্মিতে পারে, তবে মাটীর বিকার হইতেও যে ঘাসাদির জন্ম হইতে পারে তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই।

আমাদের সর্ব্বশেষ মন্তব্য।

ডাক্তার মহাশয়দিগের ধারণা এই যে সংক্রামক বিষই বসন্ত রোগের উৎপত্তির একমাত্র কারণ। আমরা বসন্তরোগের উৎপত্তির কারণ, আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রানুযায়ী, এই পুস্তকের নিদান স্থানে সবিস্তারে উল্লেখ করিয়াছি। বসন্ত যদি কেবল আগন্তু কারণে অর্থাৎ সংক্রামক বিষাদির দরুণেই উৎপন্ন হইত, তবে টিকা দিয়াই ইহাকে সম্পূর্ণ দূর করা যাইত। উহার নিদান অর্থাৎ কারণের প্রতি দৃষ্টি করিয়া দেখ, উহা বহুবিধ কারণে উৎপন্ন হইতে পারে। কতকগুলি কারণ মানুষ চেষ্টা করিলেই নিবারণ করিতে পারে, কিন্তু ঋতুবৈষম্য, গ্রহাদির দৃষ্টি প্রভৃতি কারণ নিবারণ করা মানুষের চেষ্টার অতীত। হেতুসহযোগে শরীরের ভারান্তর উপস্থিত হইলে সকল শরীরই বসন্তরোগ-প্রবণ হইতে পারে। তবে, যেমন সূচিকাভরণাদি বিষাক্ত ঔষধ সেবনের পর রোগী যদি বাঁচিয়া উঠে, তবে কোন কোন স্থলে রোগীর পিত্ত বৃদ্ধি হইয়া ধাত এত পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় যে, রোগীকে আজীবন ডাবের জল, মিছরির সরবতাদি পান করিয়া শরীর ঠাণ্ডা রাখিতে হয়, সেইরূপ আদত বসন্ত একবার হইলে বা বাঙ্গলাটিকাদ্বারা কৃত্রিম বসন্ত উৎপাদন করিলে, রোগীর ধাত এত বদলাইয়া যায় যে, সহজে তাহার দেহ বসন্তরোগ-প্রবণ হয় না। ঋতুবৈষম্যাদি যদি প্রবলভাবে শরীরকে উত্তেজিত করে, তবে বাঙ্গলাটিকা গ্রহীতার বা পূর্ব্বে আদত বসন্ত হইতে নির্ম্মুক্ত ব্যক্তিরও যে বসন্ত হইবে, তাহাতে

আর আশ্চর্য্য কি? কবিরাজ, আচার্য্য, ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি বসন্ত-চিকিৎসকগণ এবং মাতা মাসি প্রভৃতি বসন্তরোগীর শুশ্রূষাকারিণিগণ সর্ব্বদা রোগীর পরিচর্য্যা করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে প্রায়শঃ কাহাকেও বসন্তরোগে আক্রান্ত হইতে দেখা যায় না। তাঁহাদিগের মধ্যে সকলেই যে সবল ও সুস্থকায় এরূপ অনুমান করা বাতুলতামাত্র। * তাই বলিতেছিলাম যে, যতদিন পর্য্যন্ত আয়ুর্ব্বেদে উল্লিখিত বসন্তরোগের উৎপত্তির কারণের প্রকৃত তাৎপর্য্য অবধারণ করিতে না পারা যাইবে, ততদিন পর্য্যন্ত অন্ধকারেই হাতড়াইতে হইবে। * রোগ না বুঝিলে উহার

---

* ডাক্তারগণ বলেন যে, রুগ্ন বা দুর্ব্বল দেহধারী লোকই বসন্তরোগীর সংস্পর্শে আসিলে প্রায়শঃ বসন্তরোগাক্রান্ত হয়। দেহ দুর্ব্বল থাকিলেই উহা রোগ-প্রবণ হয়, সুতরাং বসন্ত বলিয়া নহে সমস্ত রোগেই আক্রমণ করিতে পারে। তবে, আমাদের এরূপও বিশ্বাস আছে যে "শরীরের নাম মহাশয়, যাহা সওয়াও তাই সয়।"

* অল্পদিন হইল আমি কলিকাতা সহরের সানগর গ্রামে, জজ কোর্টের মোক্তার শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ ঘোষ মহাশয়ের বাটীতে, তাঁহার দৌহিত্রীকে দেখিতে গিয়াছিলাম। ঐ সময় একটী মজুর কুলগাছ কাটিয়া উক্ত বাবুর বাগানের বেড়া দিতে ছিল। হৃষীকেশ বাবু বলিলেন যে, কুলগাছে, মূল হইতে শাখা পর্য্যন্ত খুব বেশী রকমের বসন্ত হইয়াছে। নিমগাছে বসন্ত হয়, ইহা আমি পূর্ব্বেও শুনিয়াছি, কিন্তু স্বচক্ষে কখনও দেখি নাই। ঐ কথা শুনিয়াই আমি নিতান্ত উৎসুকচিত্তে, উক্ত বাবুর সহিত তাঁহার বাগানে গেলাম। বাগানে একটী কর্ত্তিত শাখা পড়িয়া ছিল। দেখিলাম ঐ শাখায়, আগাগোড়া বসন্ত-গুটিকার মত গুটিকা উঠিয়াছে। ঋতুবৈষম্যের দরুণ শাখার ঐরূপ অবস্থান্তরপ্রাপ্তি হইয়াছে বলিয়া প্রথমে আমার ধারণা হইল। তৎপরে আমি নখদ্বারা একটী গুটিকা বিদীর্ণ করিলাম ও ভিতরে, ঘোরলালরক্তদ্বারা রঞ্জিত করিলে যেরূপ দাগ পড়ে, বসন্তের গুটিকার আয়তন সদৃশ সেইরূপ দাগ রহিয়াছে দেখিতে পাইলাম। তৎপরে আরও কয়েকটী গুটিকা বিদীর্ণ করিয়া ঐরূপই দেখিলাম। স্থান স্থানে গুটিকার খোস (বাকল) উঠিয়াছে ও সেই স্থানে ঈষৎ কাল বর্ণের দাগ পড়িয়াছে। ইহাতেও আমার মনের সন্দেহ গেল না। পরে শাখার যেস্থলে বসন্তগুটিকা উঠে নাই, সেই স্থানে নখদ্বারা

প্রতীকার করা যাইতে পারে না। "রোগমাদৌ পরীক্ষেত ততোহনন্তরমৌষধম্। ততঃ কর্ম্ম ভিষক্ পশ্চাৎ জ্ঞানপূর্ব্বং সমাচরেৎ॥" অর্থাৎ আগে রোগ পরীক্ষা করিয়া ঠিক করিতে হয় ও পরে ঔষধ ঠিক করিয়া জ্ঞানপূর্ব্বক চিকিৎসা করিলেই তাহাতে ফল পাওয়া যায়। সেই জন্যই

বিদীর্ণ করিয়া, ভিতরে গাছের স্বাভাবিক সবুজের আভাযুক্ত সাদা অংশ দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। সেই কর্ত্তিত শাখাটী আন্দাজ ৩ হাত লম্বা ছিল এবং উহাতে অনুমান ২০০ গুটিকা উঠিয়া ছিল। পরে বৃক্ষটী দেখিয়া বোধ হইল যেন বৃক্ষের সর্ব্বাঙ্গে আর "ন স্থানং তিল ধারণে" গোছের হইয়াছে।

পাঠকগণের অবগতির জন্য এখানে বলিয়া রাখি যে, বসন্তগুটিকা উঠিবার পর লয় পাইয়া গেলে অর্থাৎ লাট খাইয়া গেলে, কুলগাছের ডগা বাটিয়া জলে গুলিয়া হস্তদ্বারা ঐ জল সঞ্চালন করিলে জলের উপরে সাবানের ফেনার মত যে ফেনা উঠে, ঐ ফেনা রোগীর সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া দিলে, লাটখাওয়া বসন্ত পুনর্ব্বার শরীরের উপরে ভাসিয়া উঠে।

মন্তব্য—ইহা অবিশ্বাস করিবার কোনই কারণ নাই। কারণ, গ্রন্থকার স্বচক্ষে ইহা দেখিয়াছেন ও নিজেই গুটিকার পরীক্ষা করিয়াছেন। বসন্তের প্রকোপের সময় সকলেই এই বিষয়ের অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে পারেন। আর, হিন্দুমতে বৃক্ষাদিও জীবের মধ্যেই পরিগণিত। প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার রাঘব ভট্ট বলেন "উদ্ভিদঃ স্থাবরা জীবাস্তৃণগুল্মাদিরূপিণঃ।" অর্থাৎ উদ্ভিদ এক প্রকার স্থাবর জীব, তাহারা তৃণ ও গুল্ম প্রভৃতি বহুরূপে অবস্থিত। প্রাচীন পণ্ডিতদিগের মতে জীব দুই প্রকার। স্থাবর ও জঙ্গম। চরকে আছে "সেন্দ্রিয়ং চেতনং প্রোক্তং নিরিন্দ্রিয়মচেতনম্।" যাহাদের ইন্দ্রিয় আছে তাহাদিগকে চেতন ও জঙ্গম বলে। আর, যাহাদের ইন্দ্রিয় নাই, তাহাদিগকে স্থাবর ও অচেতন বলে। এই স্থাবর আবার দুইভাগে বিভক্ত। (১) সজীব স্থাবর; (২) নির্জ্জীব স্থাবর।

লিনীয়স্ নামক কোন ইউরোপীয় উদ্ভিদ্ তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত জগতের যাবতীয় পদার্থকে ৩ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন, যথা—(১) চেতন, (২) অচেতন ও (৩) উদ্ভিদ্। যাহাদের সুখ দুঃখাদি ভোগ করিবার শক্তি আছে, যাহারা কোন এক নির্দ্দিষ্ট কাল জীবিত থাকে এবং যাহারা বর্দ্ধিত হয়, তাহাদিগকে চেতন পদার্থ বলে। যেমন, প্রাণিগণ। যাহারা কেবল বর্দ্ধিত হয়, কিন্তু অন্য দুই লক্ষণ বর্জ্জিত, তাহাদিগকে অচেতন

বসন্তের প্রতিষেধক ঔষধাদি খাওয়া যেমন লোকের ইচ্ছাধীন, বসন্তের টিকা লওয়ার বিষয়েও, ইংরেজীটিকার পরীক্ষাকাল পর্য্যন্ত, যাহার যে টিকা লইতে ইচ্ছা সেই বিষয়ে লোকদিগকে স্বাধীনতা প্রদান করা আমাদের নিকট যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয়। আর, কেবল বাঙ্গলাটিকার প্রচলন

পদার্থ বলে। যেমন, খনিজ পদার্থ। যাহারা বর্দ্ধিত হয় এবং নির্দ্দিষ্ট কাল জীবিতও থাকে, তাহাদিগকে উদ্ভিদ্ পদার্থ বলে। যেমন, বৃক্ষাদি। পাশ্চাত্য পণ্ডিত লিনীয়স্ উদ্ভিদ জাতির কেবল কোন এক নির্দ্দিষ্টকাল জীবিত থাকিবার কথা বলিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহাদের সুখদুঃখাদি বোধ করিবার শক্তি আছে কি না সেই বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত করেন নাই বা করিতে সাহস পান নাই। তবে, উদ্ভিদাদির যে জীবন আছে, উহারা যে নির্দ্দিষ্টকাল জীবিত থাকে এবং উহারা যে খনিজ পদার্থের ন্যায় নির্জ্জীব পদার্থ নহে, ইহা তিনি স্বীকার করিয়াছেন।

যাহাহউক, মানুষাদির মত বৃক্ষাদি স্থাবর জীবও যে শ্বাস প্রশ্বাসাদি ক্রিয়াদ্বারা জীবিত থাকে, তাহাও লক্ষ্য করিলে বুঝা যাইতে পারে। নিমোনিয়া, ব্রংকাইটিস্ প্রভৃতি বসন্ত রোগের উপসর্গাদির চিকিৎসার টীকায় আমরা ফুস্‌ফুস্ যন্ত্রের কার্য্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছি। আমাদের যেমন ফুস্‌ফুস্ (ফুল্‌কো) আছে, গাছগাছড়ারও তেমন ফুস্‌ফুস্: যন্ত্র আছে। আমরা যেমন শ্বাস গ্রহণ করি ও প্রশ্বাস ত্যাগ করি, গাছগাছড়ারাও তেমনি শ্বাসপ্রশ্বাসাদি কার্য্যদ্বারা জীবিত থাকে। ফুস্‌ফুস্ বা ফুল্‌কোই জঙ্গম প্রাণিদিগের শ্বাসপ্রশ্বাস কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার যন্ত্র, আর, পাতাই গাছগাছড়াদের শ্বাসপ্রশ্বাসের যন্ত্র। জীবজন্তুরা যেমন শ্বাসদ্বারা ফুস্‌ফুসের ভিতরে বায়ু গ্রহণ করে এবং বায়ুর অক্‌সিজেন ভাগ—যাহা তাহাদের রক্ত পরিষ্কারের পক্ষে এবং কাজেই জীবন-ধারণের পক্ষে বিশেষ উপযোগী—তাহা লইয়া তৎপরিবর্ত্তে কার্ব্বণিক্ এসিড্ নামক গ্যাস (এক প্রকার বাতাস)—যাহা জন্তুর পক্ষে বিষস্বরূপ—তাহা পরিত্যাগ করে, গাছ-গাছড়ারাও পাতারূপ ফুস্‌ফুস্ দ্বারা বায়ু গ্রহণ করে এবং বায়ুর মধ্যস্থিত কার্ব্বণিক এসিড্ নামক গ্যাস—যাহা গাছ গাছড়ার প্রাণধারণের পক্ষে অমৃততুল্য—তাহা গ্রহণ করিয়া, তৎপরিবর্ত্তে গাছগাছড়ার পক্ষে প্রাণনাশক বিষতুল্য অক্‌সিজেন নামক গ্যাস পরিত্যাগ করিয়া থাকে। আমাদের ফুস্‌ফুসের মধ্যে বায়ু চলাচলের জন্য যেমন হাজার হাজার বায়ুনলী আছে, বায়ু গ্রহণ করিবার জন্য ফুস্ ফুসের ভিতরে যেমন লক্ষ লক্ষ বায়ুকোষ

ও অপ্রচলন সম্বন্ধে মতামত লইয়াই আমাদের বক্তব্য নহে। আয়ুর্ব্বেদে উল্লিখিত কোন বিধি, যাহা বহুদিনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে এবং যাহা সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর হইতে কলির এত সময় পর্য্যন্ত লোকের, বিশেষতঃ ভারতবাসীর স্বাস্থ্যসুখ বিধান করিয়া আসিতেছে, তাহার

আছে এবং বায়ুর অক্‌সিজেন, রক্ত শোধনার্থ অপরিষ্কার রক্তের সহিত সহজে মিলিতে পারে সেইজন্য যেমন ঐ লক্ষ লক্ষ বায়ুকোষের গায়ে ছড়ান (বিস্তৃত) কোটি কোটি রক্ত-পূর্ণ শিরা আছে, গাছ গাছড়ার মধ্যেও সেইরূপ বন্দোবস্ত আছে। এক একটী পাতার উভয় পিঠেই হাজার হাজার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্র আছে। পাতার উপরের পিঠের ছিদ্র অপেক্ষা ভিতরের পিঠের ছিদ্র, সংখ্যায় বেশী ও বড় বড়। এই সকল ছিদ্র এত ছোট যে চর্ম্মচক্ষে দেখা যায় না। এই সমস্ত ছিদ্র দ্বারাই গাছগাছড়ারা শ্বাসপ্রশ্বাস কার্য্য নির্ব্বাহ করে। বায়ুর অক্‌সিজেন যেমন আমাদের পক্ষে জীবনস্বরূপ, আর কার্ব্বণিক এসিড্ গ্যাস যেমন আমাদের পক্ষে প্রাণনাশক বিষতুল্য, বায়ুর মধ্যস্থিত কার্ব্বণিক এসিড্ গ্যাস তেমনি গাছ গাছড়ার পক্ষে জীবনস্বরূপ ও অকসিজেন প্রাণনাশক বিষতুল্য। দিনের বেলায়, পাতার উভয় পিঠের ছিদ্রপথ দিয়াই গাছগাছড়ারা কার্ব্বণিক এসিড্ গ্রহণ করে ও অক্‌সিজেন ত্যাগ করে। রাত্রে বড় একটা অক্‌সিজেন ছাড়ে না, বরং একটু একটু কার্ব্বণিক এসিড্ গ্যাসই ছাড়িয়া থাকে, এবং এইজন্যই রাত্রে গাছতলায় শুইয়া থাকা বড় দোষের বলিয়া শাস্ত্রে বলে। "রাত্রৌ চ বৃক্ষমূলানি দূরতঃ পরিসর্পয়েৎ।"

মনুতেও আছে —"অন্তঃসংজ্ঞাঃ ভবন্ত্যেতে সুখদুঃখাদিভাগিনঃ।" (মনুসংহিতা; ১ম অধ্যায়, ৪৯ শ্লোক) অর্থাৎ মনু বলেন যে, বৃক্ষাদির ভিতরে ভিতরে সংজ্ঞা (চৈতন্য) আছে এবং তাহারা সুখদুঃখাদি অনুভব করিতে পারে। শ্রীমদ্‌ভাগবতকার বোধ হয়, রূপকে আচ্ছাদিত করিয়া গল্পচ্ছলে, বৃক্ষাদির এই তত্ত্বই আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীমদ্‌ভাগবতে এরূপ একটী গল্প আছে যে, কোন সময়ে নলকূবের ও মণিগ্রীব নামক ধনাধিপতি কুবেরের পুত্রদ্বয় অপ্সরাগণ সহ জলকেলী করিতে ছিলেন। ঐ সময়ে সাক্ষাৎ ব্রহ্মণ্যদেবসদৃশ, তেজঃপুঞ্জকলেবর, তপোধনাগ্রগণ্য নারদ ঋষি, যদৃচ্ছা ক্রমে ভ্রমণ করিতে করিতে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেবগণেরও সম্মানার্হ তাদৃশ ঋষির প্রতি সম্ভ্রম প্রদর্শন করা দূরে থাকুক, তাঁহার প্রতি ভ্রূক্ষেপও না করিয়া, ঐশ্বর্য্য-মদমত্ত কুবেরপুত্রদ্বয় জলকেলী করিতে লাগিলেন। তখন নারদ মুনি ক্রোধাবিষ্টচিত্তে

পরিবর্ত্তন করিতে হইলে, বহুদিন পরীক্ষা ও বিশেষ বিবেচনা করার দরকার। কারণ, আয়ুর্ব্বেদ সুগভীর ও সুদৃঢ়ভিত্তির উপর সংস্থাপিত, সম্পূর্ণ কার্য্যকারণসূত্রে গ্রথিত ও প্রত্যক্ষাদি প্রমাণে রচিত। অন্য কোন চিকিৎসাবিজ্ঞানের সেরূপ সুদৃঢ় ভিত্তি নাই। যেহেতু, আয়ুর্ব্বেদ

তাঁহাদিগকে অভিশাপ প্রদান করিয়া বলিলেন যে, "যখন তোমরা ধনমদে মত্ত হইয়া সম্মানার্হ ব্যক্তির সম্মুখেই দেবযোনির অনুপযুক্ত এইরূপ বিসদৃশ ক্রিয়াদির অনুষ্ঠান করিতে মনে কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করিতেছ না, তখন তোমরা বৃক্ষযোনি প্রাপ্ত হও।" অভিশাপ শ্রবণ করিয়া কুবেরের পুত্রদ্বয়ের চৈতন্য হইল এবং তাঁহারা নানারূপে উক্ত ঋষির স্তবাদি করিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিলেন। অপনীতসংরম্ভ ও পুনঃপ্রকৃতিস্থচিত্ত স্বভাবদয়ালু ঋষি বলিলেন যে "আমার অভিশাপ ব্যর্থ হইবার নহে। তবে, তোমরা কিছুকাল নন্দভবনে যমলার্জ্জুন বৃক্ষরূপে (যুগল অর্জ্জুন বৃক্ষরূপে) অবস্থিতি কর। ঐ সময়ে তোমাদের চৈতন্য থাকিবে, অনুভব করিবার শক্তি থাকিবে, কিন্তু তোমরা মনের ভাব প্রকাশ করিতে সমর্থ হইবে না। এইরূপে কিছুকাল ভোগের পর শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক ভগ্ন হইলে এই অভিশাপের খণ্ডন হইবে এবং তোমরাও পূর্ব্বদেহ ও পূর্ব্বপ্রকৃতি প্রাপ্ত হইবে।"

আজকাল সুপণ্ডিত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জগদীশ চন্দ্র বসু মহাশয়ও প্রমাণ করিয়াছেন যে, পৃথিবীস্থ যাবতীয় পদার্থেরই জীবন আছে এবং উহাদের অনুভব করিবার শক্তিও আছে।

আয়ুর্ব্বেদকার ঋষিগণ প্রথমে জঙ্গম প্রাণিগণের আহারাদি কিরূপে পরিপাক পায় ও সেই আহারজ রস হইতে কিরূপে রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়া দেহের আপ্যায়ন, পরিপোষণ ও পরিবর্দ্ধন করে, ইত্যাদি বিষয় নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন। পরে কি স্থাবর, কি জঙ্গম, কি প্রাণী, কি অপ্রাণী সকলেরই পরিপোষণ ও পরিবর্দ্ধনাদির মূল কারণ আভ্যন্তরীণ বিপাকাদির বিষয় নিষ্পত্তি করিয়াছেন—অর্থাৎ জঙ্গম প্রাণীর পক্ষে যেমন মধুরাম্ল প্রভৃতি ছয়রসবিশিষ্ট দ্রব্য আহার করিলে পরিপাকের পর যে রস উৎপন্ন হয় সেই একই আহারজ রস (Chyle) হইতে রক্ত, মাংস মেদ, অস্থি মজ্জা প্রভৃতি বিভিন্ন গুণ বিশিষ্ট ও বিভিন্ন প্রকৃতির দ্রব্যাদি উৎপন্ন হয়, বৃক্ষাদি স্থাবর জীবের পক্ষেও তদ্রূপ, যে ভাবে মূলাকৃষ্ট একই রস হইতে বৃক্ষাদির আভ্যন্তরীণ বিপা-

আপ্তবাক্য অর্থাৎ উহা ভ্রমপ্রমাদপরিশূন্য, সদাসত্ত্বগুণালোকিতচিত্ত এবং রজো ও তমোগুণ হইতে সম্পূর্ণ নির্ম্মুক্ত, ত্রিকালজ্ঞ ঋষিদিগের মুখনিঃসৃত অমৃতভাণ্ডার। "শাস্ত্রকারের উৎকর্ষে শাস্ত্রের উৎকর্ষ অবশ্যম্ভাবী।"

কাদি দ্বারা বিভিন্ন রসের উৎপত্তি হয়, তাহাও স্থির করিয়া গিয়াছেন। গ্রহণী চিকিৎসা উপলক্ষে চরক বলেন—

"ভৌমাপ্যাগ্নেয় বায়ব্যাঃ পঞ্চোষ্মানঃ সনাভসাঃ।
পঞ্চাহারগুণান্ স্বান্ স্বান্ পার্থিবাদীন্ পচন্তিহি॥"

অর্থাৎ পাঞ্চভৌতিক (ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম্ এই পঞ্চ ভূত পদার্থ) অন্নের পঞ্চ প্রকার উপাদান হইতে, ভৌম্য জলীয়, আগ্নেয়, বায়ব্য ও নাভস এই পাঁচ প্রকার পাচক উষ্মা উত্থিত হইয়া আহারের ৫ প্রকার পার্থিবাদি গুণ পাক করিয়া থাকে অর্থাৎ আহারের ভৌম্য উষ্মা আহারের ভৌম্য অংশ পরিপাক করে, জলীয় উষ্মা জলীয়াংশের পরিপাক করে ইত্যাদি। আহারের ঐ সকল গুণ পরিপাক পাইয়া পঞ্চ ভূতাত্মক দেহের ঐ সকল গুণকে পরিপুষ্ট করে। অর্থাৎ আহারের পার্থিব গুণ—গুরু, খর, কঠিন, মন্দ, স্থির, বিশদ, সান্দ্র ও স্থির—শরীরের ঐ ঐ পার্থিব গুণের বৃদ্ধি করে। এইরূপ আহারের জলীয় গুণ শরীরস্থ জলীয় গুণদিগকে পরিপুষ্ট করে। এই পাঁচ প্রকার পাচক উষ্মা বা ভৌতিক তেজকেই আয়ুর্ব্বেদকারগণ ভূতাগ্নি বলিয়া আখ্যা দিয়াছেণ। জঙ্গম প্রাণীর মত স্থাবর বৃক্ষাদি ও খনিজ স্বর্ণরৌপ্যাদিও এই নিয়মের অধীন। দেখ, জঙ্গম প্রাণীর ভিতরে যেমন রস, রক্ত মাংসাদি বিভিন্ন রসাত্মক ও বিভিন্ন গুণাত্মক দ্রব্য একই আহারজ রস হইতে উৎপন্ন ও বর্দ্ধিত হইতেছে, বৃক্ষাদির ভিতরেও তদ্রূপ উহাদের প্রত্যেক অবয়বে বিভিন্ন প্রকার আস্বাদ ও গুণবিশিষ্ট বিভিন্ন প্রকারের রস বিদ্যমান আছে এবং উহারা একই মূলাকৃষ্ট রস হইতেই উৎপন্ন ও বর্দ্ধিত হইতেছে। কোন এক বৃক্ষেরই হয়ত মূলে কটুরস, বাকলে তিক্তরস, পত্রে কষায় রস ও ফলে হয়ত মধুর রস বিদ্যমান আছে। আবার, ঐ ঐ রস কেবল যে আস্বাদনে বিভিন্নপ্রকার বোধ হয় তাহা নহে। হয়ত উহারা গুণেতেও বিভিন্ন। যেমন—

"পটোলপত্রং পিত্তঘ্নং নাড়ীতস্য কফাপহা।
ফলং ত্রিদোষশমনং মূলং তস্য বিরেচনম্॥"

" রজস্তমোভ্যাং নির্ম্মুক্তস্তপোজ্ঞানবলেন যে।
যেষাং ত্রৈকালমমলং জ্ঞানমব্যাহতং সদা॥
আপ্তাঃ শিষ্টা বিবুদ্ধাস্তে তেষাং বাক্যমসংশয়ম্।
সত্যং বক্ষ্যন্তি তে কস্মাদসত্যং নীরজস্তমাঃ॥"

চরক।

অর্থাৎ যাঁহারা জ্ঞান ও তপঃ প্রভাবে, রজো ও তমোগুণ হইতে সম্পূর্ণ নির্ম্মুক্ত হইয়াছেন, যাঁহাদের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই তিন কালেরই জ্ঞান বিদ্যমান রহিয়াছে এবং যাঁহাদের জ্ঞান কোনও প্রকারে বাধা পায় নাই, তাঁহারা আপ্ত, শিষ্ট, বা বিবুদ্ধ। তাঁহাদের বাক্য সন্দেহের

অর্থাৎ পটোল পত্র (পলতা) ভক্ষণে পিত্ত নাশ হয়, নাড়ী অর্থাৎ পটোলের ডাঁটা সেবনে কফ বিনষ্ট হয়, ফল (পটোল) ভক্ষণে ত্রিদোষের শমতা হয় এবং মূল সেবনে বিরেচন হয়। পটোলের গেড় (মূল) জয়পালের গোটার মত অত্যন্ত ভেদক, বোধ হয় ইহা অনেকেই জানেন। বৃক্ষলতাদি স্থাবর প্রাণিগণ মূলদ্বারা পৃথিবীস্থ পঞ্চভূতাত্মক রসকে আকর্ষণ করে। পরে ঐ রস বৃক্ষাদির অভ্যন্তরস্থ যথাযথ ধমনী দ্বারা পত্র, শাখা প্রভৃতি বৃক্ষাবয়বের যথাস্থানে আকর্ষিত হয়। তৎপরে বৃক্ষাদির অভ্যন্তরস্থ ভূতাগ্নি দ্বারা ঐ রস পরিপাক পাইয়া বৃক্ষাদির মূল, শাখা, ত্বকাদির পোষণ কার্য্য নির্ব্বাহ করে এবং পরিপাকের সময় রাসায়নিক ক্রিয়া দ্বারা বৃক্ষাবয়বের নানাস্থানে নানাবিধ রসের সৃষ্টি হয়। বৃক্ষাদির রস পরিপাক কার্য্যে পরমেশ্বরের এই অপূর্ব্ব কৌশল না থাকিলে, বৃক্ষাদির মূল হইতে ফল পর্য্যন্ত, ছয় প্রকার রসের কোন এক প্রকার রসেরই উপলব্ধি হইত।

যখন দেখা যাইতেছে যে স্থাবর জঙ্গম সকল প্রকার প্রাণীই, পরিপোষণও পরিবর্দ্ধনাদি বিষয়ে প্রায় একই নিয়মের অধীন, তখন ব্যারামাদির বিষয়েও যে তাহারা প্রায় একই নিয়মে শাসিত হইবে না, তাহার কোন কারণ নাই। শাস্ত্রে আছে যে, "অদ্ভুতং ন প্রকাশয়েৎ" অর্থাৎ অদ্ভুত পদার্থ প্রত্যক্ষ না করিলে লোকে বিশ্বাস করে না বলিয়াই উহা প্রকাশ করিতে নাই। এই জন্যই আমরা কুল গাছের বসন্ত উপলক্ষে এত কথার অবতারণা করিলাম।

অতীত। তাঁহারা রজো ও তমোগুণের অতীত বলিয়া, অসত্য বলা তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব।

মন্তব্য—কথাগুলি কাহারও কাহারও নিকট গোঁড়ামী গোঁড়ামী গোছের বলিয়া বোধ হইতে পারে। কেহ কেহ হয়ত বলিবেন যে, মানুষ যতই জ্ঞানী হউক না কেন, সম্পূর্ণরূপে ভ্রমপ্রমাদপরিশূন্য হইতে পারে না। ঋষিগণ যখন মানুষ ছিলেন, তখন কাজেই তাঁহারাও ভ্রমপ্রমাদ-পরিশূন্য নহেন। আর, সকল স্থলেই দেখা যায় যে, কেহ বা ২ টী সত্যের সন্ধান পায়, কেহ বা ১০টী সত্যের সন্ধান পায়। "ঐ যে মধ্যাহ্ন-সূর্য্য আকাশ হইতে জগতের উপর কিরণজাল বিস্তার করিতেছেন, উহার আলোক আমি দেখিতে পাইতেছি। কিন্তু তাই বলিয়া কি সূর্য্যের সমস্ত রশ্মি আমারই চক্ষে পড়িয়াছে? তাই বলিয়া কি দূরস্থ লোকে সূর্য্য দেখিয়াছে বলিলে বিশ্বাস করিব না? সূর্য্যরশ্মি যেমন দর্শকমাত্রেরই চক্ষে কিছু কিছু পড়ে, কাহারও চক্ষে সমস্ত পড়ে না। চিকিৎসার সত্যও সেইরূপ সর্ব্বপ্রকার মতেরই ভিতর কিছু কিছু আছে, কোনটীতেই সমস্ত নাই।" আর, কোন এক ব্যক্তি ১টী, ২টী বা ততোঽধিক সত্য আবিষ্কার করিলেই যদি তাঁহাকে আপ্তঋষি বলিতে হয় তবে ইউক্লিড, নিউটন, হানিম্যান প্রভৃতি সকলকেই আপ্তঋষির অন্তর্ভুক্ত করিতে হয়। ইত্যাদি। এই সকল আপত্তির উত্তর আমরা যুক্ত ও যুঞ্জান যোগীর পার্থক্যের আলোচনায় একপ্রকার দিয়াছি এবং পরেও সবিস্তারে উল্লেখ করিয়াছি। তবে এখানে একটী কথা বলিবার এই আছে যে, "আপ্তঋষি" কথাটার ভুল অর্থ করিলে হইবে না। আপ্তঋষি সত্য আবিষ্কার করেন বা যাহা বলেন তাহা সত্য ভিন্ন অসত্য হয় না বটে, কিন্তু সত্য আবিষ্কার করিলেই আপ্তঋষি হয় না। আর, আপ্তঋষিগণ ভ্রমপ্রমাদপরিশূন্য ছিলেন বলিয়া সকল ঋষিই আপ্তঋষি নহেন এবং আপ্তঋষিগণও অলৌকিক গুণ ও শক্তিসম্পন্ন হইলেও তাঁহারা ঈশ্বরের

ন্যায় সর্ব্বশক্তিমান্ নহেন। আমরাও মানুষ এবং তাঁহারাও মানুষ ছিলেন এরূপ তুলনা করা সঙ্গত নহে। আপ্তঋষিগণের কথা ছাড়িয়া দিলেও " তৎকালে যাঁহারা এদেশে জ্ঞানী ও গুরু বলিয়া গণ্য ছিলেন, তাঁহাদের সহিত আমাদের, অথবা কেবল আমাদের কেন, কোন দেশের জ্ঞানী সম্প্রদায়েরই তুলনা হইতে পারে না। তাঁহাদের সহিত আমাদের বা আমাদের সহিত তাঁহাদের তুলনা করিয়া তাঁহাদিগকে অপবিত্র করা সঙ্গত নহে। এক্ষণে জর্ম্মান্, ফ্রান্স বা ইংলণ্ড অথবা যে কোন দেশের পণ্ডিত সম্প্রদায়ের উল্লেখ কর না কেন, কোন সম্প্রদায়ই সেই ভারতগুরু, কেবল ভারতগুরু নন, জগদ্‌গুরু ঋষিগণের ন্যায় " জ্ঞানাৎ পরতরং নহি " এই ধ্রুববিশ্বাস হৃদয়ে স্থাপন করিতে পারেন নাই। কোন সম্প্রদায়ই দুর্নিবার বিষয়লালসা পরিহারপূর্ব্বক নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী * থাকিয়া একমাত্র জ্ঞানার্জ্জনে তদ্রূপ আত্মসমর্পণ করিতে পারেন নাই। আধুনিক সভ্যজাতিগণ বৃত্তিপুরস্কার প্রভৃতির প্রলোভন দেখাইয়া সাধারণকে জ্ঞানোপার্জ্জনে প্রবর্ত্তিত করেন, তাঁহাদের সময়ে এরূপ কোন প্রলোভন ছিল না, অথচ তাঁহারা জ্ঞান-পিপাসায় আকুল ছিলেন। তাঁহাদের জ্ঞানের চরমফলও এক্ষণকার তুলনায় সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল,—এক্ষণকার জ্ঞানের ফল সর্ব্বগ্রাস, তাঁহাদের জ্ঞানের ফল সর্ব্বত্যাগ ছিল। " জ্ঞানমেব পরং শ্রেয়ঃ " এইরূপ দৃঢ়জ্ঞান তাঁহাদের হৃদয়ে জাগরূক ছিল—কি শারীরিক, কি মানসিক, উভয়বিধ সুখসমৃদ্ধিই একমাত্র বিশুদ্ধ জ্ঞানের আয়ত্ত বলিয়া তাঁহাদের ধ্রুববিশ্বাস ছিল ‡—জ্ঞানপ্রবাহ অনাদি ও অনন্ত বলিয়া তাঁহাদের ধারণা ছিল—প্রকৃতি তাঁহাদের শিক্ষয়িত্রী

* যে ব্যক্তি উপনয়নাবধি মরণ পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক গুরুকুলে বাস করেন।

‡ "সমগ্রং দুঃখমায়ত্তমবিজ্ঞানে দ্বয়াশ্রয়ম্।
সুখং সমগ্রং বিজ্ঞানে বিমলেচ প্রতিষ্ঠিতম্॥"

চরক, সূত্রস্থান, ৩০শ অঃ।

ছিলেন, * * * * সেই জ্ঞানৈকধন, রাগদ্বেষবিবর্জ্জিত, স্বার্থশূন্য, বিশ্বহিতৈষী ও উদারচেতা মহাপুরুষগণের সহিত আজ কালের লোকের তুলনাই হইতে পারে না।”

আয়ুর্ব্বেদের বীজভাগগুলি বাস্তবিকই স্বতঃসিদ্ধ ‡ ও অপরিবর্ত্তনীয়। এইগুলি নানামুনি নানা ভাবে, যুক্তি তর্ক, ও পরীক্ষাদিদ্বারা নানা

---

‡ “আয়ুর্ব্বেদ অপৌরুষেয় সুতরাং বিশুদ্ধ এবং শাশ্বত। তবে, প্রচলিত আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থগুলি একান্ত নির্দ্দোষ বলা যায় না। সে দোষ সময় গতির—আয়ুর্ব্বেদের নহে। সূত্রকার, টীকাকার এবং সংগ্রহকারদিগেরও কথঞ্চিৎ দোষ আছে। * * * * আয়ুর্ব্বেদ বেদের উপাঙ্গ। হিন্দুদের মতে বেদ অপৌরুষেয়, সুতরাং আয়ুর্ব্বেদও অপৌরুষেয় অর্থাৎ কোন পুরুষনির্ম্মিত নহে। ইহাতে এমন বুঝায় না যে, কতকগুলি বিষয় মনুষ্যভাষায় গ্রথিত হইয়া আপনাআপনি মনুষ্য সৃষ্টির পূর্ব্ব হইতে চলিয়া আসিতেছে। ইহার তাৎপর্য্য স্বতন্ত্র এবং তাহা এইরূপ—যাহার অস্তিত্ব আছে, তাহাকে সৎ বলে। যাহা সদবিচ্ছিন্ন তাহা সত্য নামে অভিহিত হয়। সত্য নিত্যগ, অব্যয় এবং স্বয়ংসিদ্ধ সুতরাং অপৌরুষেয়। কারণযোগে যেমন সতের আবির্ভাব হয়, সঙ্গে সঙ্গে তেমনি কতকগুলি সত্যের আবির্ভাব হইয়া থাকে। কারণবিশ্লেষে সতের বিলয়, সঙ্গে সঙ্গে সত্যেরও তিরোভাব হয়। এইজন্য সত্য নিত্যগ এবং পুরুষকারজন্যও নহে। নিয়ন্তা অবশ্যই আছেন, কিন্তু তিনি অনাদি, পুরুষপদবাচ্যও নহেন। সাদিসৃষ্ট মনুষ্য অনাদির বিষয় ধারণা করিতে পারে না, সুতরাং যাহা সত্য, তাহা তাহাদের বিবেচনায় নিত্যগ এবং অপৌরুষেয়। আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক এবং আধিভৌতিক সত্য, বেদ বিজ্ঞানের বিষয়। সত্যস্বরূপ বলিয়া ইহারাও নিত্য এবং অপৌরুষেয় বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। যে সত্য যিনি যখন প্রমাণ দ্বারা উপলব্ধি করেন, ইচ্ছা হইলে তখন তিনি তাহা মনুষ্য ভাষায় ব্যক্ত করিয়া থাকেন। বেদে তাঁহাকে ঋষি বলে। বিজ্ঞানে তিনি বৈজ্ঞানিক। বেদ বল, বিজ্ঞান বল, উভয়েই জ্ঞানার্থক ধাতু লইয়া গঠিত। বিদ্ ধাত্বর্থে জ্ঞান বুঝায়, জ্ঞান ধাত্বর্থেও তাই। সত্য বা তত্ত্বজ্ঞান বেদ্ বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। এক আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক বিষয়ক, অপর আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়ক।”

(চিকিৎসা-সম্মিলনী)।

প্রকারে বুঝিয়াছেন বা বুঝাইয়াছেন। শাস্ত্রের ভাষায় আয়ুর্ব্বেদের নিয়মগুলিকে সূত্র বলে। আবার, শাখাসূত্র অনেক আছে, পরন্তু অসংখ্য নহে। কিন্তু, প্রশাখাসূত্র অসংখ্য। মূলসূত্রের কখনও অন্যথা হয়না, বা হইবে না। উহাকে "একমেবাদ্বিতীয়ম্" বলা যায়। উহা ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধের ন্যায় চিরদিন সমান আধিপত্য করিবে। "Things, which are equal to the same things are equal to one another." ইহা যেমন চিরকালই অপরিবর্ত্তনীয় থাকিবে, আয়ুর্ব্বেদের ঔষধকাণ্ডের মূলসূত্র "সর্ব্বদা সর্ব্বভাবানাং সামান্যং বৃদ্ধিকারণং। হ্রাসহেতুর্বিশেষশ্চ প্রবৃত্তিরুভয়স্যতু॥"* ইহাও তেমনি চিরকাল অপরিবর্ত্তনীয় আছে ও থাকিবে। "নৈষ সামান্য বিশেষাভ্যাং বৃদ্ধিহ্রাসরূপো ভাবস্বভাবঃ কদাচিদপ্যন্যথাভবতি।" চক্রদত্ত। এই মূলসূত্রের কখনও অন্যথা হয় না। তবে, দেশ-কাল-পাত্র ভেদে সূত্রাদির অতিক্রম করা দরকার হয়। ("ন চৈকান্তেন নির্দ্দিষ্টে" ইত্যাদি—এই বই'র ৪২ পৃষ্ঠা দেখ)। সূত্রাদির পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধনাদিরূপ ব্যভিচার করিতে হয় বলিয়া আয়ুর্ব্বেদ ভ্রমপ্রমাদপরিশূন্য আপ্তঋষিগণ কর্ত্তৃক রচিত হইলেও, সমগ্র আয়ুর্ব্বেদের যথানির্দ্দিষ্ট নিয়ম-

---

* অর্থাৎ কোন দ্রব্যে সমান দ্রব্য যোগ করিলে বৃদ্ধি হয়। সকল স্থলেই দ্রব্য সম্বন্ধে এই নিয়ম খাটে। আবার, কোন দ্রব্যে অসমান দ্রব্য যোগ করিলে তাহার হ্রাস হয়। এইরূপ হ্রাস ও বৃদ্ধি জগতে সর্ব্বদা ঘটিতেছে। যেমন, জল ও শ্লেষ্মার গুণ সমান বলিয়া জলপানে শ্লেষ্মার বৃদ্ধি হয়। তিক্তদ্রব্য ও বায়ুর গুণ সমান বলিয়া তিক্তদ্রব্য সেবনে বায়ুর বৃদ্ধি করে। বায়ুর আর একটী গুণ শীতলতা। কুইনাইন তিক্ত ও শীতল বলিয়া বায়ুর বৃদ্ধি করে। কাজেই, যে রোগীর বায়ুর ক্ষীণতা হইয়াছে বা যে রোগীর বাতলপ্রকৃতি নহে, তাহার পক্ষে কুইনাইন উপকার করে। আমাদের দেশীয় লোকের দেহে রক্তের তেজ কম বলিয়া সকলেরই প্রায় বাতলপ্রকৃতি। কাজেই, বিশেষ দরকার না হইলে আমাদের ধাতে কুইনাইন দিতে নাই। (১ম অঃ, সূত্রস্থান, চরক)।

গুলি অন্ধভাবে অনুসরণ করা যায় না। কার্য্যক্ষেত্রে আমাদের নিজেদের বুদ্ধিদ্বারা পরিচালিত হইতে হয়। কাজেই, নানারূপ মতভেদ ও নানারূপ চিকিৎসাভেদ আসিয়া উপস্থিত হয়। ফলতঃ উপকারিতার বিষয়ে বিবেচনা করিলে চিকিৎসাশাস্ত্র গণিতশাস্ত্রের উপরে আসন পাইবার যোগ্য হইলেও ঐ সমস্ত দোষের দরুণ শাস্ত্রীয়াংশে গণিতের সমান আসন পাইবার যোগ্য নহে।

বসন্তরোগে ৺ শীতলাপূজার অর্থ কি ?
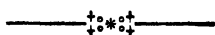
কেহ কেহ এরূপও আপত্তি করিতে পারেন যে,—হইল বসন্তরোগ—লিখিতেছ,—বসন্তরোগের বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা,—কিন্তু ৺ শীতলাপূজার অথবা শীতলার বাহন গাধা প্রভৃতির বর্ণনাও ত তোমার ঋষিপ্রণীত শাস্ত্রে আছে, উহাও কি বৈজ্ঞানিক বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে? বরং স্বীকার করিলাম যে তোমার শাস্ত্র আপ্তঋষিবাক্য, কিন্তু, ব্যারাম হইল,—দুশ্চিকিৎস্য বসন্তরোগ;—চিকিৎসা করিবে পাচন বটিকাদিদ্বারা, তবে শীতলাপূজার অর্থ কি? আর, শীতলার যেরূপ বর্ণনা তোমার ভাবপ্রকাশাদি গ্রন্থে আছে, উহাত না মাছ, না বিষ্ণু গোছের দেবতা বলিয়াই বোধ হয়। আজ কালের লোকে "রোগী যেন নিম খায় মুদিয়া নয়ন" ভাবে উহার পূজা করে বটে, কিন্তু উহার প্রতি যে আজ কালের শিক্ষিত কাহারও ভক্তির উদ্রেক হইতে পারে, এমন কিছুত ধারণাই করিতে পারি না! ভাবপ্রকাশে আছে,—

"বন্দেঽহং শীতলাং দেবীং রাসভস্থাং দিগম্বরীম্।
যামাসাদ্য নিবর্ত্তেত বিস্ফোটকভয়ং মহৎ॥
শীতলে! শীতলে! চেতি যো ব্রয়াদ্দাহপীড়িতঃ।
বিস্ফোটকভয়ং ঘোরং ক্ষিপ্রং তস্য প্রণশ্যতি॥"

* * * * *

" নমামি শীতলাং দেবীং রাসভস্থাং দিগম্বরীম্।
মার্জ্জনীকলসোপেতাং সূর্পালঙ্কৃতমস্তকাম্॥ "

ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি।

অর্থাৎ যাঁহাকে পাইলে বিস্ফোটকের মহাভয় হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, সেই গর্দ্দভবাহিনী, দিগম্বরী শীতলাদেবীকে নমস্কার। শীতলা-রোগাক্রান্ত ব্যক্তি শীতলে শীতলে বলিয়া আরোগ্য প্রার্থনা করিলে দাহসংযুক্ত উৎকট বিস্ফোটক রোগ নষ্ট হয়। * *

* * * * *

যিনি মস্তকে সূর্প (কুলা) ধারণ করিয়াছেন, সেই সম্মার্জ্জনী (ঝাটা) ও কলসীধারিণী গর্দ্দভস্থা দিগম্বরী শীতলা দেবীকে নমস্কার।

ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি।

ইহার উত্তর দিতে হইলে, আমাদিগকে আয়ুর্ব্বেদের চিকিৎসাসূত্রের সম্যক্ মর্ম্মোদ্ঘাটন করিয়া সবিস্তারে দেখাইতে হয়। কিন্তু, এই ক্ষুদ্র পুস্তকে সেরূপ বর্ণনা অনাবশ্যক ও কোন কোন পাঠকের বিরক্তিকর হইতে পারে। তবে, সংক্ষেপে কিছু বলা আবশ্যক। শীতলাপূজা প্রকৃত পক্ষে কি দেখা যাউক। " পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা যেরূপ বিজ্ঞানে জড়শক্তির প্রাধান্য অনুভব করিয়া কৃতার্থতা লাভ করিয়াছেন, হিন্দুরা সেইরূপ বিজ্ঞানে অতীন্দ্রিয় শক্তির প্রাধান্য অনুভব করিয়া কৃতার্থ। তাই, হিন্দুরা রোগে, শোকে, শান্তিস্বস্ত্যয়ন, জপতপ ও দানধ্যানের পরামর্শ দেন। মূল কি শাখা পল্লবাদি ঔষধের উপকরণ সংগ্রহ করিতে হইলে, অগ্রে ঈশ্বরের নাম করিয়া স্নানান্তে শৌচ হইয়া তাহা সংগ্রহ করিবার নিয়ম। এই অতীন্দ্রিয় দৃষ্টিবলেই যেখানে পাশ্চাত্যেরা ৬৪ মহাভূতকে সৃষ্টির আদি বলিয়া ধরেন, সেখানে হিন্দুশাস্ত্র আরও সূক্ষ্মেতে গিয়া সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটী গুণকে আদি বলিয়া ধরে। বসন্ত-রোগে শীতলার পূজা যে হিন্দুদিগের মনকে প্রাচীন কাল হইতে ঔষধাদির

ব্যবস্থা অপেক্ষা অধিকতর আকর্ষণ করিয়াছে, পূর্ব্বোক্ত অতীন্দ্রিয়-প্রাণতাই তাহার কারণ।” “জগদ্বিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত ক্যাণ্ট (Kant) একস্থলে বলিয়াছেন “ দুইটী বস্তুর বিষয় আমরা যতই চিন্তা করি, আমাদিগের প্রাণে ততই নবীন নবীন ভাবের উদ্রেক হয় এবং আমাদের হৃদয় ভক্তি ও বিস্ময়ে আবিষ্ট হইয়া থাকে। একটী উর্দ্ধে প্রসারিত নক্ষত্রখচিত অনন্ত আকাশ; অপরটী অধ্যাত্ম জগতের নিয়মাবলী।” কিন্তু, মানবহৃদয় বাহ্যজগৎ দ্বারাই প্রথমে আকৃষ্ট হয়। আর্য্যঋষিগণই প্রাচীনকালে দীপ্যমান দ্যৌ পরিদর্শন করিয়া চমৎকার-সম্বলিত অভিনবভাবে আপ্লুত হইয়াছিলেন। ক্যাণ্টের মত একজন নীরস দার্শনিক পণ্ডিতও যখন দ্যুলোক দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইতে পারেন, আমাদিগের ন্যায় সংসারগ্রস্ত লোকও যখন উর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করিলে সময়ে সময়ে অপূর্ব্বভাবে বিভোর হইয়া থাকে তখন প্রাচীন কালের সরলবিশ্বাসী আর্য্যঋষিগণ যে অধিকতর বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া দ্যৌকে দেবতা বলিয়া পূজা করিবেন ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে ?

এই দ্যৌ কি জড়পদার্থ ? আর্য্যঋষিগণ কি এই জড়ের পূজা করিতেন ? মানুষ কি কখনও জড়ের পূজা করিতে পারে ? মানুষ কখনও জড়কে ঈশ্বর বলিয়া পূজা করিতে পারে না, এবং কখন করিতেও পারিবে না। তোমরা সূর্য্য তারকাকে বিশ্লেষণ (Analyse) করিয়া কেবল জড়ত্ব দেখিতেছ, আর্য্যঋষিগণ তাহা দেখিতে পান নাই। তাঁহারা সূর্য্যতারকাতে কেবল শক্তি দেখিতেন। তোমরা ইহাদের মূলে কোন শক্তি দেখিতেছ না। দূরবীক্ষণদ্বারা সমস্ত দ্যুলোক পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তোমরা বিধাতাকে খুজিয়া পাইলে না (“ I have swept the heavens with my glass and found no God :—Lalaude.) Spectroscope দ্বারা জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর জ্যোতিঃপুঞ্জ বিশ্লেষণ করিলে কিন্তু তোমরা কোন স্থলে সত্যস্বরূপকে দেখিতে পাইলে না। চক্ষু যদি

থাকিত দেখিতে পাইতে, হৃদয় থাকিলে বুঝিতে পারিতে। ঋষিদের চক্ষুলাভ করিলে দেখিতে পাইতে যে চন্দ্রসূর্য্যাদি কেবল জড়পদার্থ নহে, ইহাদের সঙ্গে সঙ্গেই ইহাদের "অন্তর্য্যামী" পুরুষ বর্ত্তমান রহিয়াছেন, নতুবা ইহাদের অস্তিত্ব সম্ভব হইত না। ঋষিগণ জড় হইতে জড়ের অন্তর্য্যামীকে পৃথক করিতে পারেন নাই, তাই তোমরা ভাবিতেছ তাঁহারা জড়ের উপাসনা করিতেন। তোমাদিগের দ্যৌ ও ঋষিগণের দ্যৌ নামে একবস্তু হইলেও কার্য্যতঃ ইহারা পৃথক্ বস্তু। তোমাদিগের দ্যৌ কেবল জড়, কিন্তু ঋষিদিগের দ্যৌ কেবল চেতন। তোমরা যেখানে চৈতন্য খুঁজিয়া পাইতেছ না, ঋষিগণ সেখানে জড়ত্ব দেখিতে পান নাই।"

"কথাগুলি সত্য হইলেও শুনিতে যেন কেমন কেমন বোধ হয়। প্রত্যক্ষসিদ্ধ জগতের আনন্দ শোক ভ্রান্তিবিজৃম্ভিত বলিয়া উপেক্ষা করিয়া অপ্রত্যক্ষ ব্রহ্মানন্দে ডুবিতে হইবে, সে ত পরের কথা, আপাততঃ একথা যে বলে, তাহাকেই যেন কুসংস্কারপূর্ণ অসাম্প্রদায়িক অরসিক বলিয়া বোধ হয়। পুত্রের মৃতদেহ বক্ষে ধারণ করিয়া চক্ষের জলে ভাসিয়া যে কাঁদিয়া আকুল হইতেছে, তাহার নিকটে বসিয়া যদি কেহ রঙ্গরসের গল্প করে, অথবা বিবাহযাত্রায় সুসজ্জিত আনন্দোৎফুল্ল যুবাকে কেহ যদি শব সংকারের জন্য অনুরোধ করে—তবে তাহা যেমন অসঙ্গত এবং অসহ্য, প্রত্যক্ষদৃশ্য সংসারকে উপেক্ষা করিয়া অপ্রত্যক্ষ তত্ত্বের অন্বেষণে ধাবিত হওয়ার এ উপদেশও তেমনি অসঙ্গত এবং অসহ্য। এই অসহ্যতা নিবন্ধন তুমি আমি উপদেষ্টাকে উন্মত্ত মনে করিতে পারি, কিন্তু তাহাতে উপদেষ্টার কিছু আসে যায় না। মনে কর—অভিনয় পদার্থ কি তাহা না জানিয়া, তুমি ও আমি, রামায়ণের অভিনয় দেখিতে বসিয়াছি—কৌশল্যার শোকে, দশরথের মরণে, সীতার আর্ত্তনাদে, মন্দোদরীর ক্রন্দনে, তুমি আমি হুহু করিয়া কাঁদিতেছি—আবার লক্ষণের বীরবিক্রমে, রামচন্দ্রের বিশ্ববিজয়ী রণনৈপুণ্যে, ইন্দ্রজিতের অহঙ্কারে, রাবণের

হুহুঙ্কারে, আনন্দিত, পুলকিত, ভীত, চকিত ও স্তম্ভিত হইতেছি। আবার সেই সময়েই দেখিতেছি—আমাদেরই মধ্যে বসিয়া, কি জানি, কে একজন ঐ সকল দৃশ্য দেখিয়াই, হো হো করিয়া হাঁসিয়া অস্থির হইতেছে। তুমি আমি হয় ত বলিব "লোকটা উন্মত্ত"। কিন্তু, তাহাতে তাহার হাঁসির বিরাম হইবে না। লোকটাকে উন্মত্তই বল, আর যাই বল, একবার ভাবিয়া দেখ যে, লোকটা হাঁসে কেন? একই স্থান, একই দৃশ্য, একই, বিষয়, সকল লোক একবার হাঁসে, একবার কাঁদে, আর ঐ লোকটা ক্রমাগতই হাঁসে, ইহার অর্থ কি? মূলতত্ত্ব অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাই—হাঁসি কান্নার আর কোন কারণ নাই—কারণ কেবল এই যে, তুমি আমি অভিনয় না জানিয়া, অভিনয় পদার্থ কি তাহা না বুঝিয়া, অভিনয় দেখিতে বসিয়াছি, আর ঐ ব্যক্তি অভিনয় কি তাহা জানিয়া শুনিয়া অভিনয় দেখিতে বসিয়াছে—তুমি আমি দেখিতেছি রাম সত্য, রাবণ সত্য, তাই কাঁদাকাটির এত ঘটাঘট্ট, আর ঐ ব্যক্তি দেখিতেছে নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী রাবণ সাজিয়া বসিয়া আছে—আর পীতাম্বর চক্রবর্ত্তী সীতা সাজিয়া চীৎকার করিতেছে—তোমার আমার চক্ষে যাহা রাম সীতা, উহার চক্ষে তাহাই নীলাম্বর আর পীতাম্বর—তাই উহার মুখে হাঁসি ধরে না। তুমি আমি ঘটনা দেখিয়া অধীর, আর ও ব্যক্তি ঘটনার মূল দেখিয়া ধীর; তুমি আমি উহাকে উন্মত্ত বলিয়া তিরস্কার করিতেছি, কিন্তু নিশ্চয় জানিও, ও, তোমাকে আমাকে অজ্ঞান বলিয়া ক্ষমা করিতেছে।" যাহাহউক "যাঁহারা শীতলাপূজা করেন, তাঁহারা জানেন না যে শাস্ত্রে শীতলার কিরূপ বর্ণনা আছে। সকল দেশেই দেখা যায় যে, শাস্ত্রে যেখানে মূর্ত্তির প্রশ্রয় দেয় নাই, অজ্ঞ-লোকেরা সেখানেও মূর্ত্তির আবাহন করিয়া থাকে। যীশুখৃষ্ট ঈশ্বরকে উপাসনা করিতে বলিয়াছেন, কিন্তু ইউরোপের সহস্র সহস্র লোক খৃষ্ট-কেই ঈশ্বর বলিয়া পূজা করিতেছে।

অনেকের ধারণা যে শাস্ত্রকারেরা বোধ হয় একটা দশহস্ত ও দশমস্তক-বিশিষ্ট কোন অদ্ভুতাকারের পুতুলকে শীতলা বলিয়া পূজা করিতে বলিয়াছেন। কিন্তু উহা সম্পূর্ণ ভ্রম। শীতলার মূর্ত্তি শাস্ত্রে যাহা আছে তাহা অমূর্ত্ত ধ্যানগম্য। স্কন্দ পুরাণে আছে—

" মৃণালতন্তুসদৃশীং নাভিহৃন্মধ্যসংস্থিতাং।
যস্ত্বাং বিচিন্তয়েদ্দেবীং তস্যমৃত্যুর্নজায়তে ॥ "

অর্থাৎ যে ব্যক্তি শীতলাদেবীকে নাভিপদ্ম ও হৃৎপদ্মে মৃণালতন্তুর ন্যায় সূক্ষ্ম বলিয়া ধ্যান করেন, তাহার মৃত্যুভয় থাকে না। মৃণালতন্তুর ন্যায় সূক্ষ্ম হইলে আর তাঁহার মূর্ত্তিকল্পনা কেন? ঈশ্বরের সূক্ষ্মতা ব্যক্ত করিবার জন্য, উপনিষদ্‌কার ঋষিরা যেখানে তাঁহাকে " অণোরণীয়ান্ " বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন, সেখানে তাঁহারা এরূপ অর্থে বলেন নাই যে, তিনি একটী জড় পদার্থের ক্ষুদ্রতম অণু। ঈশ্বরের অতীন্দ্রিয়ত্ব ব্যক্ত করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য। লোকেরা শাস্ত্রোপদেশের বিশুদ্ধতা না বুঝিয়া ক্রমে বিকৃত আকারে মূর্ত্তি গড়িয়া তুলে। শীতলার অর্থ,—যাহা শীতল তাহাই শীতলা। শীতল বস্তু বলিলে সর্ব্বাগ্রে জলকেই আমাদের মনে পড়ে। অম্লরসের সঙ্গে যেমন তেঁতুলের সম্বন্ধ, মিষ্টরসের সঙ্গে যেমন চিনির সম্বন্ধ; শীতলার সহিত জলেরও সেইরূপ সম্বন্ধ। শীতলাদেবী জলরূপিণী দেবী। শীতলা জলেরই নামান্তর মাত্র। কিন্তু, "মৃণাল তন্তুসদৃশীং নাভিহৃন্মধ্যসংস্থিতাং" এইরূপ সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় কিভাবে যে শীতলা বলা হইয়াছে, তাহা ঠিক বুঝা যায় না। তবে, মৃণালতন্তুর সহিত তুলনা দেওয়ায়, জলের সঙ্গে যে শীতলার কিছু সম্পর্ক আছে, তাহা বুঝা যায়। আর শীতল দ্রব্যের মধ্যে জলই প্রধান বলিয়া শীতলা নাম হওয়া সুসঙ্গত। অগ্নির যেমন উষ্ণতা, জলের তেমনি শৈত্য; বিশেষতঃ শীতলা স্ত্রীলিঙ্গে ব্যবহৃত ও স্ত্রীদেবতারূপে কল্পিত হওয়ায় শীতলা যে জলদেবী, এই কথাই সমর্থিত হইতেছে। জলের পর্য্যায়

(Synonym) অপ্ শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ বলিয়াই শীতলাকে স্ত্রীলিঙ্গ করা হইয়াছে। বৈদিক জলদৈবত মন্ত্রগুলিতে অপ্ শব্দের সহিতই দেবী ও মাতৃ শব্দের সংযোগ দেখা যায়। বৈদিক মন্ত্রসমূহে ঋষিয়া জলকে মাতা বলিয়া, দেবী বলিয়া আবাহন করিয়া গিয়াছেন। সিন্ধুদ্বীপঋষি গায়ত্রী চ্ছন্দে বলিতেছেন,—

"আপোহিষ্ঠা ময়োভুব স্তানউর্জ্জেদধাতনঃ মহেরণায় চক্ষসে।

যোবঃ শিবতমোরসঃ তস্যভাজয়তে হনঃ। উশতীরিব মাতরঃ।

তস্মাঅরং গমাম বো যস্য ক্ষয়ায় জিন্নথ আপোজনয়থাচনঃ॥"

এই মন্ত্রটীর দেবতা জল এবং গাত্রমার্জ্জনে ইহার বিনিয়োগ। ইহার অর্থ এই—"হে জল তোমরা সুখদায়িনী, তোমরা আমাদিগকে অন্ন-প্রাপ্তির এবং পরম রমণীয় ঈশ্বর দর্শনের উপযোগী কর। তোমরা শুভাকাঙ্ক্ষিণী মাতার ন্যায় আমাদিগকে তোমাদের কল্যাণতম রসের ভাগী কর। সেই রস আমাদিগকে প্রচুর পরিমাণে দাও যে রসে ব্রহ্মাদিস্তম্ব পর্য্যন্ত সমুদায় জগৎ তৃপ্তিলাভ করিতেছে এবং যাহাদ্বারা আমরাও পুত্রপৌত্রাদিসম্পন্ন হইয়া বর্দ্ধিত হইতে পারি।" এই মার্জ্জন-মন্ত্রে বৈদিক ঋষি এক বিশ্বব্যাপী জলতত্ত্বের মনন করিয়াছেন। ইহাতে সমুদ্রের জল বা নদীর জল বা কূপের জল এমন কোন বিশেষ ভাব নাই। জলের যে রসরূপ গুণে আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত জীবিত, ইহা সেই সূক্ষ্ম অথচ বিশ্বব্যাপী রসাত্মক জলের ধ্যান। সিন্ধুদ্বীপ ঋষি জলের এই সর্ব্বব্যাপকতা (আপঃ শব্দের ধাত্বর্থই ব্যাপ্তি—"আপ্ ব্যাপ্তৌ") অনুভবের সঙ্গে সঙ্গে তাহার মাতৃশক্তি অর্থাৎ পালনীশক্তিও স্পষ্ট অনুভব করিয়া বলিয়াছেন "যোবঃ শিবতমোরসস্তস্যভাজয়তে হন উশতী-রিবমাতরঃ"—যাহা তোমাদিগের কল্যাণতম রস শুভাকাঙ্ক্ষিণী মাতার ন্যায়, আমাদিগকে তাহার ভাগী কর।

শীতলাদেবী বৈদিক মন্ত্রের 'আপোদেবী'রই পৌরাণিক সংস্করণ মাত্র। পুরাণ, স্মৃতি, তন্ত্র প্রভৃতি সকলেরই মূল বেদ। "সর্ব্বং বেদাৎ প্রসিধ্যতি"। এক্ষণে দেখা যাউক দেবী শব্দে কি বুঝায়। যোগী যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—"দীব্যতে ক্রীড়তে যস্মাদুচ্যতে দ্যোততে দিবি তস্মাদ্দেব ইতি প্রোক্তঃ।" অর্থাৎ যাহা সুশোভন, যাহা মনোরম, যাহা সুব্যক্ত ও দ্যুতিমান্ তাহাই দেবতা। এই কারণে হিন্দুদের নিকট সূর্য্যও দেবতা, জলও দেবতা ইত্যাদি। যাহা সুন্দর ও সুশোভন তাহারই নাম দেবতা। একটী সুন্দর ভাবও দেবপদবাচ্য। প্রকৃতপক্ষে যদি কিছুর ধ্যানে শরীর শীতল হওয়া সম্ভব হয় ত সে এক জলেরই ধ্যানে। (পাতঞ্জল দর্শনে আছে, যোগীরা তৃষ্ণার্ত্ত হইলে জিহ্বার উপর অম্ল আছে এইরূপ ধ্যান করিবেন। ইহাতে তৃষ্ণা দূর হয়।) যেমন অম্লের ধ্যানে জিহ্বায় জল আসে, সেইরূপ জলের ধ্যানে মনে একটী শৈত্যের ভাব অনুভূত হইলে শরীরেও তাহার কার্য্য হওয়া অসম্ভব নহে এবং তাহাদ্বারা ক্রমে জ্বর ও গাত্রদাহ প্রভৃতি দূর হইতে পারে। একমনা হইয়া যাহা কিছু চিন্তা করা যায়, শীঘ্রই তাহা শরীরের উপর প্রভাব বিস্তার করে। (তৈলপায়িকা বা আশুর্ল্লা বা তেলাপোকা, কাঁচ-পোকাকে অর্থাৎ কুমরুকে পোকাকে অত্যন্ত ভয় করে। কাঁচপোকা যদি তেলাপোকাকে একবার স্পর্শ করে, তখন সে ভয়ে এত অভিভূত হইয়া যায় যে, সে মরিয়াছে কি জীবন্ত আছে বুঝা যায় না। ক্রমে ৮।১০ দিনের মধ্যে তাহার শরীরের গঠন পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় ও সে কাঁচপোকার আকার ধারণ করে। শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশ কৃত পাতঞ্জল দর্শন দেখ)। কিন্তু, জলের এই ধ্যান এক আধ ঘণ্টা করিলে ফল হয় না। পাঁচঘণ্টাকাল অবিচ্ছেদে ধ্যান করিবার ব্যবস্থা। সর্ব্বদা ধ্যান করিলে আরও ভাল হয়। স্কন্দ পুরাণে আরও আছে—"যস্ত্বাং উদকমধ্যেতু ধ্যাত্বা সংপূজয়েন্নরঃ। বিস্ফোটকভয়ং ঘোরং ক্ষিপ্রং তস্য বিনশ্যতি॥"

অর্থাৎ যে তোমাকে (শীতলাকে) উদকমধ্যে (জলমধ্যে) ধ্যান করিয়া পূজা করে, শীঘ্রই তাহার বিস্ফোটকভয় দূর হইয়া যায়। তবেই বুঝা গেল যে, শীতলার ধ্যান, জলের ধ্যান বই আর কিছুই নয়। তবে কথা এই যে, " সূর্পালঙ্কৃতমস্তকাং " প্রভৃতি কোথা হইতে আসে ? ফলতঃ গণেশের ন্যায় স্থূলকায় ব্যক্তির যেমন বাহন মূষিক বলিয়া কল্পনা, ইহাও তাহাই। মূষিক গণেশকে বহিয়া বেড়াইত না। গণেশ লেখক ছিলেন। বেদব্যাসের মহাভারতের লেখক তিনিই ছিলেন। যেখানে কাগজপত্র সেই থানেই মূষিকের আগমন। ছাগলকে অগ্নির বাহন বলে। ছাগল কি অগ্নিকে স্কন্ধে করিয়া বহিয়া বেড়ায় ? ছাগমাংস ও ছাগদুগ্ধ অত্যন্ত অগ্ন্যুদ্দীপক বলিয়াই রূপকচ্ছলে ঐরূপ বলা হইয়াছে। সেইরূপ শীতলার বাহন গাধা বলার তাৎপর্য্য এই যে, গাধার দুগ্ধ বসন্তের প্রতিষেধক এবং দেখা যায় যে, পৃথিবীস্থ যাবতীয় জন্তুর বসন্ত হইলেও গর্দ্দভের কখনই বসন্ত হয় না। এই কারণেই গাধা, শীতলার বাহন বা প্রিয় বা Pet রূপে কল্পিত। আর সন্মার্জ্জনী, কলস ও সূর্প (কুলা) স্নানের ও গৃহদ্বার পরিষ্কার রাখার উপকরণ। পৌরাণিকেরা রূপকচ্ছলে বৈদিক শীতলার এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন মাত্র।" বেদের তত্ত্বসকল বেদবিদ্ ব্রাহ্মণেরাই বুঝিতে পারিতেন। বৈদিক তত্ত্বসকল যেন আপামরসাধারণেই বুঝিতে পারে, এই জন্য পুরাণকারগণ ঐ সকল তত্ত্ব রূপকে আচ্ছাদিত করিয়া সকলের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন ও গল্পচ্ছলে উহাদের বর্ণনা করিয়াছেন মাত্র। আর, ভাবিয়া দেখিলে অজ্ঞ লোকের জন্য মূর্ত্তিকল্পনার অন্য দরকারও আছে বটে। " Spirit and form must both enter into it (the mind). It is idol-worship to substitute the form for the spirit : but it is vain philosophy which seeks to dispense with the form. " এই জন্যই হিন্দুরা পূজাদিতে মূর্ত্তির প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন।

ঋষিগণ কিরূপে সত্য নির্ণয় করিতেন ?

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম, এ, বি, এল্, মহাশয় তাঁহার প্রণীত "গীতায় ঈশ্বরবাদ" নামক পুস্তকের ভূমিকায় লিখিয়াছেন—"এদেশে বহুকাল হইতে নানা দর্শনশাস্ত্র প্রচলিত আছে। তাহাতে ধীমান্ দার্শনিকগণ বুদ্ধিদ্বারা সত্যনির্ণয় করিবার প্রয়াস করিয়াছেন। আধুনিক পণ্ডিতগণও দৃঢ়তার সহিত ঐ পথেই বিচরণ করিতেছেন। তাঁহারা কোন দিন গন্তব্যস্থলে পঁহুছিতে পারিবেন কিনা সন্দেহের বিষয়। কারণ, সত্যনির্ণয়ের পথ ইহা নহে। দার্শনিকের সম্বল তর্ক; তর্কের ফল বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, কলহ। কিন্তু তর্কের দ্বারা কখনও সত্য নির্ণয় হয় না। শ্রুতি বলিয়াছেন—"নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া।" তর্কের দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা যায় না। ভগবান্ বাদরায়ণও ব্রহ্মসূত্রে তর্কের অপ্রতিষ্ঠা খ্যাপন করিয়াছেন। উহার ভাষ্যে শ্রীশঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন, লোক বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া যে তর্ক উত্থাপন করে, সে তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই। কারণ, এক বুদ্ধিমানের অনুমোদিত তর্ক, অপর বুদ্ধিমান্ নিরাস করেন। পক্ষান্তরে, তাঁহার তর্কও তৃতীয় বুদ্ধিমান্ কর্তৃক খণ্ডিত হয়। অতএব তর্কের শেষ কোথায়? সেইজন্য শাস্ত্রকারদিগের উপদেশ এই "অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।" অর্থাৎ অচিন্ত্য-চরমতত্ত্বের বিচার স্থলে তর্কের প্রয়োগ করিও না। ঋষিদিগের অনুমোদিত সত্যনির্ণয়ের প্রণালী, দার্শনিকদিগের প্রণালী হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সে প্রণালীর ক্রম—শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন। যে সকল সত্য চরমসত্য (যাহাদিগকে হার্ব্বার্ট স্পেন্সার অজ্ঞেয়ের কোটাতে ফেলিয়াছেন) তাহারা কখনও প্রত্যক্ষ অথবা অনুমানের বিষয় হইতে পারে না। আমাদের এমন কোন ইন্দ্রিয় নাই, যাহার দ্বারা আমরা চরমসত্যকে প্রত্যক্ষ কবিতে পারি। অনুমান

প্রত্যক্ষমূলক। আমাদের সাধ্য কি যে, আমরা তর্ক ও যুক্তিদ্বারা চরম সত্যের অবধারণ করিব? অতএব, চরমসত্য নির্ণয়ের একমাত্র উপায় আপ্তবাক্য। আপ্ত অর্থে ভ্রমপ্রমাদশূন্য পুরুষ,—যিনি তত্ত্বদৃষ্টি দ্বারা চরমসত্যের সাক্ষাৎলাভ করিয়াছেন। তাঁহার উপদেশই আপ্তবাক্য। ঋষিরা আপ্ত, সেই জন্য তাঁহাদের প্রচারিত শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্র চরমসত্য নির্ণয়ের একমাত্র প্রমাণ। সেই শাস্ত্রবাক্য 'শ্রবণ' করিতে হইবে এবং সেই সকল বাক্যের পরস্পর সমন্বয় করিয়া 'মনন' করিতে হইবে; পরে তৎসম্বন্ধে একান্ত ও একাগ্রচিত্তে ধ্যান ('নিদিধ্যাসন') করিতে হইবে। তবেই সত্যের নির্ণয় হইবে। ইহাই ঋষিদিগের সত্যনির্ণয়ের প্রণালী।

"শ্রোতব্যঃ শ্রুতিবাক্যেভ্যো মন্তব্যশ্চোপপত্তিভিঃ।
মত্বাচ সততং ধ্যেয় এতে দর্শনহেতবঃ॥"

শ্রুতিবাক্য শ্রবণ করিবে। যুক্তিদ্বারা মনন করিবে। পরে সতত ধ্যান করিবে। এইরূপে সত্যের দর্শন লাভ হয়। এখানে যুক্তি অর্থে কেবল তর্ক নহে। ভগবান্ মনু বলিয়াছেন—

"আর্ষং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা।
যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ॥"

যিনি শাস্ত্রের অবিরোধী তর্কদ্বারা শাস্ত্রোপদেশ বুঝিতে চেষ্টা করেন, তিনিই সত্যনির্ণয় করিতে পারেন, অপরে পারে না।"

অন্যান্য দেশের চিকিৎসা শাস্ত্রের সঙ্গে আয়ুর্ব্বেদের তুলনা করিলে, অন্যান্য চিকিৎসাশাস্ত্রকে আধিভৌতিক ও আয়ুর্ব্বেদকে আধ্যাত্মিক শাস্ত্র বলা যায়। চিকিৎসাশাস্ত্রের বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয় সকলের মধ্যে অধিকাংশ বিষয়ই অনুভবাত্মক। ব্যবচ্ছেদ করিয়া স্থূল শরীরের সংস্থানাদির বিষয় অবগত হওয়া যায় বটে, কিন্তু অগ্নি, বায়ু ও জলাদির ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায় না। জীবিত শরীরে ইহাদের কার্য্যাদি অনুভব করিতে হয়। অথচ কার্য্যক্ষেত্রে অনুমানই চিকিৎসকের প্রধান

সম্বল। আয়ুর্ব্বেদের বীজভাগ সংক্ষিপ্তভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে বলিয়া অসার মনে করিও না। পরন্তু, জানিবার ইচ্ছা হইলে, কুতর্ক পরিহার পূর্ব্বক উপযুক্ত গুরুর আশ্রয় লইলেই তিনি তোমার সন্দেহের অপনোদন করিবেন। আর, সাকরেদ্ না হইয়া একবারেই ওস্তাদ হইতে গেলে চলিবে কেন? খ্যাতনামা ডাক্তার ৺ হেমচন্দ্র সেন এম্, ডি, মহাশয় বায়ু ও নাড়ী বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইতে গিয়া বলিয়াছেন "অনেক জড়-বুদ্ধি লোকে মনে করেন যে শরীরের মেদপোষণ করিতে মেদ (fat) আবশ্যক করে, মাংসপোষণ করিতে মাংসের প্রয়োজন হয়। কিন্তু, ইহা বোধ হয় সম্পূর্ণ ভুলসিদ্ধান্ত। জীবনীশক্তির অলৌকিক প্রভাবে ঘাস ও খড় হইতে গোজাতির সপ্তধাতুর পুষ্টি হয় এবং আমরা দুগ্ধ লাভ করি। ঘাস কিংবা খড়ে কত পরিমাণ মাংস বা বসা বা দুগ্ধ প্রস্তুত করণোপযোগী উপাদান থাকে তাহা সকলেই জ্ঞাত আছেন। ঘাস ও খড় হইতে যে শক্তি সপ্তধাতু উৎপাদন করে Chemistry কি তাহার কোন ইয়ত্তা করিতে পারে? Nervous system ঐ শক্তির টেলিগ্রাফিক যন্ত্র এবং Vascular system তাহার Commissariat Department. সেই চৈতন্যময়ী শক্তি fecundated ovum হইতে মনুষ্য ও গবাদির দেহ প্রস্তুত করে। কোথাও ঘাস ও খড় হইতে, কোথাও মাংস হইতে, কোথাও বা চর্ব্ব্য, চুষ্য, লেহ্য পেয় রাশি রাশি আহার হইতে সপ্তধাতুময় দেহ প্রস্তুত হয়। এই জীবনীশক্তির বিবিধ বিকাশকেই প্রাচীন মনীষিগণ নাড়ী কহিয়াছেন। পূর্ব্বে ডাক্তার Wise প্রভৃতি সুপণ্ডিত লেখকগণ হিন্দুদিগের আয়ুর্ব্বেদ এবং অন্যান্য শাস্ত্র পাঠ করিয়া স্পষ্টাক্ষরে তাঁহাদের বিজ্ঞানের প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। আজ কাল আমরা না প্রসব করিয়াই কানাইয়ের মা সাজিয়া যে বিষয়ের বিন্দু বিসর্গও জানিনা তাহার উপর মতামত প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হই না। আমাদের এই সংক্রামক ব্যাধি অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিতকেও আক্রমণ করিয়াছে।" (ভিষক্‌দর্পণ, জুলাই, ১৯০২ সাল।)

আয়ুর্ব্বেদ বেদেরই অংশ এবং বেদের ন্যায়ই ইহা স্বতঃসিদ্ধ। তুমি হাজার বিদ্বান্ ও অলৌকিক বুদ্ধিসম্পন্ন হইলেও শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট প্রণালীর অনুসরণ না করিয়া " যুক্তিহীন বিচারেতু ধর্ম্মহানি প্রজায়তে " প্রভৃতি লৌকিক যুক্তির দোহাই দিয়া অলৌকিক শাস্ত্রীয়তত্ত্বের কোন মীমাংসা করিতে পারিবে না। নিশ্চয় জানিও যে, ইংরেজী তালার চাবী দিয়া বাঙ্গলা তালা খুলিতে গেলে তোমাকে বিড়ম্বিত হইতে হইবে। এই জন্যই শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন যে " অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ " অর্থাৎ চরমতত্ত্বের নির্ণয় স্থলে তর্কের যোজনা করিও না। * আর, এই জন্যই সুশ্রুত বলিয়াছেন যে, " তস্মাত্তিষ্ঠেত্তু মতিমান্ আগমে নতু হেতুষু " অর্থাৎ মতিমান্ ব্যক্তি শাস্ত্রানুযায়ী হইবেন, হেতুসমূহে আস্থাবান্ হইবেন না। " তুমি আমি তর্ক করিয়া, বিচার করিয়া যাহার মীমাংসা করিতে পারি তাহার জন্য আবার শাস্ত্র কেন? শাস্ত্র তাহারই নাম, যাহা তোমার আমার অতীন্দ্রিয়, অনধিগত, অচিন্তিত ও অপ্রত্যক্ষ বিষয়ের বিধানকর্ত্তা—প্রত্যক্ষ যেখানে অন্ধ, অনুমান যেখানে পঙ্গু, সেই স্থানেই শাস্ত্রের একাধিপত্য। অগাধসমুদ্রমধ্যচারী জলজন্তু যাহা প্রত্যক্ষ করিবে " চক্ষু আছে বলিয়া " তোমার আমার তাহা প্রত্যক্ষ করিবার অধিকার নাই। সে দৃষ্টি স্বতন্ত্র। চক্ষু থাকিতেও তুমি, আমি তথায় অন্ধ। তদ্রূপ ব্রহ্মানন্দসমুদ্র-মধ্য-মগ্ন অগাধতত্ত্বদর্শী ঋষিগণ যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহা প্রত্যক্ষ করিবার অধিকার তোমার আমার নাই।" তবে এরূপ আপত্তি হইতে পারে যে, " যাহারা নিজ মনঃ প্রকৃতি পর্য্যন্ত পরমাত্মায় বিলীন করিয়া নির্ব্বিকল্প সমাধিযোগে অভিষ্ট

* চরম তত্ত্বের অর্থ ঈশ্বরতত্ত্ব সন্দেহ নাই। কিন্তু চিকিৎসা কার্য্য কেবল রক্তমাংসাশ্রিত দেহের উপর প্রবর্ত্তিত না হইয়া "পুরুষের" উপর প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে বলিয়া আয়ুর্ব্বেদতত্ত্বও চরমতত্ত্বের অন্তর্গত। (১ম অঃ, শারীর স্থান, চরক)।

দেবতার চরণ চিন্তায় নিরন্তর নিরত থাকিতেন, তাঁহারা আবার চতুর্দ্দশ ভুবনাত্মক অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের অণুপরমাণুগত বস্তুতত্ত্ব সকল দেখিবার অবসর পাইতেন কিরূপে? অদ্বৈততত্ত্বে দ্বৈতসত্তার ভান পর্য্যন্ত তিরোহিত হইয়া যায়। এ অবস্থায় আবার মুনিঋষিগণ ব্রহ্মকে ছাড়িয়া ব্রহ্মাণ্ড দেখিবার অবসর পাইতেন কিরূপে? ব্রহ্মাণ্ড না ভুলিলে ব্রহ্ম-দর্শন হয় না, আবার ব্রহ্ম না ভুলিলেও ব্রহ্মাণ্ড দর্শন হয় না। এই পরস্পরবিরুদ্ধ পদার্থ দ্বয়ের একত্র সামঞ্জস্য অসম্ভব।" ইহার উত্তর এই—কবি বলিয়াছেন, "মুক্তা হি জবয়া রক্তা ন শুভ্রা মুক্তয়া জবা।" একটী মুক্তা এবং একটী জবাপুষ্প একত্র রাখিলে, জবার রক্তিম ছটায় মুক্তা আরক্ত হয়, কিন্তু মুক্তার বিশদ প্রভায় জবা শুভ্র হয় না। কেননা, মুক্তা নির্ম্মল এবং জবা মলিন। যে পদার্থ স্বভাবতঃ স্বচ্ছ, সে পরের প্রতি-বিম্ব গ্রহণ করে। যে মলিন, সে প্রতিবিম্বিত হইতে পারে, কিন্তু প্রতি-বিম্ব গ্রহণ করিতে পারে না। যথা, দর্পণে আমরা মুখের প্রতিবিম্ব গ্রহণ করি, কিন্তু মুখে দর্পণের প্রতিবিম্ব পাই না। কেননা, দর্পণ নির্ম্মল ও মুখ মলিন। মায়ামলীমস ব্রহ্মাণ্ডেও তেমনি সকল পদার্থই মলিন—নির্ম্মল কেবল সেই মায়ার অতীত একমাত্র ব্রহ্ম। মলিন ব্রহ্মাণ্ড, নির্ম্মল ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিতে পারে না, কিন্তু নির্ম্মল ব্রহ্মে মলিন ব্রহ্মাণ্ড স্বতঃ প্রতিবিম্বিত হয়। আমরা পুষ্করিণী বা নদীর তীরে স্থলবিভাগে দৃষ্টিক্ষেপ করিলে শ্যামল ভূমি ও বনবিন্যাস বই, জলরাশি দেখিতে পাই না। আবার, তীর হইতে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া যেমন নীরে নিক্ষেপ করি, অমনি তাহার অভ্যন্তরে দেখিতে পাই, বৃক্ষের কাণ্ডপ্রকাণ্ড শাখাপল্লব, ফলপুষ্প হইতে আরম্ভ করিয়া মূল অবধি শ্যামলভূমি পর্য্যন্ত সন্নিবেশ, আবার ভূমি হইতে আরম্ভ করিয়া অনন্ততারকাস্তবকমণ্ডিত নভোমণ্ডলের সেই প্রকাণ্ড কক্ষ পর্য্যন্ত সরোবরের অভ্যন্তরে স্তরে স্তরে সুসজ্জিত রহিয়াছে; কিন্তু স্থলে যাহা ঊর্দ্ধমুখ, জলে তাহাই অধোমুখ।

আবার স্থলে যাহা অধোমুখ জলে তাহাই উৰ্দ্ধমুখ। যাঁহারা তত্ত্বসাগরে ডুবিয়াছেন, তাঁহাদেরও দৃশ্য এই—আমরা সরোবরের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিক্ষেপ না করিলেও যেমন জলের দিকে চাহিলেই আকাশের কক্ষ পর্য্যন্ত লক্ষ্য করিতে পারি,—ঋষিগণও তদ্রূপ মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের দিকে না চাহিয়া, চাহিয়াছিলেন সেই স্বচ্ছ ও প্রতিবিম্বগ্রহণক্ষম পরমব্রহ্মেরই প্রতি, দেখিয়াছিলেন তাঁহার সেই চিদ্ঘণানন্দ কলেবরে, প্রতি রোমকূপবিবরে অনন্তকোটি জগৎ জলবুদ্বুদের ন্যায়, প্রতি নিমেষে একবার উদ্ভিন্ন, একবার বিলীন হইয়া যাইতেছে—পথশ্রান্তি ভোগ করিতে হয় নাই, পরমায়ুর ক্ষয় করিতে হয় নাই, দুর্লঙ্ঘ্য ভুবনাঙ্গন উল্লঙ্ঘন করিতে হয় নাই—কারণশরীরেও যে তত্ত্ব অধিগত হইতে পারে না, সাধকগণ, সাধনভবনে, ধ্যানশয়নে, জ্ঞাননয়নেই ত্রিভুবনের সে সৌন্দর্য্যস্বপ্ন দেখিয়াছেন—সমাধিভঙ্গেও তাহা বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। তবে, বিশেষ এই যে—তুমি আমি জড় জগতের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ববেত্তা যাহা কিছু দেখি, তাহাই উন্নত, তাহাই ঊর্দ্ধমুখ—আমরা যাহা দেখি, ভাবি—ইহা অপেক্ষা উচ্চ বুঝি সংসারে আর কিছুই নাই।" * *

আয়ুর্ব্বেদই বল, জ্যোতিষই বল অথবা যোগশাস্ত্রই বল—শ্রদ্ধা ও ভক্তিসহকারে, শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট প্রণালীঅনুসারে ক্রিয়ানুষ্ঠান করিয়া না দেখিলে কি প্রকারে বুঝিবে?

ঐকান্তিক শ্রদ্ধা বা ভক্তিসহকারে যথোক্তনিয়মে ক্রিয়ানুষ্ঠান করা দূরে থাকুক, আজকাল কয়জনে, এই অর্থকৃচ্ছ্রের দিনে, পাটোয়ারীবুদ্ধি পরিহার করিয়া শাস্ত্রের মর্ম্ম বুঝিবার জন্য ব্যগ্রতার সহিত চেষ্টা করিয়া থাকেন? বুঝিবার জন্য চেষ্টা না করিলেই বা বুঝিবেন কিরূপে? "শুনিয়াছি মুরশিদাবাদের ভূতপূর্ব্ব স্বনামখ্যাত কবিরাজ গঙ্গাধর সেন একদা নাড়ী পরীক্ষা করিয়া একটি বিধবার গর্ভপাত অনুমান করিয়াছিলেন। এইরূপ আরও কত রোগ নাড়ী পরীক্ষায় অনুমিত হইতে

শুনিয়াছি, তথাপিও আমরা বায়ু, পিত্ত কফবোধক নাড়ীপরীক্ষাকে উপহাস করিয়াই উড়াইয়া দেই।" (লেখক—শ্রীযুক্ত ডাক্তার চতুরানন বন্দ্যোপাধ্যায় ভিষক্-দর্পণ) "রাজা বিক্রমাদিত্য পশুপক্ষীর ভাষা জানিতেন, এই কথা শুনিয়া আমরা হাস্য সম্বরণ করিতে পারিতাম না, কিন্তু, শরীরতত্ত্ববিদ্ জেনেট পশুপক্ষীকীটাদির ল্যারিংস (Larynx) পরীক্ষা করিয়া সম্প্রতি মাইক্রোফোণ যন্ত্রের সাহায্যে তাহাদের ভাষা বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন।" (বক্তা—শ্রীযুক্ত ডাক্তার সুন্দরী মোহন দাস, এম্, বি। ভিষক্‌দর্পণ)। বিনা অস্ত্রোপচারে এবং শুধু পাচনের বলে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অশ্মরী (পাথরি) মূত্র পথে বহির্গত হইতে দেখিয়া ইণ্ডিয়ান মিরার সম্পাদক বলেন—"We are almost lost in amazement when we consider how great was the omniscience of the great *Rishis* who discovered all these medicines, not so much by experiments, as with the aid of *Yoga*." (চিকিৎসা সম্মিলনী)। " এই সকল বিবেচনা করিয়া আমি মনে করি যে, অনেক সময়ে যাহা আমরা অসঙ্গত মনে করি, যেমন অরিষ্ট-লক্ষণ, তাহা এক জীবনে সকল প্রকার লক্ষণ দেখিতে না পাইয়াই অবিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নহে। আমি এ ঘটনা (মর্ম্মস্থানে অভিঘাত দ্বারা মৃত্যু) দেখার পূর্ব্বে কি মর্ম্মস্থান সম্বন্ধে ঋষিগণের ঐ মত বিশ্বাস করিয়াছিলাম। ডাক্তারি মতে এ সকল স্থানের কিছু বিশেষত্ব নাই। কবিরাজী চিকিৎসার নিদান অমূলক বলিয়া আমার ও অন্যান্য ডাক্তারগণের বিশ্বাস আছে, কিন্তু ,চিকিৎসার ফল দেখিয়া, সময়ে সময়ে আমরা আশ্চর্য্য হই এবং কাহাদের নিদান যে সত্য, সে বিষয়ে বিভ্রম জন্মায়। * * এ সকল দেখিয়া এ যাবৎ স্থির করিতে পারি নাই যে, কোন্ শাস্ত্রের নিদান সত্য ও বিশ্বাস্য। * * * বায়ু, পিত্ত ও কফ সম্বন্ধে (ঋষিগণ) যাহা যাহা বলিয়াছেন তাহা আমাদের চক্ষে সহসা

অত্যন্ত অযথা বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু, যখন দেখিতে পাই যে, দেহ জগৎ ও বহির্জগৎ একই উপাদানে গঠিত, তখন ইহার সৌসাদৃশ্য দেখিয়া স্তম্ভিত হই। যেমন বহির্জগতে অপ্, তেজ ও মরুৎ এই তিনের সমতা দ্বারা ইষ্টসাধন হয় ও তাহাদের বৈষম্যই অনিষ্টের কারণ, তেমনি শরীরে এই তিন পদার্থের সমতায় স্বাস্থ্য ও বৈষম্য অস্বাস্থ্য উৎপাদন করে, এ বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্র সন্দেহ নাই।" (লেখক—শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদ কুমার দত্ত, এম্, বি। চিকিৎসা-সম্মিলনী)। গান শুনিয়া অনেকের ভাব লাগিয়া থাকে। "এই সকল ব্যক্তিকে যে কোন রকমের প্রশ্ন করিলে তাহার সদুত্তর করিতে পারে। ইংরেজ লেখকগণ এইরূপ অবস্থাকে রোগবিশেষ বলিয়া বর্ণনা করেন। কিন্তু, ইহাকে রোগ না বলিয়া একরূপ সাধনা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইহাকে রোগ বলিলে যোগশাস্ত্রবিশারদ যোগি-গণকেও ব্যাধিগ্রস্ত বলিতে হয়। ইহা শুনিয়া ফিজিওলজি, কেমিষ্ট্রি-বিশারদ এম্, ডি, টাইটেলগ্রস্ত বিলাতি ফিজিসিয়ান উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে পারেন। কিন্তু, আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি যে, নরদেহের সমস্ত কার্য্যকারণঘটিত ব্যাপারনির্ণয়ে আধুনিক উন্নত চিকিৎসা-বিজ্ঞান বড় একটা অগ্রসর হইতে পারেন নাই। ভাব-লাগাকে রোগই বল আর যাই কেন বলনা, ইহা যে একটি অত্যাশ্চর্য্য অদ্ভুত শারীরিক ও মানসিক বিপর্য্যয়, তাহার আর ভুল নাই এবং ইহার প্যাথলজি ও চিকিৎসা সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত চিকিৎসকদিগের কোন কথা বলিবার অধিকার নাই। যাঁহারা মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রের (Mental Philosophyর) নিগূঢ়তমসাচ্ছন্ন তত্ত্ব-সকলের মীমাংসা করিতে সমর্থ, তাঁহারাই এই সকল ব্যাধির প্রকৃতি বুঝিতে পারিলেও পারিতে পারেন।" (লেখক—৺ পুলিন চন্দ্র সান্ন্যাল এম্, বি। ভিষক্‌দর্পণ)। হিপ্‌নটিজমের দ্বারা বিনা ঔষধে রোগী আরোগ্য হইতে দেখিয়া ডাক্তার এম্, এন্, বানার্জ্জী এম্, আর এস, বলেন—"ইহাতে বোধ হয় যে, কোন প্রাকৃতিক নিয়ম, যাহা আমরা এখনও

স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি না, এ সকল চালনা করে। ক্রমে তাহা আমাদের আয়ত্ত হইতে পারে।" (ভিষকৃদর্পণ)। প্রাচীন হিন্দু-চিকিৎসকেরা কিরূপ দক্ষ ছিলেন, তাহা বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইতে গিয়া ৺ডাক্তার হেমচন্দ্র সেন এম্, ডি, বলেন—"দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইতে হয় যে, যখন পাশ্চাত্য চিকিৎসকেরা Artery গুলিকে বায়ুপূর্ণ স্থির করিয়া ছিলেন, তাহার বহুপূর্ব্বে ভারতবর্ষে Circulation of blood (রক্ত চলাচল) সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছিল তাহা আজ পর্য্যন্তও সকলে পড়িয়া আদর করিতে পরাঙ্মুখ হইবেন না। * * * * যাঁহারা Anatomy জানেন, তাঁহারা সম্যক্ বিদিত আছেন যে, যাবতীয় শিরাই Solar Plexus এর সহিত নিবদ্ধ; অনেকে এত স্পষ্ট লেখা না বুঝিয়া, প্রাচীন ঋষিরা "faetal circulation এর সহিত adult circulation ভ্রম করিয়া ছিলেন" এইরূপ দোষারোপ করেন। * * * প্রাচীন আর্য্যঋষিরা Physiology জানিতেন কি না, এই বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে গিয়া স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, জীবনীশক্তির ক্রিয়াই হিন্দুদিগের উপাস্য দেবতা। পৃথিবীতে জীবনীশক্তির পূজা যদি কোথাও পরিলক্ষিত হয়, তাহা এই হিন্দুজাতির ভিতর। আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম অপেক্ষা Scientific ধর্ম্ম আর পাইবেন কি না সন্দেহ। * * * * ইহাতে স্পষ্টই বুঝাযায় যে হিন্দুদিগের নাড়ী ও বায়ু জীবনীশক্তি প্রকাশের অবস্থা বিশেষ। আধুনিক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ অপেক্ষা প্রাচীন ঋষিরা অনেক সূক্ষ্মদর্শী ছিলেন। আজকাল অনেকেরই ধারণা, জীবনীশক্তি, central nervous system এবং sympathetic nervous system এর ক্রিয়া মাত্র। ইহা অতি স্থূলদৃষ্টির কথা। &c. &c. &c. (ভিষকৃদর্পণ)।

চিকিৎসা-দর্শন নামক প্রসিদ্ধ ডাক্তারী পত্রিকার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ডাক্তার রজনীকান্ত মুখোপাধ্যায় বলেন—"ভারতের নিদান,

আয়ুর্ব্বেদাদি গ্রন্থ, কত দিনের, কতবর্ষ পূর্ব্বে ইহা আলোচিত ও নির্ণিত হইয়া পুস্তকাকারে আনীত হইয়া ছিল, গণনায় তাহা নির্দ্দেশ করা যায়না। কিন্তু, আশ্চর্য্যের বিষয়, নিদান বা আয়ুর্ব্বেদোক্ত শ্লোকাবলীতে যে সকল তত্ত্বের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, কত আলোচনাতেও তাহার কোন অংশ ভ্রান্ত বলিয়া কেহ সিদ্ধান্ত করিতে পারিতেছেন না। পক্ষান্তরে, যে সকল ইংরেজী শাস্ত্রগ্রন্থ প্রচলিত হইতেছে, তাহা কিরূপ, ভ্রান্ত কি অভ্রান্ত, এক শারীরবিদ্যার পরিচয়েই সকলে বুঝিতে পারিবেন। ভারতে আলোচিত ও বিবেচিত হয় নাই এমন শাস্ত্র দেখা যায় না। নিদানাদিতে শারীরবিদ্যা সম্বন্ধে যে সকল পরিচয় দেখিতে পাওয়া যায়, সে সকল মীমাংসার বিরুদ্ধে অন্যরূপ সিদ্ধান্তের অবতারণা এ যাবৎ কেহ করিতে সক্ষম নহেন বা হয়েন নাই। হিন্দুজাতির অভ্যুদয় ও পতনের সমানুপাতে হিন্দুবিজ্ঞান, হিন্দুজ্যোতিষ প্রভৃতি কঠিন শাস্ত্রসমূহ উৎকর্ষতা ও অপকর্ষতা লাভ করিয়াছে। আর, এক্ষণে বিভিন্ন অহিন্দুজাতির সংঘর্ষে সে সমস্ত এককালে লয়প্রাপ্ত হইতে বসিয়াছে। হিন্দুশাস্ত্রাদি ভ্রান্ত বলিয়া আলোচনার অভাবে যে এরূপ হইতেছে তাহা নহে, বর্ত্তমানকালে বুদ্ধিবিপর্য্যয়দোষে এবং বাহ্য-চাকচিক্যবিশিষ্ট বৈদেশিক শাস্ত্রের মোহে মুগ্ধ হইয়া, পৈত্রিক সম্পত্তি অকর্ম্মণ্য বোধে, পিতৃধনে আমরা বঞ্চিত হইতেছি। অধুনাতন সময়ে সামান্য জ্বরাদি রোগেও আমরা ডাক্তারের সাহায্যপ্রার্থী হই; তিনি যাহা ব্যবস্থা করেন, অমৃতবোধে গ্রহণ করি। আর, সেই রোগের সহজে আরোগ্যকারী অতি সামান্য গাছড়া আমাদের প্রাঙ্গনে উপস্থিত থাকিতে তাহা আমরা ব্যবহার করি না, কারণ তৎসম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ, কেহ বুঝাইতে চেষ্টা করিলেও তাহাকে মূর্খ ইত্যাদি সুমিষ্ট অভিধানে ভূষিত করিতেও ক্রটী করি না। তখন সে মূর্খ কি আমি মূর্খ, মূর্খ আমি তাহা বুঝিব কিরূপে?" (চিকিৎসা- সম্মিলনী)।

সাহিত্য-জগতে সুপরিচিত ও সুলেখক শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু, এম্, এ, মহাশয় তাঁহার প্রণীত "হিন্দুত্ব" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"হিন্দুকে অতি অসাধারণ মৌলিকতাসম্পন্ন বিরাট মনুষ্য বলাযায়। এই অসাধারণ মৌলিকতার একটী অর্থ এই যে, ধর্ম্মশাস্ত্র, দেবতত্ত্ব, দর্শন, বিজ্ঞান, সমাজ-প্রণালী কিছুরই নিমিত্ত হিন্দু কাহারও নিকট কিছুমাত্র ঋণী নয়। হিন্দুর যাহা আছে, সবই তাহাব নিজের, এতই নিজের যে অপরে আপন আপন প্রণালীর আমূলপরিবর্ত্তন না করিলে হিন্দুর কোনটীর কিছুমাত্র গ্রহণ করিতে পারে না। এতই নিজের যে, অপরের কিছুই তাহাতে থাকিতে পারে না ও থাকিবার আবশ্যকতা নাই। * * * কিন্তু একসময়ে আমাদের এত বড় মন ছিল শুধু এই গর্ব্ব করিলে আমরা হিন্দু নামের যোগ্য হইব না, বরং অধিকতর অযোগ্যই হইব। প্রাচীন বৈভবের গর্ব্ব করা মনুষ্যত্ব নয়; প্রাচীন বৈভব পুনর্লাভ করাই মনুষ্যত্ব। আমাদের প্রাচীন বৈভবের ন্যায় বৈভব জগতে আর নাই। অতএব আমাদের ন্যায় (বৈভব উদ্ধারের জন্য) বিপুল চেষ্টার প্রয়োজনীয়তা জগতে আর কাহারও নাই।"

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র আপ্তঋষিবাক্য—। কাজেই আয়ুর্ব্বেদের অর্থ বুঝিতে হইলেও আমাদিগকে "শ্রবণ", "মনন" ও "নিদিধ্যাসন"ই অবলম্বন করিতে হইবে। নতুবা আয়ুর্ব্বেদেব মর্ম্মার্থ ত অবধারণ করা যাইবেই না, অধিকন্তু, আমাদেব মত তার্কিকেব নিকট চরকের "যদিহাস্তি তদন্যত্র যন্নেহাস্তি ন তৎক্বচিৎ" এই মহা বাক্য যে সম্পূর্ণরূপে হাস্যাস্পদ হইবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি ? *

---

* এইটি চরকের শেষ শ্লোকের শেষ চরণ। সম্পূর্ণ শ্লোকটী এই—"চিকিৎসিতং বহ্নিবেশ স্বস্থাতুরহিতং প্রতি। যদিহাস্তি তদন্যত্র যন্নেহাস্তি ন তৎ ক্বচিৎ॥" এই শ্লোক-টীর অর্থ এই যে—"হে অগ্নিবেশ! সুস্থ বা রুগ্ন ব্যক্তির হিতকর চিকিৎসা সম্বন্ধে এই

যাহাহউক, এই সকল কারণে আয়ুর্ব্বেদে টিকার উল্লেখ আছে বলিয়াই আমরা টিকা লওয়ার ব্যাপারে লোকদিগকে স্বাধীনতা প্রদান করিতে বলি। তবে, ডাক্তারগণ যখন এমন নিশ্চিত বলিতে পারিবেন যে, ইংরেজীটিকা লইলে বসন্ত আর হইবে না অথবা যখন এরূপ প্রমাণ

গ্রন্থে যাহা আছে তাহা আর কোন চিকিৎসা-শাস্ত্রেও থাকিতে পারে। কিন্তু যাহা এই গ্রন্থে নাই, তাহা আর কোথাও নাই।" বাস্তবিক কথাটী শুনিলেই যেন সহসা বক্তার প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মে। কিন্তু, উহার তাৎপর্য্য অন্যরূপ। ঋষিগণ শাস্ত্রের কেবল সংক্ষিপ্ত বীজভাগের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই আয়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধীয় উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। সুশ্রুত এই বীজভাগ সম্বন্ধীয় উপদেশের বিষয়ে স্পষ্টই উল্লেখ করিয়াছেন যে—

"সমুদ্র ইব গম্ভীরং নৈবশক্যং চিকিৎসিতম্।
বক্তুং নিরবশেষেণ শ্লোকানা মযুতৈরপি॥
সহস্রৈরপি চ প্রোক্তমর্থমল্পমতির্নরঃ।
তর্কগ্রন্থার্থরহিতো নৈব গৃহ্লাত্যপণ্ডিতঃ॥
তদিদং বহুগূঢ়ার্থং চিকিৎসাবীজমীরিতম্।
কুশলেনাভিপন্নং তৎ বহুধাভিপ্ররোহতি॥
তস্মান্মতিমতা নিত্যং নানাশাস্ত্রার্থদর্শিনা।
সর্ব্ব মুহ্যমগাধার্থং শাস্ত্রমাগমবুদ্ধিনা॥"

অর্থাৎ "চিকিৎসা-শাস্ত্র সমুদ্রের ন্যায় গভীর। অযুত অযুত শ্লোকেও এই শাস্ত্রের সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা করা আমাদের অসাধ্য। আবার অল্পমতি, তর্কশক্তিরহিত, গ্রন্থার্থ-বোধহীন, অপণ্ডিত ব্যক্তিকে হাজার কথাতেও বুঝান যায় না। অতএব ইহার বীজভাগ মাত্র বলা গেল। এই বীজের অর্থ অতীব গূঢ়। শাস্ত্রকর্ষিত সুক্ষেত্রে পতিত হইলে, ইহাই বহুলভাবে প্রবৃদ্ধ হইবে। এই অগাধশাস্ত্রের অধিকাংশই উহ্য থাকিল। নানাশাস্ত্রদর্শী বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি বিশুদ্ধ শাস্ত্রীয় বুদ্ধির বলে, ইহার গভীর অর্থসমূহের উদ্ভাবন করিয়া লইবেন।" ঋষিগণের বহুশ্রমসঞ্চিত এই বীজই দৈববশে সমুদ্রের অপর পারে নীত ও রোপিত হইয়া ভূমির উর্ব্বরতার গুণে শাখাফলপুষ্পাদিসমন্বিত প্রকাণ্ড মহীরুহে পরিণত হইয়াছে। আর, ঋষিদের স্বহস্তে রোপিত হইয়াও সেই বীজই, একমাত্র মাটীর দোষে, আমাদের এই মরুভূমিতে অঙ্কুরেরও উদ্গম করিল না!!!

পাওয়া যাইবে যে, ইংরেজীটিকা সর্ব্বাংশে বাঙ্গলাটিকা হইতে ভাল এবং বহুপরীক্ষার পর যখন এদেশে উহাই সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া নিশ্চিত হইবে, তখন টিকা লইতে বাধ্য করিলে, কাহারও কোন কথা বলিবার থাকিবে না। তাই বলিয়া ৫।৭ বৎসর অন্তর আজীবন টিকা লওয়া নিতান্তই ছেলেমী ও বিরক্তিকর †

† বিলাতের কি গ্রামবাসী, কি নগরবাসী, সকলকেই টিকা লইতে বাধ্য করা হয়। ভারতবর্ষের পল্লীগ্রামে টিকা লওয়া না লওয়া লোকের ইচ্ছাধীন (কার্য্যতঃ সকলেই ইংরেজী টিকা লয়)। কিন্তু, কলিকাতা প্রভৃতি কতিপয় সহরে বিলাতী আইনের ব্যবস্থার মত ব্যবস্থা করা হইয়াছে অর্থাৎ সকলকেই টিকা লইতে বাধ্য করা হয়।

বিলাতে পূর্ব্বে শিশুর ৩ মাস বয়স হইলেই তাহাকে টিকা দেওয়া হইত। কিন্তু, অল্পবয়সে শিশুর দেহ অপরিপক্ক থাকে বলিয়া ঐ বয়সে, বসন্তের বীজ শিশুর দেহে প্রবিষ্ট করিয়া দিলে "যদিও তাহাদের মধ্যে মৃত্যু অতি কম হয়" তথাপি উহাদের ভারি যন্ত্রণা হইয়া থাকে। আর, শিশুর দেহে পৈত্রিক রোগের বীজ প্রচ্ছন্নভাবে লুক্কায়িত থাকে এবং বসন্তবীজের তীব্রপ্রভাব দ্বারা শিশুর শরীরে বিঘট্টন উপস্থিত হইয়া, ঐ লুক্কায়িত রোগ বাহিরে প্রকাশিত হইয়া পড়ে এবং কোন কোন স্থলে উহার পরিণাম শোচনীয়ও হইয়া থাকে। এই বিষয় লইয়া বিলাতবাসীরা আন্দোলন করাতে, পালিয়া-মেণ্ট হইতে টিকার আইন সংশোধিত ও পরিবর্ত্তিত হইয়া শিশুর টিকা দেওয়ার বয়স ন্যূনকল্পে ১ বৎসর হওয়া উচিত বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

বিলাতে এক সম্প্রদায়ের লোক আছে, উহারা টিকা লওয়ার সম্পূর্ণ বিরোধী। নির্দ্দিষ্ট সময়ে টিকা না দিলে, শিশুর পিতামাতাকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। কিন্তু ইহারা এত গোঁড়া যে ইহারা পুনঃ পুনঃ অর্থদণ্ড দিতেছে, তথাপি শিশুদিগকে টিকা দিতেছে না। কাজেই গভর্ণমেণ্ট অনন্যোপায় হইয়া, ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, যাহারা টিকা লওয়ার বিরোধী, তাহাদিগকে যথাসময়ে একবার মাত্র অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হইবে। ইহাতে আইনের উদ্দেশ্য কতদূর সাধিত হইতেছে তাহা সহজেই বুঝা যায়। 'টিকা লওয়ার বিরুদ্ধ-বাদীরা বলেন যে, সমাজের কোনও ব্যক্তি যদি টিকা না লয়, তবুও তাহার পূর্ব্বপুরুষেরা টিকা লইয়াছেন বলিয়া, পরবর্ত্তী পুরুষস্থানীয় সেই ব্যক্তি পূর্ব্বপুরুষের টিকার ফলভোগ করে অর্থাৎ তাহার দেহে পূর্ব্বপুরুষের টিকার প্রভাব থাকে বলিয়া বসন্ত হইতে মুক্তি পাইতে পারে।

আমরা বাঙ্গলাটিকা ও ইংরেজীটিকার সমালোচনা উপলক্ষে মুনি-ঋষির সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিয়াছি। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ আপ্ত অর্থাৎ ভ্রমপ্রমাদপরিশূন্য ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের ত্রিকালের জ্ঞান বিদ্যমান ছিল, তাঁহাদের জ্ঞান কখনও বাধা পায় নাই; ইচ্ছা-মাত্রেই এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের অণুপরমাণুগত বস্তুতত্ত্বসকল সর্ব্বদা তাঁহা-দের মানস-মুকুরে প্রতিফলিত হইত, ইত্যাদি অনেক কথাই আমরা বলিয়াছি। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, The arguments were fitted to the statement. অর্থাৎ শাস্ত্রে আপ্তঋষির উল্লেখ আছে; যে কোনরূপেই হউক শাস্ত্রের কথা রক্ষা করিতেই হইবে, কাজেই নানা প্রকার যুক্তির অবতারণা করা হইয়াছে। এই সকল যুক্তি, কবিত্বে যেরূপই হউক না কেন, কল্পনা ভিন্ন আর কিছুই নহে। কোন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বলেন (ডায়জিনিস্)—Instead of saying things to make people stare and wonder, say what will withhold them hereafter from wondering and staring. This is philosophy: to make remote things tangible, common things extensively useful, useful things extensively common and to leave the least necessary for the last." ইহার উত্তরে আমাদের বিশেষ কিছু বলিবার নাই। আমরা জানি যে, আমাদের এই সমস্ত যুক্তি, আজ কালের শিক্ষিত কাহারও কাহারও নিকট অসম্বদ্ধ প্রলাপ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। আবার, কেহ কেহ এরূপ "ভিত্ততে নচ নম্যতে" গোছেরও থাকিতে পারেন যে, তাঁহারা বুঝিয়াও বুঝিবেন না। জিগীষাপরবশ হইয়া বাক্‌জাল বিস্তার করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। কাজেই এই শেষোক্ত শ্রেণীর জন্য আমা-দের বলিবার কিছুই নাই। যে প্রকৃতই নিদ্রিত তাহাকে জাগ্রত করা কষ্টকর নহে; কিন্তু, কপট নিদ্রায় নিদ্রিত ব্যক্তির ঘুম ভাঙ্গান সহজ

ব্যাপার নহে। আর, প্রথম শ্রেণীর লোকদিগকেও হাতে কলমে বুঝাইয়া দিবার বিশেষ কোন উপায় দেখা যায় না। যাঁহার শিক্ষা ও ধারণা যেরূপ, তাহা হইতে উচ্চতর উৎকর্ষের ধারণা করা তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিকও নহে, আর, সহজও নহে। আর, কেবল যুক্তি, তর্ক ও উদাহরণাদি দ্বারাও ইহা বুঝাইবার উপায় নাই। যিনি কেবল বুদ্ধি ও যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া সকল বিষয়েরই সমাধান করিতে যাইবেন, অথচ কোন ক্রিয়ানুষ্ঠান করিবেন না, কার্য্যের ফলাফলের বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ হইলে, কে তাঁহার সেই সন্দেহের অপনোদন করিবে? আজও পৃথিবীতে এরূপ লোক আছে, যাহারা "বাষ্পীয় শকট ১ দিনের পথ ১ দণ্ডে ভ্রমণ করিতে পারে" অথবা "বিনা তারে একস্থান হইতে অন্যস্থানে সংবাদ প্রেরণ করা যাইতে পারে" এই সকল কথা শুনিলে অবাক্ হইয়া চাহিয়া থাকে। The immortal Darwin remarks—" we only see how little has been made out in comparison with what remains unexplained and unknown:" Shakespear also says—

"There are more things in heaven and earth, Horatio,
Than are dreamt of in your philosophy."

মানুষ ভ্রমপ্রমাদশূন্য জ্ঞান অর্জ্জন করিতে পারে কি না, কঠোর তপস্যা দ্বারা দেহ ও মনের উচ্চতম উৎকর্ষ সাধন করিয়া অলৌকিক জ্ঞানে জ্ঞানী হইতে পারে কিনা, কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিয়া কি প্রকারে তাহা বলা যাইতে পারে। আমরা আপ্তঋষি হইলে বরং হাতে কলমে কিছু দেখাইয়া দিতে পারিতাম। "স্বয়মসিদ্ধঃ কথং পরান্ সাধয়তি?" যে নিজে সিদ্ধিলাভ করে নাই, সে অন্যকে কি প্রকারে সিদ্ধ করিবে? যাহার প্রভায় আমাদের অজ্ঞানতিমির বিদূরীত হইবে, আমাদের সন্দেহের অপনোদন হইবে, হিন্দুকুলগৌরব ঋষিপ্রতিভারূপ সেই প্রভাকর চির-

দিনের মত অস্তাচলচূড়া অবলম্বন করিয়াছেন, তাই অসম্পূর্ণ শিক্ষিত, পণ্ডিতাভিমানী, সর্ব্ববিষয়ে বিশ্বাসহীন, জ্যেষ্ঠবৎ উপদেশপ্রদানপটু *, কর্ম্মানুষ্ঠানবিরত, ক্লীবতাপ্রাপ্ত ও অজ্ঞানতিমিরাচ্ছন্ন আমরা সামান্য প্রদীপের আলো দেখিয়াই চমৎকৃত হইতেছি। কবি যথার্থই বলিয়াছেন—

" অধি-গগনমনেকা স্তারকা দীপ্তিভাজঃ
প্রতিগৃহমপি দীপা দর্শয়ন্তি প্রভাবম্।
দিশি দিশি বিলসন্তং ক্ষুদ্রখদ্যোতপোতাঃ
সবিতরি পরিভূতে কিং ন লোকৈ র্ব্যলোকি ? "

সূর্য্যদেব অস্তগেলে তারকা সকলও তখন গগনের মস্তকে দীপ্তিপান, প্রদীপ সকলও তখন গৃহে গৃহে প্রভাব দেখাইয়া থাকেন, অধিক আর কি বলিব, ক্ষুদ্র খদ্যোতের (জোনাকি পোঁকার) ডিম্ব সকলও তখন দিগ্‌দিগন্তে বিলাস করেন। এক সূর্য্য অস্ত গেলেই লোকে তখন কত কি না দেখে। যাহাহউক, আমরা আপ্তঋষি হই আর নাই হই, আমাদের বিশ্বাস ‡ যে, মুনিঋষিগণ সমস্ত জীবন কেবল আকাশকুসুম চয়ন করিয়া বেড়ান নাই। " প্রয়োজন মনুদ্দিশ্য ন মন্দোঽপি

---

* কোন ভদ্রলোক অন্য একটী বাবুর সঙ্গে দেখা করিতে গিয়া দেখিলেন যে, বাবুর বড় ভাই বাটীর সম্মুখে বসিয়া আছেন। যথারীতি সম্ভাষণের পর সেই ভদ্রলোকটী বাবুর ভাইকে জিজ্ঞাসা করিলেন "মহাশয়। আপনারা কয় ভাই ?" বাবুর ভাই উত্তর করিলেন যে তাঁহারা সাত ভাই। ভদ্রলোকটী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন "মহাশয়! আপনাদের সাত ভাইয়ের মধ্যে কনিষ্ঠ কে ?" বাবুর ভাই উত্তর করিলেন "মহাশয়! আমাদের মধ্যেত কনিষ্ঠ কাহাকেও দেখিতে পাই না। আমরা সকলেই জ্যেষ্ঠ।" ফলতঃ আজকাল কনিষ্ঠ খুঁজিয়া পাওয়া ভার।

‡ এই "বিশ্বাস" কথাটী বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার পক্ষে সাজ্ঘাতিক বটে। কিন্তু, আয়ুর্ব্বেদ ও জ্যোতিষাদির ফলাফল প্রত্যক্ষ করিয়াই এই "বিশ্বাস" বদ্ধমূল হইয়াছে। "চিকিৎসিত জ্যোতিষতন্ত্রবাদাঃ পদে পদে প্রত্যয় মাবহন্তি।"

প্রবর্ত্ততে।" যাঁহারা অনেক বিষয়েই অসাধারণ বিদ্যা, বুদ্ধি ও ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন, অথচ তাঁহারাই আবার, যোগের অসাধারণ ফলের কথা বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন—আমরা তাঁহাদের বিদ্যাবুদ্ধির প্রশংসা করিব, তাঁহাদের লিখিত গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া তাঁহারা যে অসাধারণ জ্ঞানী ছিলেন তাহা উপলব্ধি করিতে পারিব, অথচ আমরা ধারণা করিতে পারি না বলিয়াই তাঁহাদের বর্ণিত যোগাদির অলৌকিক ফলের বিষয়ে সন্দিহান্ হইব, ইহা নিতান্তই অসঙ্গত। যাহারা আহাম্মক বা অজ্ঞান, সকল স্থলেই তাহাদের অজ্ঞানতার পরিচয় পাওয়া যায়। যে চরক চিকিৎসাশাস্ত্রে প্রত্যক্ষ, অনুমান ও যুক্তি প্রমাণস্বরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, তিনিই আবার, "আপ্তবাক্য"ও প্রমাণস্বরূপে স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই। ফলতঃ আমরা যে স্তরে বর্ত্তমান রহিয়াছি, কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা উহা হইতে একটু উচ্চস্তরে আরোহণ না করিলেই বা আপাততঃ অসম্ভব বলিয়া প্রতীয়মান বিষয়গুলি কি প্রকারে পরিষ্কার-রূপে ধারণা করিতে পারিব? "Infinite toil would not enable you to sweep away a mist, but by ascending a little, you may often look over it altogether." "আপ্তঋষি" কথাটা যে আকাশ-কুসুম নহে, মানবের ঐরূপ উচ্চতম উৎকর্ষ লাভ করা যে নিতান্ত অসম্ভব নহে তাহা কথঞ্চিৎ ধারণা করাইবার জন্য আমরা শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য মহাশয়কৃত-পাতঞ্জল দর্শনের ভূমিকা হইতে নিম্নলিখিত স্থল উদ্ধৃত করিলাম।

"যোগের সুফল ও অলৌকিক ক্ষমতা আছে শুনিয়া অনেকে হয় ত হাসিবেন। অনেকেই হয় ত বুদ্ধিমোহবশতঃ যোগের অলৌকিক ক্ষমতায় বিশ্বাস করিতে পারিবেন না। না পারেন, না পারুন, তজ্জন্য আমরা দুঃখিত বা ঈর্ষান্বিত নহি। আমরা জানি যে, বাক্যের দ্বারা ইহার সাফল্য প্রমাণ করা যায় না। উৎকট শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে

যথোক্ত নিয়মে অনুষ্ঠান করিয়া না দেখিলে ইহার ফলাফল সম্বন্ধে সত্য মিথ্যা কিছুই বলা যায় না। যদি বল, যুক্তিদ্বারা, তর্কদ্বারা, বিজ্ঞানের দ্বারা জানিব। আমরা বলি তাহা ভ্রম। যুক্তি, তর্ক, বিজ্ঞান, রসায়ন—এ সকল লৌকিক বুদ্ধিপ্রসূত। সুতরাং তাহারা লৌকিক জগতেই সঞ্চরণ করে। যে কখনও অলৌকিক দৃশ্য দেখে নাই, কি প্রকারে সে অলৌকিক অস্তিত্বে বিশ্বাস করিবে? আমরা কি যুক্তিদ্বারা সকলই নির্দ্ধারণ করিতে পারি? রাত্রিকালে গুব্‌রেপোকা নামক পতঙ্গ আসিয়া প্রদীপ নির্ব্বাপিত করিবার উপক্রম করিলে, যিনি যিনি সেই গৃহে থাকিবেন, তাঁহারা সকলেই সজোরে আপন আপন হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিবেন। ২।৩ মিনিট পরেই দেখিবেন, সেই পতঙ্গের উড়িবার শক্তি স্তম্ভিত হইয়াছে এবং সে ঢপ্ করিয়া পড়িয়া গিয়াছে। যদি কখন তৃণময় স্থানে বসিবার আবশ্যক হয় এবং সে স্থানে যদি অনেক ছিনে জোঁক থাকে, তবে সজোরে বৃদ্ধাঙ্গুলির অগ্রভাগদ্বারা তর্জ্জনী অথবা কনিষ্ঠাঙ্গুলির অগ্রভাগ টিপিয়া রাখিবেন। দেখিবেন জলোকাসকল নিকটে আসিয়াই স্তম্ভিত হইয়াছে। জগতের অনেক কারণ অদ্যাপি অজ্ঞাত আছে।

যোগীরা সর্ব্বজ্ঞ হন, দীর্ঘজীবী হন, অনাহারে জীবন ধারণ করিতে পারেন, শ্বাসরোধেও তাঁহাদের জীবন রক্ষা হয়—এ সকল কথা নিতান্ত অবিশ্বাস্য নহে। জীবজগতে এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত আছে যাহা দেখিয়া যোগীদের উল্লিখিত সামর্থ্য থাকার প্রতি অন্ততঃ আংশিক বিশ্বাস উৎপাদন করা যাইতে পারে। ঋষিগণ সমস্তই প্রকৃতিগুরুর নিকট শিখিয়াছিলেন। অলসস্বভাব এবং স্থূলবুদ্ধির লোকই বেদ, কোরাণ, কমট ও মীল পড়ে। কিন্তু যাহারা নিরলস, অধ্যবসায়ী ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি তাঁহারা কোন মানুষের পুস্তক পড়ে না।

মানুষ যে সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারে, এই জ্ঞান তাঁহারা (যোগীরা) প্রথমে সূর্য্যকান্তমণির নিকট পাইয়াছিলেন। যথা,—

যথাঽর্করশ্মিসংযোগাদর্ককান্তোহুতাশনম্।
আবিঃকরোতি তূলেষু দৃষ্টান্তঃ স তু যোগিনঃ ॥"

সূর্য্যকান্তমণি (আতস্ পাথর) সূর্য্যরশ্মিসংযোগে বহ্নি আবিষ্কার করে, ইহা দেখিয়া যোগিগণ সার্ব্বজ্ঞ্য শিক্ষা করিয়াছিলেন। আতস্ পাথরের দ্বারা সূর্য্যকিরণ কেন্দ্রীভূত বা পুঞ্জীকৃত করিয়া তদ্দ্বারা সূক্ষ্ম-বিজ্ঞান, ব্যবহিত-বিজ্ঞান আবিষ্কার করা কি অত্যধিক ক্ষমতার বিষয় নহে? বিস্তৃত, তরল বা বিরলাবয়ব সূর্য্যকিরণ—যাহাকে আমরা প্রভা বা আলোক বলি—সে কাহাকেও দগ্ধ করেনা। প্রত্যুত তাহাতে উত্তাপ নাই বলিয়াই প্রতীতি হয়। কিন্তু, কৌশলক্রমে বা উপায়বলে, সেই তরলায়িত আলোকরাশিকে যদি কেন্দ্রীকৃত করা যায়, ঘন বা পুঞ্জীকৃত করা যায়, তাহা হইলে দেখিবে যে সেই সূর্য্যালোক সমূহের পুঞ্জনস্থানে অর্থাৎ কেন্দ্রভবনে (Focusএ) প্রলয়াগ্নির ন্যায় দাহিকা-শক্তি আবির্ভূত হইয়াছে। উহা পোড়ে কেন? না, ইতস্ততোবিক্ষিপ্ত সহস্রমুখ বিরলাবয়ব সূর্য্যকিরণ আতস্পাথরের শক্তিতে এককেন্দ্রক হওয়ায়, তাহার কেন্দ্রস্থানটী অগ্নিরূপে পরিণত হয়; সুতরাং কেন্দ্র-স্থানটী দাহ্য বস্তমাত্রকেই দগ্ধ করে। তেমনি, ইন্দ্রিয়পথে বহির্গত, ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে বিক্ষিপ্ত ও বহুস্থানে ব্যাপ্ত বুদ্ধিবৃত্তিকে যদি প্রযত্নের দ্বারা, পথরোধের দ্বারা, একত্রিত করা যায়, তাহা হইলে সেই পুঞ্জীকৃত বা কেন্দ্রীকৃত বুদ্ধিতত্ত্বের অগ্রস্থিত যে কোন বস্তু—সমস্তই তাহার বিষয় বা প্রকাশ্য হইবে। যে সকল বিষয় আমরা সহজে বুঝিতে পারি না, সে সকল বিষয় বুদ্ধিগম্য করিবার জন্য আমরা একাগ্রচিত্ত বা তন্মনা হই। বহুক্ষণ একাগ্র হইয়া চিন্তা করিলেই তাহা আমরা বুঝিতে পারি। কেন পারি? দিগন্তপ্রসারিণী বুদ্ধিবৃত্তি তখন একাগ্রতাদ্বারা, প্রযত্নবিশেষের দ্বারা, পুঞ্জীকৃত হয়। পুঞ্জীকৃত হইলে তাহার ক্ষমতার বৃদ্ধি হয়, তাই আমরা বুঝিতে পারি। যেমন স্বল্প বিষয় জানিবার জন্য স্বল্প একাগ্রতা

অবলম্বন করি, যোগীরা তেমনি, বস্তুর ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান অবস্থা জানিবার জন্য সমস্ত মনোবৃত্তি রুদ্ধ করতঃ একমাত্র জ্ঞাতব্যবিষয়িণী বৃত্তিকে প্রবাহিতা করেন। অন্যান্য মনোবৃত্তি রুদ্ধ হইলে, বুদ্ধিতত্বটী পুঞ্জীকৃত হইলে, তাহার অন্যান্য মুখ বন্ধ হইয়া গিয়া একটী মাত্র মুখ প্রবল হইলে, কোন বস্তুই তাহার অগোচর থাকে না।

অনেক মানব কিছুমাত্র প্রকৃতিতত্ব জানে না—অথচ তাহারা এরূপ অনেক কার্য্য করে—যাহার সঙ্গে যোগের কোন কোন অঙ্গের বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য আছে। ভানুমতীর বাজীকে আমরা সমাধির অনুকরণও বলিতে পারি। কেননা, সেই কার্য্য করিবার পূর্ব্বে তাহাকে কুম্ভক করিতে হয় ও তদ্দারা আপনার বাহ্যচৈতন্য বিলুপ্ত করিতে হয়। শরীরের মধ্যে বায়ুপুঞ্জ আবদ্ধ থাকাতে তাহার শরীর যখন নিতান্ত লঘু হইয়া পড়ে, তখন সে একগাছী যষ্টিমাত্র অবলম্বন করিয়া শূন্যোপরি যোগাসনে উপবিষ্ট থাকিতে পারে। ক্রমে তাহার অবলম্বিত যষ্টিগাছিকে ধীরে ধীরে সরাইয়া লইলেও, সে, সাগরবক্ষে ভাসমান তরণির ও তূলারাশির ন্যায় শূন্যোপরি বায়ুসমুদ্রে ভাসিতে পারে। এই কার্য্যে পটুতালাভ করিতে হইলে, শৈশব কালেই উহার শিক্ষারম্ভ করিতে হয়। বয়স অধিক হইলে এই কার্য্য অতি দুষ্কর হইয়া দাঁড়ায়।

যোগীরা আরও এক অদ্ভুত কথা বলিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, প্রত্যেক মনুষ্যের দৃশ্যমান ভৌতিক চক্ষুছাড়া অন্য একটী তৃতীয় চক্ষু আছে। যাবৎ না সেই তৃতীয় চক্ষু প্রস্ফুটিত হয়, তাবৎ তাহা থাকা না থাকা তুল্য। যোগীরা যোগানুষ্ঠান দ্বারা তাহাকে উন্মীলিত করিবার চেষ্টা করেন। দৃশ্যচক্ষু দ্বারা কেবল কতকগুলি স্থূল বাহ্যবস্তু মাত্র দেখা যায়, সূক্ষ্ম বা কোন আভ্যন্তরীণ বস্তু দেখা যায় না। কিন্তু প্রজ্ঞানময় তৃতীয় চক্ষুদ্বারা সূক্ষ্ম, ব্যবহিত, বিপ্রকৃষ্ট ও আভ্যন্তরীণ, সমস্ত বস্তুই দেখা যায়, জ্ঞাত হওয়া যায়। সেই তৃতীয় চক্ষুর অন্য নাম্ দিব্যচক্ষু,

আর্য্যবিজ্ঞান, জ্ঞানচক্ষু ইত্যাদি। সেই জ্ঞানময় তৃতীয় চক্ষুর গোলোক (আশ্রয়) ভ্রূসন্ধির উপরিস্থ ললাট ভাগের অভ্যন্তর। ললাটাভ্যন্তরে তদ্বিধ তৃতীয় চক্ষু আছে, ইহা জানাইবার জন্যই আমাদের পরমযোগী সদাশিব ত্রিনেত্র এবং শিবানীও ত্রিনেত্রা। যোগী হইলেই তৃতীয়-চক্ষু উন্মীলিত হইবে, নচেৎ হইবে না, ইহা জানাইবার জন্যই আমরা মহাযোগী শিবের ললাটে অন্য একটী জ্যোতির্ম্ময় চক্ষু অঙ্কিত করি। *

* * * * *

---

* আরওত অনেক দেবতা আছেন--৩৩ কোটি দেবতাই ত রহিয়াছেন। কিন্তু, মহাযোগী বা যোগিনী ভিন্ন আর কাহারও তৃতীয় চক্ষু অঙ্কিত করিতে শাস্ত্রে ব্যবস্থা করেন নাই কেন, ইহা কি ভাবিবার বিষয় নহে ?

এই "তৃতীয় চক্ষু" সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ ডাক্তার ওয়াল্‌ফোর্ডবডিও তাঁহার প্রণীত "দি বডি বুক্" নামক হিপ্‌নটিজমের গ্রন্থে নিম্নলিখিতরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন--Walford Bodie F. R. M. S., M. R. S. A., etc. (Fellow of the Royal Meteorological Society ; Member of the Royal Society of Arts ; Freeman of the City of London ; Fellow of the Royal Colonial Institute ; M. D. and C. M. Barrett College ; Ph. D. and D. Sc, Chicago College of Medicine and Surgery.) remarks—"The Clairvoyant state is especially interesting. Just as some people have the faculty of going straight into catalepsy when hypnotised, others go one better even in the waking state and reach the clairvoyant condition in a flash of consciousness so sudden, that what they see and hear seems part of their waking consciousness. These people are called seers, or are said to possess second-sight. Many dreams that come true are not the result of mere coincidence, but of excursions into the sphere of the higher mind or the clairvoyant state. The deep glimpses of hidden truths that come to poets and men of genius, the beauties of melody and har-

যোগীরা বলেন, আমরা যখন তৃতীয় চক্ষু উন্মীলিত করিবার ইচ্ছা করি, কোন ইন্দ্রিয়াতীত বস্তু জানিতে ইচ্ছা করি, তখন আমরা প্রথমতঃ ইচ্ছাশক্তির দ্বারা ইন্দ্রিয়দ্বার রুদ্ধ করতঃ সমুদায় দিদৃক্ষাবৃত্তি পুঞ্জীকৃত করিয়া ললাটাভ্যন্তরস্থ চিত্তের উপর অর্পণ করি। তদ্বলে চিত্ত একতান হয় এবং ভৌতিক চক্ষুর সমুদায় শক্তি সেই একাগ্রীকৃত চিত্তে গিয়া আবিষ্ট হয়। আমরা তখন প্রবল ইচ্ছাশক্তির দ্বারা ভৌতিক চক্ষুর ও অন্যান্য ভৌতিক ইন্দ্রিয়ের শক্তিসমূহ আকর্ষণ করিয়া তৎসমুদয়কে পুঞ্জীকৃত, কেন্দ্রীকৃত বা একমুখ করিয়া তাহা চিত্তের উপর প্রয়োগ করি। এই কার্য্য করিবামাত্র আমাদের চিত্তস্থান (ললাটাভ্যন্তর) যেন দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে অর্থাৎ তথায় একপ্রকার আশ্চর্য্য আলোক প্রাদুর্ভূত হয়। সেই আলোকে আমরা পূর্ব্বসঙ্কল্পিত বস্তু অবাধে দেখিতে পাই। পৃথিবীর প্রান্তস্থিত বস্তু দেখিবার ইচ্ছা হইলে আমাদের সেই প্রান্তস্থানে যাইবার দরকার হয় না। তাহা আমরা ললাট মধ্যেই দেখিতে পাই। ঈপ্সিত বস্তু দেখিবার জন্য আমাদের কোন ভৌতিক আলোকের প্রয়োজন হয় না। সেই জ্যোতির্ম্ময় তৃতীয় চক্ষুদ্বারা আমরা ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, সূক্ষ্ম, ব্যবহিত (যাহার মধ্যে ব্যবধান আছে) বিপ্রকৃষ্ট (বহুদূরস্থ), সমস্ত বস্তুই দেখিতে পাই।"

---

mony that are revealed *to* the musician, the insight of the idealist and the prophet—all these are, ***without doubt***, derived from the state of consciousness in which the "third eye" is opened. ***That there is such a "third eye" is indisputable***, for, when a subject (man under hypnotic spell) with both his natural eyes closed, reads a sealed letter or tells accurately what is going on miles away, what is it that sees ? Not the two physical eyes. &c. &c. &c."

যোগিগণ যে বস্তুতত্ত্ব নির্ণয়ের জন্যই যোগ অবলম্বন করিতেন, তাহা নহে। ব্রহ্মপ্রাপ্তির জন্য যোগসাধন সময়ে ঐ সকল স্বতঃই আসিয়া উপস্থিত হইত। যোগবলে অর্থাৎ চিত্তসংযোগদ্বারা, তদ্গতচিত্তে ধ্যানদ্বারা, দীর্ঘকাল ঈশ্বর সহবাস করিলে ঐশ্বরিক গুণাবলীও লোকের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হয়। "বস্তুতঃ কোন এক বস্তু অন্য বস্তুর সহিত দীর্ঘকাল সংযুক্ত থাকিলে তাহার গুণগুলি একে একে তদ্বস্তুতে সংক্রমিত হয়। পৃথক্ থাকিলে হয় না।" এইরূপ অবস্থায় প্রকৃতি আপনিই বশীভূতা হয়েন। প্রকৃতি বশীভূতা হইলে বস্তুতত্ত্বের কবাট আপনিই উদ্ঘাটিত হইয়া পড়ে। তবে কি, তুমি আমি যে সে লোক, যে সে অবস্থায় ও যে সে স্থানে ধ্যান করিতে বসিয়া গেলেই যোগী হইতে পারিব? না, তাহা নহে। প্রত্যেক বিষয়েরই জ্ঞান অর্জ্জন করিতে হইলে ক্রমে ক্রমে সোপানাবলী আরোহণ করিতে হয়। "গাছে না উঠিয়াই এক কাঁদি" ইহা কখনও হয় না। X. La. Motte. Sage, A. M, Ph. D., L. L. D. while giving a lesson on Hypnotism, says—"Study each test in the order given. You should thoroughly master the first test before beginning the second, and you should thoroughly master the second test before beginning the third &c. Unless you learn these instructions as you go we can not be responsible for your success. * * * * Without a thorough knowledge of the fundamental principles of any science, higher instruction is useless." যোগ সম্বন্ধেও এইরূপ উপদেশই আছে। "যোগ একটী বৃক্ষ। যম নিয়মাদি অনুষ্ঠানদ্বারা তাহার উৎপাদক বীজ জন্মে। অনন্তর তাহা আসন প্রাণায়ামাদি কার্য্যের দ্বারা অঙ্কুরিত হয়। ক্রমে প্রত্যাহারাদি কার্য্যের দ্বারা

তাহা পুষ্পিত হয়। পশ্চাৎ ধ্যান, ধারণা ও সমাধি দ্বারা তাহা ফলবান্ হয়। আগে বীজ, পরে অঙ্কুর, পরে বৃক্ষ, তৎপরে ফুল, তৎপরে ফল। একবারে ফল হয় না, ইহা সর্ব্বজনবিদিত নিয়ম।"

মন্তব্যের উপসংহার।
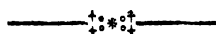
আমাদের এই সমালোচনা পাঠ করিয়া কেহ যেন এরূপ মনে না করেন যে, আমরা যুক্তির বা স্বাধীন চিন্তার বিরোধী। জ্ঞানরূপা নির্ঝরিণী সীমাবদ্ধ হইলেই শৈবালাদির উৎপাদন করিয়া স্বীয় নির্ম্মল ও স্বচ্ছ সলিল-রাশিকে মলিন ও কলুষিত করিয়া থাকে। তখন সেই দূষিত জল, মানুষের কথা দূরে থাকুক, পশু পক্ষীরও অপেয়, অব্যবহার্য্য ও পীড়াদায়ক হয়। কিন্তু, যদি নির্ঝরিণীর গতিরুদ্ধ না হয়, তবে, সুস্থানই হউক, আর, কুস্থানই হউক, যে কোন স্থান দিয়াই প্রবাহিত হউক না কেন, পরিণামে সে অনন্ত জ্ঞান-সমুদ্রে পতিত হইতে পারে। তখন তাহার সেই জলই মনুষ্যপশুপক্ষ্যাদি জীবজন্তুর প্রাণধারণের পক্ষে প্রধানতম সহায় হয়। শাস্ত্রবিচারে গর্ব্বিতবুদ্ধিও যেমন দূষণীয়, অজ্ঞানান্ধতার বাড়াবাড়িও তদ্রূপ অনিষ্টকর। তোমার যুক্তির বিরোধী হইলে তুমি শাস্ত্রীয় উপদেশ অবিশ্বাস করিতে পার, কিন্তু, তোমার যুক্তিকে অভ্রান্ত মনে করিয়া এবং তুমি ধারণা করিতে পার না বলিয়াই শাস্ত্রীয় উপদেশ উড়াইয়া দেওয়া তোমার কর্ত্তব্য নহে। তোমার আমার বুঝা উচিত যে, তোমার আমারই উপকারের জন্য, চিরব্রহ্মচর্য্যেরত, নিষ্কামব্রতধারী, অগাধতত্ত্বদর্শী ও যোগবলে বলীয়ান্ মহর্ষিগণ, সহস্র সহস্র বর্ষের নিভৃত চিন্তার পর যাহা স্থির করিয়া গিয়াছেন, তাহা কি ব্রহ্মচর্য্যহীন, স্বার্থসাধনতৎপর, একদেশ-দর্শী তোমার আমার দুই চারি দিনের চিন্তানিঃসৃত মীমাংসা অপেক্ষা

নিকৃষ্টতর? ঋষিকৃত নিশ্চয় সকল অন্তঃসারশূন্য কি সারগর্ভ তাহা সকলেরই পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। আমাদিগের বিশ্বাস, জড়তত্ত্বের অনুশীলনে কথঞ্চিৎ জড়তাপ্রাপ্ত আমরা, দূর হইতে মুনিঋষি বা শাস্ত্রাদির সম্বন্ধে যেরূপ বা যত বিরুদ্ধ মতই পোষণ করি না কেন, যখন আলোচনাদ্বারা জড়জগতের বাহ্য এবং আভ্যন্তর বিষয়াদির সম্যক্ বিবরণ আমরা জ্ঞাত হইতে পারিব, যখন গভীর গবেষণা দ্বারা আমরা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানাদির পরস্পর তুলনা করিয়া উভয়ের মর্ম্মোদ্ভেদ করিতে সক্ষম হইব—যখন আমাদিগের দৃষ্টি উভয় শাস্ত্রের কেবল চর্ম্ম, মাংস ও অস্থিতে নিবদ্ধ না থাকিয়া, প্রসারিত হইয়া উহাদের মজ্জাতে আকৃষ্ট হইবে, উভয় শাস্ত্রের অন্তস্তল ভেদ করিতে সমর্থ হইবে, তখনই আমরা আমাদের শাস্ত্রের প্রকৃত গুরুত্ব, ঋষিপ্রতিভার প্রকৃত গাম্ভীর্য্য ও বিশেষত্ব এবং শাস্ত্রীয় তত্ত্বের প্রকৃত মাহাত্ম্য ও অলৌকিকত্ব উপলব্ধি করিয়া সমস্বরে বলিতে থাকিব যে,—

" কিসের গয়া, কিসের কাশী, কিসের বৃন্দাবন ?
ঘরে এসে দেখি আমি, মা বড় ধন ॥ "

পরিশিষ্ট।

পাচনাদির প্রস্তুতির বিষয়।

পাচনের অন্য নাম ক্বাথ বা কষায়। ইংরেজীতে ইহাকে ডিককৃসন (Decoction) বলে। যে সকল দ্রব্য (বকাল বা পদ) দ্বারাই কেন পাচন তৈয়ার করা যাউক না, বিশেষ বিধির উল্লেখ না থাকিলে, উহাদিগকে সমভাগে লইয়া, মোটের উপর ২ তোলা লইতে হইবে। যেমন দুইটী দ্রব্যের দ্বারা পাচন তৈয়ার করিতে হইলে, প্রত্যেক দ্রব্য ১ তোলা লইতে হয়। তিনটী দ্বারা পাচন তৈয়ার করিতে হইলে, প্রত্যেক দ্রব্য ॥৵১০ আনা করিয়া লইতে হয়; ৪টী দ্রব্য দ্বারা পাচন তৈয়ার করিতে হইলে প্রত্যেক দ্রব্য ॥০ আধতোলা করিয়া লইতে হয়। কেবল ১টী দ্বারা পাচন তৈয়ার করিতে হইলে ঐ দ্রব্যটীই ২ তোলা ওজনে লইতে হয় ইত্যাদি। এই ২ তোলা জিনিষ ⁄॥০ আধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া, আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইতে হয়। কবিরাজীতে ৬৪ তোলায় সের ধরা হয়। সুতরাং আধসের জল অর্থাৎ ৩২ তোলা জল, আর, আধপোয়া জল অর্থাৎ ৮ তোলা জল বুঝিবে। পাচনের দ্রব্যগুলি যেন ঘুণেধরা বা পচা না হয়, যেন সতেজ থাকে। পাচনের দ্রব্যগুলি পূর্ব্বে সংগ্রহ করিয়া পরে ওজন করিয়া লইবে। পাচনের দোকান হইতে পাচন লইলে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবে যেন, পাচনওয়ালা, আন্দাজে ওজন করিয়া বা এক দ্রব্যের স্থলে, অন্য দ্রব্য না দেয়। অনেক দ্রব্য একসঙ্গে একস্থানে থাকাতে এক দ্রব্যের সঙ্গে অন্য দ্রব্য মিশিয়া থাকিতে পারে অথবা ভাল দ্রব্যের সঙ্গে কোন পচা

বা বিষাক্ত দ্রব্যও থাকা অসম্ভব নয়। ঐরূপ হইলে নিতান্ত বিভ্রাট হইবারই কথা। মোট, পাচনের দ্রব্য, দোকান হইতে ভিন্ন২ ভাবে (অর্থাৎ পাচনের বাঁধা পুটলী না লইয়া) লইয়া বাড়ীতে নিজেরা ওজন করিয়া লইলেই উত্তম হয়। নিজেরা পাচনের দ্রব্য সংগ্রহ করিতে পারিলে ত অতি উত্তম হয়। যাহাহউক, পাচনের দ্রব্যগুলি ওজন করা হইলে, জলে ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া অল্প কুট্টিত (কুটিয়া বা থেতো করিয়া) করিয়া লইবে। পরে জলসহ জ্বাল দিতে হয়। পাচন মেটে হাড়িতে ও কাঠের জ্বালে প্রস্তুত করা উচিত। পাচন তৈয়ার করিবার সময় হাঁড়ির মুখে আল্‌গা ভাবে একখানা সরা চাপা দিবে। আধপোয়া জল পূর্ব্বে হাঁড়ির ভিতর দিয়া, পরে বকালগুলিও হাঁড়ির ভিতর দিবে। পরে দেখিবে যে হাঁড়ির তলদেশ হইতে কতদূর পর্য্যন্ত উপরে জল উঠিয়াছে এবং তৎপর বাকী জল দ্বারা আধসের পূরাইবে। আগের দিন সন্ধ্যাকালে, বকালগুলি আধসের জলে ভিজাইয়া, পরের দিন প্রাতে উক্ত ভিজা বকালগুলি থেতো করিয়া ঐ আধসের জলসহ জ্বাল দিলে ভাল হয়। পাচন মৃদু মৃদু জ্বালে তৈয়ার করিতে হয়। বকালগুলির মধ্যে হরিতকী প্রভৃতির আঁটি বাদ দিয়া ওজন করিতে হয়। শূন্যোদরে (খালি পেটে) পাচন খাওয়ার নিয়ম। আহারের ঠিক পূর্ব্বে বা পরে, অথবা জল পানের পর পাচন খাইবে না। এই জন্যই সাধারণতঃ প্রাতে ১ বার ও সন্ধ্যার সময় ১ বার পাচন খাওয়ার নিয়ম চলিত আছে। তবে বিশেষ উল্লেখ থাকিলে, অন্য রকম করিবে।

পুস্তকোল্লিখিত পাচনের জায়।

—:*:—

১। নিম্বাদি পাচন—নিমগাছের ছাল, ক্ষেতপাপড়া, আকনাদি, পল্‌তা, হরিতকী, কট্‌কী, বাকসছাল, দুরালভা, আমলকী, বেণার মূল, রক্তচন্দন ও শ্বেতচন্দন। তৈয়ার হইলে ঠাণ্ডা করিয়া কাশীর

চিনি (এথ-চিনি) ॥৹ আধতোলাসহ মিশাইয়া সেবন করিবে। ইহা দ্বারা জ্বরযুক্ত ত্রিদোষ মসূরিকা ও বিস্ফোটকাদি নষ্ট হয় এবং মসূরিকা বসিয়া গেলে (লাট থাইলে) তাহা পুনর্ব্বার বাহিরে প্রকাশ পায়। গর্ভিনীকে দিতে হইলে, এই পাচন হইতে হরিতকী ও কট্‌কী বাদ দিয়া, বাকী দ্রব্যগুলি সমভাগে মোটের উপর ২ তোলা লইবে।

২। পঞ্চবল্কল-চূর্ণ—বটের নামনা (বটের ঝুড়ি) অশ্বথছাল, পাকুড়ছাল, যজ্ঞডুমুর গাছের ছাল, অম্লবেতস (অভাবে বেতের মূল বা যষ্টিমধু) প্রত্যেক দ্রব্য বেশ করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া চূর্ণ করিয়া, পরিষ্কার পুরু কাপড়ে ছাঁকিয়া, সমান ভাগে ওজন করিয়া লইয়া মিশাইয়া লইবে।

৩। বিল্বাদি পাচন—বেলশুঁঠ, গুলঞ্চ, মুথা, কুড়চিছাল, আতইচ্। ইহা পানে আমাতিসার, রক্তাতিসার ও তদানুষঙ্গিক বেদনা নষ্ট হয়।

৪। পটোলাদি পাচন—পল্‌তা, গুলঞ্চ, মুথা, বাকসছাল, ধনে, দুরালভা, চিরতা, নিমছাল, কট্‌কী, ক্ষেতপাপড়া। ইহা পানে অপক্ক বসন্ত প্রশমিত ও পক্কবসন্ত বিশুষ্ক হয়। ইহা বিস্ফোটকজন্য জ্বরের মহৌষধ।

৫। খদিরাষ্টক পাচন—খদিরকাষ্ঠ (খএর কাঠ), হরিতকী, আমলকী, বহেড়া, নিমছাল, গুলঞ্চ, বাসক ছাল, পল্‌তা,। ইহা পানে রোমান্তিকা (হাম), মসূরিকা, কুষ্ঠ, বিসর্প, বিস্ফোটক ও কণ্ডু (চুলকণা) দূর হয়।

৬। অমৃতাদি—গুলঞ্চ, বাসকছাল, পল্‌তা, মুথা, ছাতিমছাল, খদিরকাষ্ঠ, কৃষ্ণবেত, নিমপাতা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা। ইহা সেবনে নানাপ্রকার বিষদুষ্টি, বিসর্প, কুষ্ঠ, বিস্ফোটক, কণ্ডু, মসূরী, শীতপিত্ত ও জ্বর নষ্ট হয়।

৭। উশীরাদি—বেণারমূল, বালা, মুথা, ধনে, শুঁঠ, বরাক্রান্তা,

ধাইফুল, লোধ, বেলশুঁঠ। ইহা পান করিলে অগ্নির দীপ্তি হয় ও আম-দোষের পরিপাক পায়। ইহাদ্বারা, সবেদন, সজ্বর ও বিজ্বর অতিসার, অরুচি, মলের পিচ্ছিলতা ও বিবদ্ধতা নষ্ট হয়।

৮। ভূনিম্বাদি অষ্টাদশাঙ্গ পাচন—চিরতা, দেবদারু, বেলছাল, শোণাছাল, গণিয়ারীছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, শালপানি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, শুঁঠ, মুথা, কটূকী, ইন্দ্রযব, ধনে, গজপিপুল। এই সকল পানে তন্দ্রা, প্রলাপ, কাস, অরুচি, দাহ, মোহ, শ্বাস প্রভৃতি উপদ্রবযুক্ত সর্ব্বপ্রকার জ্বরের উপশম হয়।

৯। গুড়ূচ্যাদি পাচন—গুলঞ্চ, যষ্টিমধু, কিস্মিস্, ইক্ষুমূল, দাড়িম-বীজ। এই পাচন পুরাতন এখগুড় সহ পান করিলে, মসূরিকাসকল শীঘ্র শীঘ্র পাকে ও বায়ু কুপিত হয় না। এক বৎসরের পুরাতন এখগুড় লইবে। যে এখগুড় (ইক্ষুজাত গুড়) দুর্গন্ধযুক্ত বা যাহাতে অম্লরসের উৎপত্তি হইয়াছে, উহা লইবে না।

১০। দশমূল পাচন—বেলছাল, শোণাছাল, গণিয়ারীছাল, গাম্ভার ছাল, পারুলছাল, শালপানি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর। এই পাচন পানে, সান্নিপাতিক জ্বর, কাস, শ্বাস, তন্দ্রা, পার্শ্বশূল, কণ্ঠ ও হৃদয়-বেদনা দূর হয়।

১১। অষ্টাঙ্গাবলেহ—কট্ফল (কায়ছাল), কুড়, কাঁকড়াশৃঙ্গী, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, দুরালভা, কৃষ্ণজীরা। এই সকল দ্রব্য রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া পৃথক্ পৃথক্ চূর্ণ করিয়া পরিষ্কার পুরু কাপড়ে ছাঁকিয়া লইবে। পরে সমানভাগে ওজন করিয়া লইয়া একত্র করিয়া, বেশ করিয়া মিশাইবে। মধুর সহিত মাঝে মাঝে ইহা চাটিতে হয়। ইহাতে সুদারুণ সান্নিপাত, হিক্কা, শ্বাস, কাস ও কণ্ঠরোধ নিবারিত হয়।

১২। পিণ্ডতৈল—টাট্কা ও বিশুদ্ধ সরিষার তৈল /৪ সের। ক্কাথার্থ—গুলঞ্চ, সোমরাজী, গন্ধভাদালে প্রত্যেক ১২॥ সের, জল ৬৪

সের, শেষ ১৬ সের (পৃথক্ পৃথক্ কাথ তৈয়ার করিবে)। দুগ্ধ ।৬ ষোল সের। কল্কার্থ—শিলারস, ধুনা, নিশিন্দা, ত্রিফলা, সিদ্ধি, বৃহতী, দন্তীমূল, কাঁকলা, পুনর্ণবা, চিতামূল, পিপুলমূল, কুড়, হরিদ্রা, দারু হরিদ্রা, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, থাটাসী, করঞ্জা, শ্বেতসরিষা, সোমরাজ-বীজ, চাকুন্দেবীজ, বাকসছাল, নিমছাল, পল্‌তা, আলকুশীবীজ, অশ্ব-গন্ধা, সরল-কাষ্ঠ প্রত্যেক ২ তোলা। যথারীতি পাক করিবে অথবা কোন কবিরাজের দ্বারা তৈয়ার করাইয়া লইবে। ইহাতে বাতরক্ত ও কুষ্ঠাদি বহুবিধ পীড়া নষ্ট হয়। তৈলাদির পাক শুধু বলিয়া কহিয়া শিখান যায় না। দেখিতে হয় এবং হাতে কলমে করিতে হয়। নতুবা ঔষধের পাক ঠিক হয় না। আর ঔষধের পাকাদি অনেকবার নিজহাতে না করিলেও পাকবিষয়ে নিপুণতা জন্মে না। চরক বলেন—"অভ্যাসাৎ প্রাপ্যতে দৃষ্টিঃ কর্ম্মসিদ্ধি প্রকাশিনী। রত্নাদি সদসজ্‌জ্ঞানং ন শাস্ত্রাদেব জায়তে॥" অর্থাৎ কার্য্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে সম্পাদন করিবার এরূপ দৃষ্টি বা শক্তি, পুনঃ পুনঃ সেই কার্য্য করিবার অভ্যাস হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। নতুবা কেবল শাস্ত্রজ্ঞানে হয় না। যেমন, বহুল ব্যবহার ব্যতীত কেবল শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা মণিমুক্তাদির ভালমন্দ জ্ঞান জন্মিতে পারে না।

১৩। শম্বূকাদি তৈল—" শম্বূকস্য চ মাংসেন কটুতৈলং বিপা-চিতং। তস্য পূরণমাত্রেন কর্ণনাড়ী প্রশাম্যতি॥" শামুকের মাংস / এক ছটাক, থাটী সরিষার তৈল / এক ছটাক, একত্র আগুণে জ্বাল দিবে। মাংসগুলি বেশ ভাজা ভাজা হইলে, অগ্নি হইতে নামাইয়া, ছাঁকিয়া লইবে। কেহ কেহ এই সঙ্গে / এক ছটাক ভীমরাজের রস যোগ করিয়া পাক করিতে বলেন। এই তৈল দ্বারা কর্ণপূরণ করিলে কর্ণের পূঁজপড়া ও ঘা ভাল হয়।

১৪। কজ্জলী প্রভৃতি—ইহাতে পারদাদির শোধনের দরকার। সুতরাং কজ্জলী, মকরধ্বজ, রসসিন্দুর, মৃগনাভি, কস্তূরীভৈরব, লক্ষ্মী-

বিলাসরস, মৃত্যুঞ্জয়রস প্রভৃতি দরকার হইলে কোন কবিরাজ হইতে গ্রহণ করিবে। ইচ্ছা হইলে আমাদের এথান হইতেও ক্রয় করিতে পার। উহাদের মুল্যাদির বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল।

ঔষধের নাম।			মূল্য।
বিশুদ্ধ কজ্জলী	১ তোলা	...	৷৷০
রসসিন্দুর	,,	...	১৲
মকরধ্বজ	,,	...	১৬৲
মৃগনাভি	,,	...	৩৬৲
লক্ষ্মীবিলাস রস (স্বল্প)	৭ বড়ী	...	৷০
কফচিন্তামণি	,,	...	৷৷০
মহালক্ষ্মীবিলাস রস	,,	...	২৲
বৃহৎ নারদীয় মহালক্ষ্মীবিলাস	,,	...	১৲
মৃত্যুঞ্জয় রস	,,	...	৷০

মন্তব্য—এই পুস্তকের অধিকাংশ পাচনই তিক্তাস্বাদ। একবারে সমস্ত পাচন খাওয়াইলে কাহারও কাহারও বমন হয়। সুতরাং ৩।৪ বারে দিবে। পাচন সেবনের পর ধনে বা মৌরী কয়েকটা মুখে রাখিয়া চিবাইবে, তাহা হইলেই তিক্তাস্বাদ দুর হইবে। বালক, স্ত্রীলোক, বিশেষতঃ গর্ভিণীকে কথনও একবারে সমস্ত পাচন খাওয়াইবে না।

পথ্য প্রস্তুত প্রণালী।

——§*§——

"বিনাপি ভেষজৈর্ব্যাধি পথ্যাদেব নিবর্ত্ততে।
নতুপথ্যবিহীনানাং ভেষজানাং শতৈরপি॥"

ঔষধ প্রয়োগ না করিয়া কেবল পথ্যের ধরাকাট করিয়া রাখিলেও রোগী আরোগ্য লাভ করিতে পারে। আর রোগী যদি পথ্যবিহীন হয়,

তবে হাজার হাজার ঔষধ সেবন করিলেও আরোগ্য লাভ করিতে পারে না।

পথ্য এরূপ ভাবে প্রস্তুত করা দরকার যেন, উহা রোগীর পক্ষে উপাদেয় ও মুখরোচক হয়। অধিক পরিমাণে মসল্লা দিয়া পথ্য প্রস্তুত করিলে উহা গুরুপাক হইয়া উঠে এবং উক্ত পথ্য রোগীর পক্ষে কুপথ্য-স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। আমরা বসন্তরোগীর কয়েকটী মাত্র পথ্যের প্রস্তুত প্রণালীর বিষয় এখানে উল্লেখ করিব।

জলসাগু—১ তোলা আন্দাজ সাগুদানা বেশ করিয়া ধুইয়া, আন্দাজ ২ ঘণ্টা কাল ঠাণ্ডা জলে ভিজাইয়া রাখিবে। পরে আড়াই পোয়া আন্দাজ জলে উক্ত সাগুদানা দিয়া পনর মিনিট কাল ফুটাইবে ও ফুটিয়া আসিবার সময় অনবরত নাড়িবে। এই তোমার জলসাগু তৈয়ার হইল।

দুগ্ধসাগু—জলসাগু ভিন্নভাবে তৈয়ার কর। দুগ্ধ ভিন্নভাবে জ্বাল দেও, দেখিও যেন দুগ্ধ জ্বাল দিলে বেশী ঘনীভূত না হয়। খাওয়াইবার সময় প্রয়োজন মত দুগ্ধ, জলসাগুর সঙ্গে মিশাইয়া ঈষৎ গরম করিয়া খাইতে দেও।

জলবার্লি—ভাল বার্লি ১ তোলা লও ও উহার সহিত ঠাণ্ডা পরিষ্কার জল /০ একছটাক মিশাও। এদিকে /॥০ সের জল কড়াইয়ে দিয়া জ্বাল দাও। যখন এই জল ফুটিতে থাকিবে, তখন বার্লিমিশ্রিত জল ক্রমে উহাতে ঢালিতে থাকিবে ও ক্রমাগত নাড়িবে। কিছুক্ষণ পরে যখন উহা আঠার মত হইবে অথচ পাতলা গোছের থাকিবে, তখন নামাইয়া রাখিবে।

জল-এরারুট—বার্লির মত তৈয়ার করিবে। বার্লি বা এরারুট দুগ্ধ সহ দিতে হইলে, দুগ্ধসাগুর মত দিবে।

চিড়ার মণ্ড—বেশ সরু অথচ পাতলা হয়, এরূপ চিড়া লইয়া বাছিয়া পরিষ্কার করিবে ও পরে ৫।৭ বার পরিষ্কার জলে বেশ করিয়া কচলাইয়া ধুইবে ও প্রয়োজন মত গরম জলে ২ ঘণ্টা কাল ভিজাইয়া রাখিবে। তৎপর উহা বেশ করিয়া মাড়িয়া পরিষ্কার কাপড়ে ছাঁকিয়া লইলেই চিড়ার মণ্ড তৈয়ার হয়। উহাতে অল্প সৈন্ধবলবণ, কিম্বা এখচিনি ও কয়েক ফোঁটা নেবুর রস মিশাইয়া লইলে, খাইতে বেশ রুচিকর ও তৃপ্তিপ্রদ হয়। আমাশয়ের পক্ষে ইহা খুব ভাল পথ্য।

খইয়ের মণ্ড—গরম জলে টাটকা খৈ ভিজাইয়া চিড়ার মণ্ডের মত তৈয়ার করিবে।

কাঁচামুগ ও মসুরের যূষ—(ক) কাঁচামুগ বা মসুরের দাল ৻১০ আধ ছটাক লইবে ও পরিষ্কার একখানা ন্যাকড়াতে উক্ত দাল রাখিয়া পুটলী বাঁধিবে। বাঁধা যেন আল্‌গা আল্‌গা (ঢিলে) হয় অর্থাৎ জ্বালের সময় দাল যেন পুটলীর ভিতরে ঘুরিতে ফিরিতে পারে। এখন একটী হাঁড়িতে ⁄১ সের জল দিয়া ঐ পুটলীটি উক্ত হাঁড়ির ভিতর দিয়া মৃদু মৃদু জ্বাল দিয়া, ⁄।০ একপোয়া আন্দাজ জল থাকিতে নামাইয়া ঐ দাল উক্ত জলে বেশ করিয়া রগড়াইয়া (কচলাইয়া) লইবে। তৎপর উহার সহিত কিঞ্চিৎ আদার রস ও সৈন্ধব লবণ প্রয়োজন মত যোগ করিয়া, কি ইচ্ছা হইলে ২।১ ফোঁটা পাতি নেবুর রস যোগ করিয়া লইবে। দাল যত ভাল সিদ্ধ হয় ততই উত্তম। (খ) আমরা দালে যে সকল মসল্লা সাধারণতঃ ব্যবহার করি ও যেভাবে তৈয়ার করি, সেই সমস্ত মসল্লার সহিত ও সেইভাবে দাল সিদ্ধ করিবে। তবে লঙ্কার পরিবর্ত্তে জীরামরিচ ব্যবহার করিবে; আর, তৈল বা ঘৃত ব্যবহার করিবে না। বিশেষ-বিধি থাকিলে করিতে পার। দাল বেশ সুসিদ্ধ হইলে, পরিষ্কার ন্যাকড়ার মধ্যে দাল ও জল রাখিয়া হস্তচালনা দ্বারা দালের মাড় বাহির করিবে। পরে কয়েকখানা তেজপাতা ও পাঁচফোড়ন দ্বারা কাঠখোলায় (অর্থাৎ

তৈল, ঘৃত না দিয়া) সম্ভরা দিয়া ছাঁকিয়া পান করিতে দিবে। ইচ্ছা করিলে নেবুর রস যোগ করিতে পার।

কেহ কেহ বলেন—সোণামুগ বা মসূরদাল পরিষ্কার করিয়া বাছিয়া উপযুক্ত পরিমাণ জলসহ জ্বালে চড়াও। দাল ফুটিতে আরম্ভ করিলে উহাতে আস্ত ধনে (গোটা ধনে), লবঙ্গ, দারুচিনি, আদা ও তেজপাতা ছাড়িয়া দেও, দা'ল গলিয়া গেলে সৈন্ধবলবণ দিবে ও পরে কাঠখোলায় স'াতলাইয়া রাখিয়া দিবে। থিতাইলে, উপরের জলীয়াংশ ছাঁকিয়া লইবে। পাতি নেবুর রস সহ সেবন করিবে।

মসূরের জল—মসূরদাল ৴১০ আধ ছটাক, ⁄॥ আধসের জলে উননে চড়াও, দাল সিদ্ধ হইতে হইতে যে ফেনা উঠিবে তাহা কাটিয়া ফেল। জলের মধ্যে দা'লের রং আসিলেই ছাঁকিয়া সেই জল গ্রহণ কর। উহার সহিত একটু সৈন্ধব, পাতিনেবুর রস বা আদার রস অবস্থানুসারে যোগ-করিয়া পান কর।

চূণের জল—একটা বড় বোতল (তিন পোয়া জল ধরে এমত বোতল) পরিষ্কার জলপূর্ণ করিয়া তাহাতে পাথরচূণ ৸৵ চৌদ্দ আনা ওজনে চূর্ণ করিয়া দিয়া, ছিপি বন্ধ করিয়া অনবরত ঝাকড়াইবে, যেন চূণ জলের সঙ্গে বেশ মিশিয়া যায়। পরে বোতলটী কোন স্থানে স্থির ভাবে রাখিয়া দিবে। ইহাতে চূণ থিতাইয়া বোতলের তলায় পড়িবে। এখন বোতলের উপরের জল এরূপ ভাবে ঢালিয়া লইবে, যেন নীচের চূণ ঘোলাইয়া না উঠে। পরে উহা ব্লটিংপেপার (চোষ কাগজ) দ্বারা ছাঁকিয়া লইয়া পরিষ্কার অন্য একটী বোতলের ভিতরে রাখিয়া ছিপি আবদ্ধ করিয়া রাখিয়া দিলে উহা অনেক দিন পর্য্যন্ত ভাল থাকে। জ্বরজারিতে পেট ফাঁপিলে বা পাতলা বাহ্য হইলে, অথচ রোগী নিতান্ত দুর্ব্বল হইলে, যখন দুগ্ধ দেওয়া দরকার হয়, তখন এক্‌বন্ধা দুগ্ধ-

সহ, দুগ্ধের তিন ভাগের একভাগ এই চুণের জল মিশাইয়া সেবন করিতে দিতে হয়।

ছানার জল। একপোয়া টাট্‌কা বিশুদ্ধ গব্য দুগ্ধ (গরুরদুধ) জ্বালে চড়াও। দুগ্ধ গরম হইলে তাহার মধ্যে পাতিনেবুর রস কতকটা দেও ও নাড়িতে থাক। দেখিবে দুগ্ধে ছানা বাঁধিয়াছে। পরে কাপড়ে ছাঁকিয়া এই জল ব্যবহার করিবে। ফিট্‌কারীর গুড়া দিয়াও ঐভাবে ছানার জল তৈয়ার করা যায়। জ্বরাবস্থায় পেট ফাঁপিলে অন্য কোন পথ্য অপেক্ষা এই পথ্যটী বিশেষ ফলপ্রদ।

এই পুস্তকে ব্যবহৃত কতকগুলি শব্দের অর্থ।

——(*)——

এরিসিপেলাস্—ইহাকে বাঙ্গালায় বিসর্প বলে। ইহা একপ্রকার উগ্রধারাণের ছোঁয়াচে চর্ম্মরোগ। ইহাতে শরীর খুব খারাপ করে। এরিসিপেলাস্ অর্থ চর্ম্ম ও চর্ম্মনিম্নস্থ এরিওলার টিস্যুর এক প্রকার ব্যাপক প্রদাহ। এই প্রদাহ অনেকটা স্থান লইয়া হয়। চর্ম্মের নিম্নস্থ একপ্রকার শিথিল শারীরিক উপাদানকে এরিওলার টিস্যু বলে। চর্ম্মের উপর, যে কোন স্থানে ইহা হইতে পারে। ইহার সঙ্গে জ্বর হয়। ইহা খুব ছোঁয়াচে রোগ। রোগী স্পর্শ করিয়া অগৌণে হাত ধুইয়া ফেলিবে।

প্রদাহ—শরীরের কোন স্থান স্ফীত, উষ্ণ, লালবর্ণ ও বেদনাযুক্ত হইলে, তাহাকে ঐ স্থানের প্রদাহ কহে।

আরক্ত জ্বর—ইহার ডাক্তারি নাম স্কার্লেট ফিভার বা স্কার্লেটিনা। ইহা এক প্রকার জ্বর। ইহাতেও হামের ন্যায় শরীরে লাল লাল বিন্দু বিন্দু নির্গত হয়। তবে হামের জ্বরের প্রথমে সর্দ্দি কাশি ও হাঁচি হয়। এই জ্বরে প্রায় ঐ সকল লক্ষণ হয় না এবং নাক চোখ দিয়াও জল ঝড়ে না। তবে রোগ খুব বাড়িয়া গেলে ঝড়িতে পারে, কিন্তু রোগের প্রারম্ভে নহে। এই রোগে গলার ভিতরে বেদনা হয়, গলার বীচি ফোলে এবং

গলার ভিতরে ক্ষতও হয়, কিন্তু হামে তাহা হয় না। আরক্ত জ্বরের দাগ সকল (বিন্দু সকল) চর্ম্মের সঙ্গে যেন মিলাইয়া থাকে, আর হামের দাগগুলি চর্ম্মের উপর একটু উঁচু হইয়া উঠে। হামের দাগগুলি জ্বরের ৪র্থ দিনে বাহির হয়, আর এই রোগের দাগগুলি জ্বরের দ্বিতীয় দিবসে বাহির হয়।

দোষ ও ধাতু—বায়ু, পিত্ত, কফ, রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র ইহারা শরীর ধারণ করে বলিয়া ইহাদিগকে ধাতু বলে। পুরুষের শুক্রঃ ও স্ত্রীলোকের আর্ত্তবকেও (ঋতুর রক্তকেও) ধাতুমধ্যে গণ্য করা যায়। বায়ু, পিত্ত ও কফ ইহাদের প্রত্যেকের নাম মল, দোষ ও ধাতু। অবিকৃত থাকিলে বায়ু, পিত্ত ও কফ দ্বারা শরীরের স্বাস্থ্য রক্ষা হয় ও শরীরের উপচয় হয়। বিকৃত হইয়া ইহারা নানাপ্রকার রোগ উপস্থিত করিয়া দেহ নাশ করে। ইহারা পৃথক্ পৃথক্ বা মিলিতভাবে শরীরকে দূষিত করে বলিয়া ইহাদিগকে দোষ বলে। ইহাদিগকর্ত্তৃক রস রক্তাদি সপ্তধাতু দূষিত হয় বলিয়া শেষোক্তের নাম দূষ্য। বায়ু, পিত্ত ও কফের বিস্তৃত বৈজ্ঞানিক বিবরণ, আমরা আমাদের অন্য বইতে (যাহা লিখিতেছি তাহাতে) দিব।

রস—" সম্যক্ পক্কস্য ভুক্তস্য সারো নিগদিতো রসঃ।
স তু দ্রবঃ সিতঃ শীতঃ স্বাদু স্নিগ্ধশ্চলোভবেৎ ॥ "
অপিচ—" রসায়নার্থিভির্লোকৈঃ পারদো রস্যতে যতঃ।
ততোরস ইতি প্রোক্তঃ সচ ধাতুরপি স্মৃতঃ ॥ "

ভাবপ্রকাশ।

অর্থাৎ ভুক্ত বস্তু সম্যক পরিপাক পাইলে, তাহা হইতে যে তরল সার বহির্গত হয় তাহাকে রস বলে। ডাক্তারিতে ইহার নাম Chyle আর পারদের অন্য নাম রস। ডাক্তারি নাম Mercury (Calomel).

ওজঃ—সপ্তধাতুর দ্রবময় তেজোভাগ, শরীরের সর্ব্বস্থানে বলরূপে অবস্থান করে। ইহার নাম ওজঃ। কেহ কেহ বলেন হৃদয়ে, ঈষৎ পীত-বর্ণ যে শুদ্ধ রক্ত অবস্থান করে তাহার নাম ওজঃ। ইহার পরিমাণ ৮ বিন্দু।

সংশোধন ও সংশমন ঔষধ—

সংশোধন—" স্থানাদ্ বহির্ণয়েদূর্দ্ধমধোবা মলসঞ্চয়ম্।
দেহসংশোধনং তৎ স্যাৎ দেবদালী ফলং যথা॥"
আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞানম্।

যদ্দ্বারা দোষসকল ঊর্দ্ধ বা অধোমার্গ দিয়া নিঃসারিত হয়, তাহাকে সংশোধন ঔষধ বলে। এই শ্রেণীস্থ ঔষধ দ্বারা বমন ও বিরেচন দুইই হইতে পারে।

শমন—" ন শোধয়তি যদ্দোষান্ সমান্নোদীরয়ত্যপি।
সমীকরোতি সংবৃদ্ধান্ শমনং তত্তু সপ্তধা॥"
ভাবপ্রকাশ।

যদ্দ্বারা দোষসমুদায় শোধিত হয় না অথবা সমান অবস্থায় স্থিত দোষসমুদায় আপন স্থান হইতে চালিত হয় না, কিন্তু বর্দ্ধিত দোষ সকল যদ্দ্বারা সমান অবস্থায় স্থাপিত হয়, তাহাকে শমন বলা যায়। সংশোধন অর্থাৎ যদ্দ্বারা শরীরের যাবতীয় পদার্থের পরিষ্কার হয়। সংশমন অর্থাৎ যদ্দ্বারা শরীরস্থ যাবতীয় পদার্থের স্বাভাবিক অবস্থার প্রাপ্তি হয়।

ধাতু, মল ও রোগ—শারীরিক ও মানসিক নানাপ্রকারের চেষ্টা দ্বারা আমাদের দৈহিক উপাদানের প্রত্যহ ধ্বংস হইতেছে। উহার পূরণের জন্য ক্ষুধা উপস্থিত হয়। ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক পাইলে, তাহা হইতে উৎ-পন্ন রস দ্বারা, রস, রক্ত মাংসাদি সপ্তধাতুর পরিপূরণ ও পরিপোষণ হইয়া থাকে। যেমন ইক্ষু ঘানিগাছে পীড়ন করিলে, তাহা হইতে নির্ম্মল ইক্ষু-রস উৎপন্ন হয় ও উহার মলস্বরূপ ইক্ষুর ছিব্ড়া পড়িয়া থাকে। আবার,

এই রস জ্বাল দিলে উহার সারভাগ গুড় হয় ও মলস্বরূপ গুড়ের গাঁদ পড়িয়া থাকে। এই গুড় পরিষ্কার করিলে, উহার সারভাগ চিনি হয় ও চিনির গাঁদ পৃথক্ হইয়া পড়ে। আবার, এই চিনির সারভাগ মিছরি হয় ও মিছরির গাঁদ পৃথক্ পড়িয়া থাকে। অর্থাৎ ইক্ষুর সর্ব্বশেষ পরিণতি (refinest part) যেমন মিছরি এবং প্রত্যেক বার পরিষ্কারের অন্তেই যেমন মলভাগ পৃথক্‌ভাবে পড়িয়া থাকে, সেইরূপ ভুক্তদ্রব্য সম্যক্ পরিপাক পাইলে, উহা হইতে সারভাগস্বরূপ রস উৎপন্ন হয় ও মলভাগ পৃথক্ হইয়া কালে, মূত্র, বিষ্ঠাও ঘর্ম্মাদি রূপে শরীর হইতে বহির্গত হইয়া যায়। রক্ত মাংসাদির প্রত্যেকেরই এইরূপ অহরহঃ এক ধাতু হইতে অন্য ধাতুতে পরিণতি হইতেছে। আগন্তু কারণের জন্যই এই সকল কার্য্যের বিক্রিয়া ঘটুক, অথবা প্রকৃতির নিয়মে ক্রমশঃ আভ্যন্তরীণ যন্ত্রাদি দুর্ব্বল হওয়াতে পূর্ব্ববৎ কার্য্য করিতে সক্ষম না হওয়াতেই উক্ত কার্য্যাদির ব্যাঘাত ঘটুক, উভয় কারণেই শারীরিক রোগ উপস্থিত হয়।

কয়েকটী রোগীর বিবরণ।

——§*§——

আমাদের জীবনী শক্তিই আমাদের চিকিৎসক। শরীর ও মনের অসাত্ম্যকর দ্রব্যাদির সহিত আমাদের দেহের কি মনের সংযোগ ঘটিলে অথবা দেহ হইতে সাত্ম্যকর পদার্থের বিচ্যুতি ঘটিলেই ব্যারামের সৃষ্টি হয়; আর প্রকৃতি আপনা হইতেই অসাত্ম্যকর দ্রব্য তাড়াইবার জন্য ব্যস্ত হয়। দেখ পায়ে কাঁটা ফুটিলে, প্রথমতঃ সেস্থান লাল হইয়া ফুলিয়া উঠে। কাঁটার সংযোগ দেহের পক্ষে অসাত্ম্যকর। কাঁটার সঙ্গে দেহের সংযোগ হওয়াতে সেই স্থান ফোলে ও লাল হয়,—যেন, জীবনীশক্তি নিজের বাসগৃহের (দেহের) অনিষ্ট হইতেছে দেখিয়া রাগে ফুলিয়া উঠে এবং সেই স্থানে প্রদাহ জন্মাইয়া, পাকাইয়া পুঁজ সহ কাঁটাকে

বাহির করিয়া দেয়। দেহের সঙ্গে কলেবার বিষ সংযুক্ত হইলেও অনবরত ভেদ বমন দ্বারা, সেই বিষ দেহ হইতে নির্গত করিয়া দিবার জন্য প্রকৃতি সর্ব্বদা চেষ্টা করে। শ্বাসনলীগুলির ভিতরে সর্দ্দি লাগিয়া শ্বাসনলী-গুলির পথ আবদ্ধ হইয়া যায় ও তদ্দরুণ শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যাঘাত ঘটে। সর্দ্দি যেন শ্বাসনলী গুলির পথ অবরুদ্ধ করিয়া শরীর ধ্বংস করিতে এবং কাজেই জীবনীশক্তিকে দম বন্ধ করিয়া মারিয়া ফেলিতে চায়; কিন্তু, অমনিই জীবনীশক্তি, কাশির সৃষ্টি করিয়া সেই সর্দ্দিগুলিকে তাড়াইয়া দিয়া শ্বাসনলীগুলিকে পরিষ্কার করিয়া বায়ুর চলাচলের পথ পরিষ্কার কবিবার জন্য সচেষ্ট হয়। এই চেষ্টাতেই কাশির সৃষ্টি হয়। এই গেল দেহে অসাত্ম্যকর দ্রব্যের সংযোগরূপ ব্যাধি। ইতিপূর্ব্বেই আমাদের উল্লেখ করা উচিত ছিল যে, যে বস্তু আমাদের শরীরের পক্ষে শুভজনক, যাহা আমরা পাইতে ইচ্ছা কবি অথবা যে বস্তু না পাইলে আমরা দুঃখ অনুভব করি, সেই বস্তুকে আমাদের দেহের পক্ষে সাত্ম্য বলা যায়। আব, যে বস্তু দেহের পক্ষে হিতকর নহে, যে বস্তুর প্রতি আমাদের দ্বেষ উপস্থিত হয় অথবা যে বস্তুর উপস্থিতিতে বা সংযোগে আমাদের দুঃখানুভব হয়, সেই বস্তু আমাদেয় দেহের পক্ষে অসাত্ম্য। ভাত, দুধ ইত্যাদি মানুষেব পক্ষে সাত্ম্য; আর, বিষাদি মানুষের পক্ষে অসাত্ম্য। সুতরাং ব্যারাম দুই প্রকার। দেহ হইতে সাত্ম্যের বিচ্যুতিরূপ এক প্রকার ব্যাধি। আর, দেহের সঙ্গে অসাত্ম্য-সংযোগরূপ আর একপ্রকার ব্যাধি। এই প্রকার ব্যাধিও আবাব দুই ভাগে বিভক্ত। শারীরিক ও মানসিক। জ্বর প্রভৃতি শারীরিক ব্যাধির ও উন্মাদ প্রভৃতি মানস ব্যাধির উদাহরণ। এইরূপ, রস ও রক্তাদি সাত্ম্যকর জিনিষ দেহ হইতে চ্যুত হইলেও ব্যারামের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

যাহাহউক, প্রত্যেক ব্যারামেই আমরা জীবনীশক্তির সহিত রোগের সংঘর্ষ দেখিতে পাই। এই সংঘর্ষে (Struggleএ) যদি রোগের শক্তি

প্রবল হয়, শরীরের ঐ অবস্থায় সাত্ম্যকর দ্রব্যাদি প্রয়োগ করিয়া আমরা জীবনীশক্তির সাহায্য করিয়া থাকি। এই কার্য্যের নামই চিকিৎসা। আর জীবনীশক্তি নিজেই যদি রোগ অপেক্ষা প্রবলা হন, তবে জীবনী শক্তির সহিত সংঘর্ষে রোগবীজ আপনিই ধ্বংস হইয়া যায়। এরূপ অনেক স্থলে দেখা যায় যে, কলেরা হইয়াছে অথচ চিকিৎসক নিকটে নাই অথবা চিকিৎসক ডাকিবার সামর্থ্য নাই বলিয়া, রোগী বিনা চিকিৎসাতেই পড়িয়া রহিয়াছে ; অথচ কয়েকবার ভেদ ও বমনের পর শরীরের দূষিত পদার্থ নির্গত হইয়া যাওয়ার পরই রোগী আপনা হইতেই আরোগ্য লাভ করিল। বসন্ত রোগাদিতেও সেইরূপ জীবনীশক্তির সহিত রোগবীজের সংগ্রাম হয়। তুমি চিকিৎসক, তোমার কর্ত্তব্য যে, উভয়ের সংগ্রাম বেশ নিপুণতার সহিত লক্ষ্য কর। যদি দেখ যে, জীবনীশক্তি রোগ অপেক্ষা ক্ষীণবল হইয়াছে, তখন তাঁহাকে তাঁহার সেই সময়ের অবস্থানুরূপ সাহায্য করিবে। বসন্তরোগ তাড়াতাড়ি করিয়া আরাম করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া নিজের বাহাদুরী খাটাইতে যাইও না। উহাতে মন্দফলই উৎপন্ন হইবে। বসন্ত আপনা হইতেই উঠিতেছে অর্থাৎ প্রকৃতি ভিতর হইতে রোগবীজ তাড়াইয়া দিবার জন্য বাহ্য চর্ম্মে পিড়কার আকারে উহা বাহির করিয়া দিতেছে এবং উহার চেষ্টাতে একটু সময় পরেই পিড়কাগুলি বহির্গত হইবে, এইরূপ স্থলে বসন্তের ছোব্‌ ও প্রলেপাদি অসময়ে দিয়া বাহাদুরী করিলে। আর, রোগীর কি হইল ? অসময়ে শৈত্য প্রয়োগ করাতে রোগীর সর্ব্বশরীর ফুলিয়া উঠিল, ভয়ানক জ্বর বৃদ্ধি হইল ও অভ্যন্তরে অতিশয় কম্প হইতে লাগিল। সেই কম্প, সেই জ্বর ও সেই অস্থিরতা, শতচেষ্টাতেও আর থামাইতে পারিলে না ! রোগী তোমার বুদ্ধি ও চিকিৎসা-কৌশলকে উপহাস করিতে করিতে ধরাধাম ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল !! আর তুমি ? তুমি হতবুদ্ধি ও বিহ্বলচিত্ত হইয়া মাথায় হাত দিয়া ভাবিতে লাগিলে ও রোগীর পিতামাতাকে "ধান

থাই চাউঙ্গ থাই” গোছের উত্তর দিয়া কোন প্রকারে তাহাদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলে !!! তাই বলিতেছিলাম, ঐরূপ বাহাদুরী করিতে যাইও না। তোমার কর্ত্তব্য রোগীকে পথ্য দেওয়া ও রোগীর শুশ্রূষা করা এবং রোগের উপসর্গাদি লক্ষ্য করা। আর, যথন যে উপসর্গাদি উপস্থিত হইবে তাহারই মত চিকিৎসা করা এবং যাহাতে কোন নূতন উপসর্গ না জন্মিতে পারে সেইরূপ ব্যবস্থা করা ? কারণ,—“Prevention is better than Cure.’ যাহাহউক, আমরা কয়েকটী রোগীর বিবরণ এখানে দিলাম—

(১) আমার নিজের মাতৃঠাকুরাণীর জলবসন্ত হয়। জলবসন্তের যদিও কোন চিকিৎসার দরকার নাই, তথাপি এরূপ অনেক অধীর লোক আছে যে, তাহারা চিকিৎসার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়ে। যাহাহউক, আমি তাঁহাকে কোনও প্রকারের ঔষধ না দিয়া রাখিয়া দিলাম। প্রথমে সর্ব্ব-শরীর, বিশেষতঃ ঘাড় ও পিঠে বেদনা এবং শিরঃপীড়া হইয়া সামান্য জ্বর হয় ও পরে বসন্ত দেখা দেয়। সর্ব্বশুদ্ধ ৬০।৭০টীর বেশী বসন্ত উঠে নাই। প্রথম দুই দিন জলসাগু মিছরি ও কাঁচামুগের যূষ খাওয়ান হয়। তৎপরে একবেলা ভাত ও অন্য বেলা কচুরী সিঙ্গারা প্রভৃতি দেওয়া হয়। এই-রূপে ৮।৯ দিন পরে, হঠাৎ একদিন খুব জ্বর হয়। এই জ্বর কয়েক ঘণ্টা মাত্র ছিল এবং জ্বরের সময় তিনি একটু অস্থিরও হইয়াছিলেন। যাহা-হউক, আমি বিনা ঔষধেই রাখিলাম। কেবল পরের দিন ভাত বন্ধ করিয়া, কাঁচা মুগের যূষ ১ তোলা, ঘৃত সহ সম্বরা দিয়া তাহাই খাইতে দিলাম। তৎপর দিন হইতে পুনরায় ভাত দেওয়া হয়। ১৫ দিনে ভাল হন। স্নান বরাবর বন্ধ ছিল। বসন্তের ঘা শুকাইবার পর স্নান করান হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে জলবসন্তই হউক, আর আদত বসন্তই হউক, বসন্তজ্বরের দুইবার প্রকোপ হয়। আমার মায়েরও তাহাই হইয়াছিল।

২। একটী সম্ভ্রান্ত ও আজ কালের শিক্ষিতা মহিলার জলবসন্ত হয়

প্রথমে খুব জ্বর হয় ও জলবসন্ত বাহির হয়। রোগিনী নিজে শিক্ষিতা এবং নিজের ব্যারাম, কাজেই কাহাকেও ডাকিতে হয় নাই। ৭।৮ দিন পর্য্যন্ত সাধারণ পথ্যাদি পালন করেন। ৮।৯ দিনের দিন আমাকে ডাকেন। আমি প্রথমে তাঁহাকে কোন ব্যবস্থাই করিতে চাই না। পরে নির্ব্বন্ধাতিশয় প্রকাশ করিলে খদিবাষ্টক পাচন খাইতে বলি ও মকরধ্বজ পটোলের রস গরম করা ও মিছরি সহ সেবনের ব্যবস্থা করি। পাচন খাওয়ার পর তাহার দ্বিতীয় বারের জ্বর (Secondary fever.) হয় ও তিনি কিছু অস্থির হইয়া পড়েন। পাচন বমি হইয়া পড়িয়া গিয়াছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে বসন্ত জ্বরের দুইবার প্রকোপ হয়। এই রোগিনীরও সেই দিন জ্বর হইবার কথা ছিল; যাহাহউক, তিনি ব্যস্ত হইয়া আমাকে সংবাদ না দিয়াই অন্য চিকিৎসককে ডাকেন। এই জ্বর তাঁহার পক্ষেও কয়েক ঘণ্টা মাত্র ছিল। পরে আপনা হইতেই সুস্থ হইয়া উঠেন।

৩। একটী ভদ্রলোকের আদত বসন্ত হয়। তাঁহার অবস্থা তত ভাল নয় এবং অনেক বসন্তচিকিৎসক সময় সময় টাকাকড়ি সম্বন্ধে অন্যায় দাবী করেন এবং সামান্য বসন্তকেও বিজাতীয় বসন্ত বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিয়া থাকেন, ইত্যাদি নানাকারণে, কোন বসন্তচিকিৎসককেই তিনি ডাকেন নাই। কেবল প্রকৃতির সাহায্যের উপরই নির্ভর করিয়াছিলেন। বসন্তও তাঁহার ৩।৪ শত উঠিয়া ছিল। আমাদের কথামত বসন্ত পাকিলে পর কাঁটা দিয়া গালিয়া পুঁজ বাহির করিয়া, সেইস্থানে প্রথম দিন শুধু শ্বেতচন্দন ঘষিয়া প্রলেপ দিয়াছিলেন ও তৎপর দিন হইতে মাখম ও শ্বেতচন্দন-ঘষা সমানভাগে মিশাইয়া লাগাইয়াছিলেন। ইহাতেই ঘা শুষ্ক হইয়া যায় ও তিনি সুস্থ হন।

৪। একটী ভদ্রলোকের আদত বসন্ত হয়। তিনি কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীতে কর্ম্ম করেন। বসন্ত বেশী উঠে নাই। ১০০ কি ১৫০ উঠিয়াছিল! প্রথম বারের জ্বরের সময় কিছুই দেওয়া হয় নাই।

সাগু বার্লির উপর নির্ভর করিয়া ২ দিন রাখা হইয়াছিল। বসন্ত ২।৪টা উঠিবার পর, কল্‌মী (কলম্বী) শাকের ঝোলও ১ বার করিয়া খাইতে দেওয়া হইয়াছিল। বসন্ত বেশ উঠিলে ভাত ও মুগের ঝোল দেওয়া হয়। গুটিকা পরিপুষ্ট হইলে, মাখম ও কাঁচা হলুদের রস দ্বারা ছোব্‌ দেওয়া হয়। পরে পাকিবার পর কাঁটা দিয়া গালিয়া পুঁজ বাহির করিবার পর তৈল প্রয়োগ করাতে শুষ্ক হইয়া যায়।

৫। একটী বাবুর ভাগিনেয়ের আদত বসন্ত হয়। রোগীর বয়স তখন ২০।২১ বৎসর। বসন্ত এত উঠিয়াছিল যে শরীরে আর স্থান ছিল না। সর্ব্ব শরীর ফুলিয়া গিয়াছিল। উঠিবার সময় সামান্য ছোব্‌ দেওয়া হয় ও পাকিবার পর তৈল প্রয়োগ করা হয়, তাহাতেই সারিয়া যায়। এখানে বসন্ত চিকিৎসার জন্য নির্দ্দিষ্ট যে কোন তৈলই প্রয়োগ করিতে পার। অন্য এক রোগীতে কেবল চামেলী তৈল প্রয়োগেই ঘা শুষ্ক হইয়া রোগী আরাম হয়।

মন্তব্য—মোট কথা, বসন্ত শুষ্ক হইবার সময়ে, প্রকৃতির শক্তিতে, আপনাআপনিই স্ফোটকগুলি দেখিতে দেখিতে শুষ্ক হইয়া যায়। তবে এই সময় অত্যন্ত চুলকণা হইয়া রোগী ভারী কষ্ট পায়। শুধু তিল তৈল সর্ব্বাঙ্গে বসন্তের ঘায়ের উপর দিয়া ভিজাইয়া রাখিলে শরীর স্নিগ্ধ থাকে, চুলকণা নিবৃত্ত হয়, মশা মাছি প্রভৃতি গায়ে বসিতে পারে না বা ঘায়ের উপর ডিম পাড়িয়া ঘায়ের অবস্থা খারাপ করিতে পারে না এবং রোগীও ঘুমাইয়া পড়ে। শুধু কাঁচা তিলতৈল, ঘায়ের একটী ভাল ঔষধ জানিবে। কোন কোন বসন্ত চিকিৎসক মাখম ও তিলতৈল সমভাগে একত্র করিয়া মিশাইয়া বসন্ত পাকিলে রোগীর সর্ব্বাঙ্গ ভিজাইয়া রাখেন। আমি শুনিয়াছি যে, ঢাকা সাভার অঞ্চলে, কোন একটী লোক, বসন্তের উদ্‌গমের পরই একটা কি তৈল রোগীর সর্ব্বাঙ্গে মাখাইয়া দেন। ইহাতে বসন্ত পরিপুষ্টও হয় না এবং পাকেও না। না পাকিয়া কাল হইয়া

মিলাইয়া যায় এবং রোগীও আ'রাম হয়। আমাদের মনে হয়, নিম্নলিখিত ঘৃত তৈয়ার করিয়া, বসন্তের সর্ব্বাবস্থায়, রোগীর শরীরে লেপন করিয়া দিলেও ঐরূপ ফল হইবে। এই ঘৃতটী ফোড়ার, কি অপক্ক কি পক্ক সর্ব্বাবস্থাতেই প্রয়োগ করিয়া ফল পাই। ইহা ফোড়াকে পাকাইবার হইলে পাকায়, বসাইবার হইলে বসায় ও ফাঁটাইবার হইলে ফাঁটায় এবং ইহাতেই শুষ্ক করে। আর, পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বসন্ত স্ফোটক-জ্বর মাত্র। স্ফোটক মূলরোগ এবং জ্বর উপসর্গ মাত্র। স্ফোটক দূর হইলে জ্বরও দূর হয়।

উক্ত ঘৃত যথা—

১। ভাল গাওয়া মাখম ৵৷ পোয়া।
২। আপাঙ্ পাতার রস ৵৷ „
৩। বড় একটা ডাবের সমস্ত শাঁস।
৪। গাঁজা ১ তোলা।
৫। ছোট পিয়াজ ৵৷ একপোয়া।

ডাবটী যেন নেওয়াপাতি হয়। ডাবের শাঁস এরূপ ভাবে খুলিবে যেন মালার ভিতরের (আঁটির ভিতরের) কতকটা অংশ শাঁসের সঙ্গে উঠিয়া আসে। এই শাঁস, গাঁজা ও পিয়াজ বাটীয়া লইবে। একটা কড়াইয়ে মাখম চড়াইয়া দিবে। ঘৃত বেশ হইলে, নামাইয়া রাখিবে। ঠাণ্ডা হইলে আপাঙ্ পাতার রস ও ঐ পিষ্টকল্ক (পিষ্ট দ্রব্য) ঘৃতের মধ্যে দিয়া পুনরায় জ্বাল দিবে। রস সম্পূর্ণ মরিয়া গিয়া যখন কল্ক ভাজা ভাজা হইবে এবং ঘৃত অগ্নিতে নিঃক্ষেপ করিলে ছড়্ ছড়্ শব্দ না করিয়া দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিবে, তখন নামাইবে ও ছাঁকিয়া লইবে। এই ঘৃত সর্ব্বপ্রকার ঘায়েরই ভাল ঔষধ। বাজারে যে সমস্ত ক্ষতান্তক মলম ও ক্ষতান্তক ঘৃত পেটেণ্ট ভাবে বিক্রী হইতে দেখিতে পাও, উহাদের অধিকাংশই এই ঘৃত বই আর কিছুই নহে।

যাহাহউক, আরও অনেক রোগীর চিকিৎসার বিবরণ দেওয়া যাইতে পারে। বসন্ত-চিকিৎসকের বিশেষ সাহস থাকা দরকার। রোগীর সর্ব্বাঙ্গ ফুলিয়া গিয়াছে, সকলেই হতাশ হইয়াছে, এরূপ অবস্থায়ও চিকিৎসকের বিচলিত হইলে চলিবে না।

বসন্তচিকিৎসক প্রতিদিন একটু কাঁচা হলুদ ও একটু এখগুড় দ্বারা জলযোগ করিয়া রোগী দেখিতে যাইবেন এবং অন্ততঃ সপ্তাহে ২ দিন করিয়া কণ্টকারীর মূলের পাচন খাইবেন। ইহাতে তাঁহার সংক্রামকতার ভয় থাকিবে না।

(আমাদের পেটেণ্ট ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা।)

বসন্তরোগের সহজ চিকিৎসা।

———:*:———

যাঁহারা পুস্তকের সমস্ত মর্ম্ম অবগত হইতে পারিবেন না, তাঁহাদের জন্য, আমরা যে নিয়মে আমাদের যে যে ঔষধ প্রয়োগ করি, তাহা এখানে উল্লেখ করিলাম। কি গৃহস্থ, কি ব্যবসায়ী, নিম্নলিখিত নিয়মে, নিম্নলিখিত ঔষধ প্রয়োগ করিলেই সাধ্যরোগী মাত্রকেই আরাম করিতে পারিবেন, যথা—

চারিদিকে যদি বসন্তের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয় এবং রোগীর জ্বরসহ ঘাড়ে পিঠে বেদনা, কোমড়ে বেদনা, শিরঃশূল, চক্ষু রক্তবর্ণ প্রভৃতি লক্ষণের কতকগুলি লক্ষণ উপস্থিত হয়, তবে ৩।৪ দিন পর্য্যন্ত জ্বরের জন্য কোনও প্রকারের ঔষধই প্রয়োগ করিবে না। সর্ব্বদা রোগীর কপাল, হাতের কব্জা ও শরীর পরীক্ষা করিয়া দেখিবে যে, মসুরদানার মত কিছু দেখা যায় কিনা। তৎপর যদি ঐরূপ দেখ এবং হাম কি বসন্ত ভাল করিয়া ঠিক না পাও, তবে আরও ২ দিন অপেক্ষা কর। এই কয় দিন জলসাগু, কাঁচামুগের যূষ বা মসুরের যূষ, রোগীর কোষ্ঠাদির অবস্থা

বুঝিয়া দিবে। মসুর দানার মত দেখিলে দুগ্ধ সাগু দিতে পার। পরে আরও ১ দিন অপেক্ষা করিবে। যখন লক্ষণ দেখিয়া বুঝিবে যে বাস্তবিক আদত বসন্ত উঠিয়াছে, তখন জ্বর থাকুক কি নাই থাকুক, ভাত, মুগের ঝোল, দুগ্ধ বা দুগ্ধ ভাতের সহিত চটকাইয়া দিবে। কিন্তু জলবসন্ত হইলে ভাত দিবে না। তৎপরিবর্ত্তে রোগীর বিবরণে যেরূপ উপদেশ দিয়াছি, সেইরূপ করিবে। সর্ব্বদা মনে রাখিবে যে আদত বসন্ত, রক্ত ও পিত্তের বৈগুণ্য বশতঃ হয় বলিয়া অনেকটা ঠাণ্ডা সহ্য হয়, কিন্তু হাম ও পানিবসন্ত পিত্তশ্লৈষ্মিক রোগ বলিয়া উহাতে অতিরিক্ত শুষ্ক ক্রিয়া বা অতিরিক্ত ঠাণ্ডাক্রিয়া উভয়ই খারাপ। যাহাহউক, আদত বসন্তে দুই বেলা নিম্বাদি পাচন তৈয়ার করিয়া সেবন করাইবে। আর ১০টার সময় ১ বার ও রাত্রে ১ বার মকরধ্বজ, প্রতিবারে ২ রতি মাত্রায়, শ্লৈষ্মিক ধাত হইলে বা শ্লেষ্মার বিশেষ প্রাবল্য দেখিলে তুলসীপাতার রস ও মধুসহ দিবে। শ্লেষ্মার প্রকোপাদি বুঝিতে না পারিলে পটোলের রস ও মধু অথবা শুধু মধুর সহিত দিবে। দুই প্রহরের সময় আমাদের বসন্ত-বিজয়া বটী ১ টী মধুসহ দিবে। অনেক সময়ে বসন্তের জ্বর ভাত না দিলে সারে না। এই সময় আমসী (আমচূড়) জলসহ চটকাইয়া ভাত সহ দিতে পার। এই পাচন, ঔষধ ও পথ্য বসন্ত পাকা পর্য্যন্ত চলিবে। তবে যদি কোন উপসর্গ আসিয়া উপস্থিত হয়, তবে যে যে উপসর্গে, পাচন যেরূপ ভাবে পরিবর্ত্তন করার কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি সেইরূপ করিবে। তৎপর কাঁচা হলুদের রস ও নিমপাতার রস অথবা কাঁচা হলুদের রস ও তেলাকুচার পাতার রস অথবা ঐ তিন রস একত্র মিলাইয়া ন্যাকড়ায় করিয়া ১০টার সময় ১ বার ও ২ টার সময় ১ বার ছোব্ দিবে। ইহাতে দেখিবে যে বসন্ত বেশ পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

বসন্ত বেশ পরিপুষ্ট হইলে ও ২।১টা পাকা পাকা হইলে মাখম ও কাঁচা হলুদের রস সমান ভাগে মিশাইয়া ছোব্ দিবে। ইহাতে বসন্ত শীঘ্র পাকে।

বসন্ত পাকিলে কাঁটা দিয়া পূঁজ বাহির করিয়া আমাদের "বসন্ত-মালতী তৈল" তুলাদ্বারা ঘায়ের উপর লেপিয়া দিবে। সর্ব্বাঙ্গ এই তৈল দ্বারা ভিজাইয়া রাখিবে। যে বসন্তটী পাকে নাই তাহাতেও এই তৈল পড়িলে কোন দোষ হইবে না। এই তৈল লেপনে রোগীর শরীর চড় চড় করে না, চুলকায় না ও রোগী বিশেষ আরাম বোধ করিয়া ঘুমাইয়া পড়ে।

যখন যে উপসর্গ আসিবে, উপসর্গের চিকিৎসা সম্বন্ধে পূর্ব্বে যে উপদেশ দিয়াছি, সেইমত মূলরোগের চিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গে সেই উপসর্গাদিরও চিকিৎসা করিবে। এই অবস্থার পথ্য, বসন্তরোগের চিকিৎসায় যেরূপ বলিয়াছি, সেইরূপ। ইহাই বসন্তের সহজ ও উৎকৃষ্ট চিকিৎসা।

বসন্ত-বিজয়া বটী	৭ বটী	৷৹
মকরধ্বজ	১ ভরি	১৬৲
বসন্তমালতী তৈল	⁄১ সের	৮৲

কোন এক রোগীতে ১৪ বড়ী বসন্তবিজয়া বটী, একপোয়া কি আধসের বসন্তমালতী তৈল ও ৵০ আনা ওজনের মকরধ্বজের বেশী লাগে না অর্থাৎ একটী রোগী আরাম করিতে ১৲ এক টাকার বড়ী, ২৲ টাকার মকরধ্বজ ও ২৲ টাকায় একপোয়া বসন্তমালতী তৈলের দরকার হয় অর্থাৎ ৫৲ টাকার বেশী লাগে না। এই তিনটী ঔষধ এই পরিমাণে একসঙ্গে লইলে অর্থাৎ ১৪টী বসন্ত-বিজয়া বটী, ৵ আনা মকরধ্বজ ও ⁄। পোয়া বসন্তমালতী তৈল লইলে আমরা ৪৲ চারি টাকা মাত্র লইয়া দিয়া থাকি।

গৃহস্থ ও বসন্তচিকিৎসকদের পক্ষে ইহা অপেক্ষা সুবিধা আর নাই। গৃহস্থেরও টাকা বেশী লাগিবে না এবং বসন্তচিকিৎসকগণও স্থলবিশেষে ৫৲ টাকার ঔষধে ৫০০৲ টাকা রোজগার করিতে পারিবেন।

তবে কস্তুরীভৈরব কি লক্ষ্মীবিলাসাদির প্রয়োগ করিতে হইলে যে দাম দিতে হইবে তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। লিখিলেই তৎক্ষণাৎ পাঠাইয়া দিব।

বসন্ত-বিজয়া বটী।

ব্যবহারের নিয়মাদি ঔষধ সহ প্রাপ্তব্য। ইহা বসন্ত রোগের উৎকৃষ্ট ও একমাত্র বিশ্বস্ত প্রতিষেধক ঔষধ। ৭ দিন সেবন করিলে সে বৎসর আর আদত বসন্ত হইবে না ইহা নিশ্চিত। তবে ১ মাস ঔষধ সেবন করিবার নিয়ম। ইহা অবধৌতিক ঔষধ। আমরা যে যে স্থলে ইহার প্রয়োগ করিয়াছি, কোন স্থল হইতেই ইহার বিরুদ্ধে কোন সংবাদ পাই নাই। ৭ বড়ীর দাম ॥০ আনা। ২৮ বড়ী ২৲ টাকা। সদ্যপ্রসূত শিশু হইতে আসন্নপ্রসবা গর্ভিণী ও নিতান্ত বৃদ্ধ ও দুর্ব্বল ব্যক্তিকেও নির্ভয়ে ইহা সেবন করান যায়। আমরা খুব দৃঢ়তার সহিত সর্ব্বসাধারণকে ইহা সেবন করিতে অনুরোধ করি।

সম্পূর্ণ।